প্রবাস বন্ধু

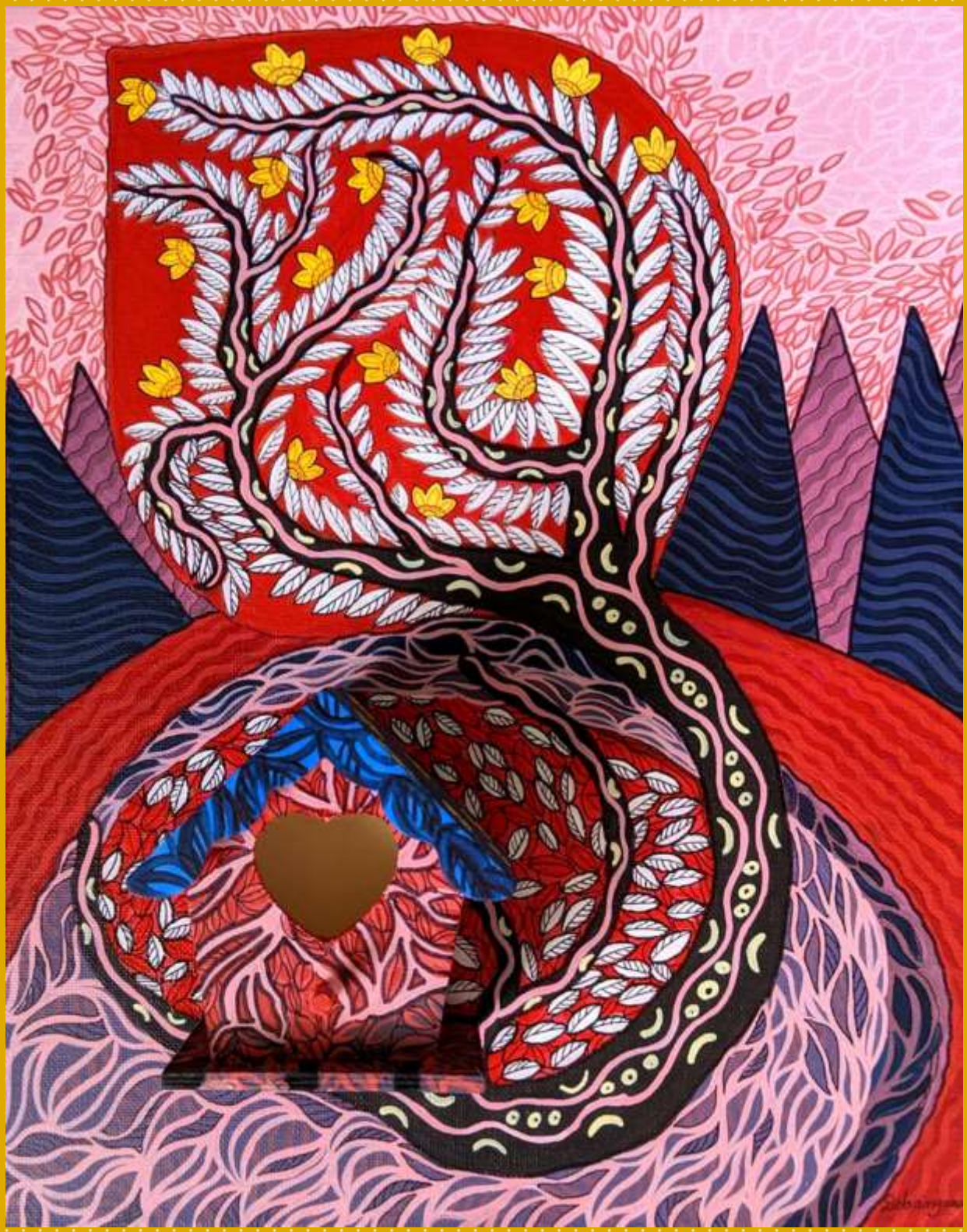

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৭

১৪২৭ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : শারদীয়া সংখ্যা : 2020

সম্পাদকীয়

মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস) 2

শ্রীমতী নন্দিতা ভাটনগর স্মরণে

অসিত কুমার সেন (অস্টিন, টেক্সাস) 4
শুক্তি দত্ত (হিউস্টন, টেক্সাস) 5
হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া) 6
ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস) 7
মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস) 8

গদ্য

তুমুলবাবুর ভাগ্যদোষ	যশোধরা রায়চৌধুরী (কলকাতা, ভারত)	10
এক নৈশ সফর ও ডোরাকাটা শমন	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	14
কিশোরবেলা	ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	17
নামটি তাহার সোনোরা	সোমনাথ বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	19
শিল্পী	দেবব্রত তরফদার (কলকাতা, ভারত)	22
শয়তানের হাতে বেহালা	রাহুল রায় (ওয়েল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস্)	27
মায়া, কায়া এবং অর্ধনারীশ্বর	সুস্মিতা রায়চৌধুরী (পাইন ব্রুক, নিউ জার্সি)	30
নো লাঞ্চবক্স	অদিতি ঘোষদস্তিদার (মরিস প্লেইনস্, নিউ জার্সি)	36
দু-টুকরো	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	37
নিয়তি	জয়া চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	40
দীনেশেরে দুঃখ কষ্ট	দেবাশিস মজুমদার (অ্যালেক্সান্ড্রিয়া, ভার্জিনিয়া)	41
টনির ময়না	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	61
প্রকৃতি বনাম মানব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ	ডলি ব্যানার্জী (কলকাতা, ভারত)	65
ব্রজনাথবাবু	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	66
ফিরে পাওয়া	সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	69
জন্মদিন	অশোক বড়াল (প্রিন্সটন জাঙ্কশন, নিউ জার্সি)	71
অভিনব বৃদ্ধাবাস	জয়শ্রী বাগচী (দিল্লী, ভারত)	75
কামরে মে বনধ্	শুভা আঢ্য (অস্টিন, টেক্সাস)	78
নৈঃশব্দ্যের শব্দময়তা	সোমা ঘোষ (ম্যানচেস্টার, ইউনাইটেড কিংডম)	80
বাংলা বই প্রকাশ ও পড়ার সুবর্ণ সুযোগ	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	82
বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন দেশে পা রাখার অভিজ্ঞতা	হেনা দাস (কলকাতা, ভারত)	83
মা ও মেয়ে	সৌমি জানা (বেলমিড, নিউ জার্সি)	84
এক বিখ্যাত শ্রোতার সাক্ষাৎকার	সংগ্রামী লাহিড়ী (পারসিপ্যানি, নিউ জার্সি)	86
পালাবদল	মল্লিকা ব্যানার্জী (কলকাতা, ভারত)	88
আজও মনে পড়ে	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	92

কবিতা

অকালবোধন	অর্চিষ্মান বাগচী (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	42
মহামানবের গান, হুকুম তোমার	শেলী শাহাবুদ্দিন (মাউন্টেন ভিউ, ক্যালিফোর্নিয়া)	42, 58
মনসংগীত ১, মনসংগীত ২, মনসংগীত ৩	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	42, 55, 59
অনুবাদ কবিতা, মুহূর্ত, একটুর জন্যে	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	43, 44, 46
রোজনামচা	মিশা চক্রবর্তী (হিউস্টন, টেক্সাস)	44
এবং আবার	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	45
কবিতা পড়া, আর অপেক্ষা না করে	দেবাঙ্গনা ব্যানার্জী (স্যান মার্কোস, টেক্সাস)	45, 56
নিরাময়, ক্ষরণ, যতদূর চোখ যায়	বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় (পুরুলিয়া, ভারত)	45, 57, 59
উত্তরজাতক, যতটুকু, অপেক্ষা	ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (কলকাতা, ভারত)	46, 52, 58
এক পশলা বৃষ্টি চাই..., জ্বর	নমিতা রায়চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	46, 55
কাঙ্গাল, মিশ্রমনে নিলাম অবসর	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	47, 60
সাদা কালোর রং তুলি, প্রতীক্ষা, দোলাচল	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	48, 50, 60
ভালবেসেই তো	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	48
শুশ্রূষা	দেব বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যান্ আরবার, মিশিগান)	49
রিক্ত	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	49
জন্মছক, নক্ষত্রের দিনগুলি রাতগুলি	মানস সরকার (কলকাতা, ভারত)	50, 57
অপ্রত্যাশিত, বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা	সুদিত শেখর মুখোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	50, 56
শ্রাবণ-নয়ন	কমলপ্রিয়া রায় ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	51
নীলাঞ্জন	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	51
পরবাস	শ্রী সদ্যোজাত (কলকাতা, ভারত)	52
বসন্ত প্রিয়া	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	52
ভুলে গেলে	অমিতাভ মিত্র (কলকাতা, ভারত)	53
শক্ত মুঠো	বিষ্ণুপ্রিয়া (নর্থ ব্রান্সউইক্, নিউ জার্সি)	53
স্মৃতি	সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় (সাউথ ব্রান্সউইক্, নিউ জার্সি)	54
ফেরে অতীত বর্তমানে	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	54

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৪২৭, অক্টোবর ২০২০
প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ ও শেষ পাতা

দেবাঙ্গনা ব্যানার্জী

সহযোগিতায়

চন্দ্রা দে
রূপছন্দা ঘোষ
ভজেন্দ্র বর্মন
অসিত কুমার সেন

আমাদের পত্রিকা শুধুমাত্র
‘প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইট’-এ
থাকছে

সম্পাদনায়

মালবিকা চ্যাটার্জী
সুজয় দত্ত

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে প্রায় বছর ঘুরে এল আমরা করোনার তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত | বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে এই ভাইরাসকে দমন করার গবেষণায় রত | এখনও মনের মতো ফল না পাওয়ায় সবটাই অনিশ্চয়তার কবলে | দুর্গাপুজোর আনন্দের সময় করোনার কথা মনে আনব না ভাবলেও তো সম্ভব হচ্ছে না, কারণ পুজোর ধারাটাই যে খুব অন্যরকম এইবার | সবাইমিলে ক'টা দিন হই হই করার মানেই তো হ'ল মানুষের ঢল নামা, যেটা এখন এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ | আমরা ভার্চুয়াল ব্যবস্থায় পারদর্শী হয়ে উঠলাম | পুজো হচ্ছে ভার্চুয়াল, অনুষ্ঠানও হচ্ছে ভার্চুয়াল | ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজ করছে ভার্চুয়ালি | পার্টিও তাই | সাজগোজের বালাইপাট উঠেই গেল প্রায় | এত শাড়ি-জামাকাপড় আর প্রাসাধন সামগ্রীরই বা কী অবস্থা! জীবনটাই আমরা নতুন করে চিনতে, জানতে শিখছি এই এক অভিনব সংক্রমণের দাপটে |

সব ভাল বা খারাপের বিপরীত দিকও আছে | আমরা এখন অধীর আগ্রহে সেই বিপরীত দিকের অপেক্ষায় আছি |
প্রকৃতিতে কিন্তু শারদীয়া হাওয়া লেগেছে | যাদের বাড়িতে শিউলি ফুলের গাছ আছে, তারা নিশ্চয়ই টের পাচ্ছে গাছে আর তলায় ভরে থাকা সুগন্ধি ফুলের বাহার | আর কাশ তো পথেঘাটে চোখে পড়ে |

শারদীয়া সংখ্যায় এবার আমরা নিজেদের শহরের লেখক লেখিকা ছাড়াও আরো অনেক লেখা পেয়েছি | এঁরা সকলে স্থানীয় লোকজনের কাছে আমাদের পত্রিকার খবর পেয়ে ও তাঁদের অনুরোধে এই পত্রিকার জন্য রচনা পাঠিয়েছেন | সুমিতা বসুর অনুরোধে আমরা পেয়েছি মাননীয়া শ্রীমতী যশোধরা রায়চৌধুরীর রচনা | বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের অতিথি লেখক লেখিকাদের | স্থানীয় রচয়িতাদেরও জানাই অনেক ধন্যবাদ | এই সংখ্যায় প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকেছেন শ্রীমতী দেবাঙ্গনা ব্যানার্জী | দেবাঙ্গনা শান্তিনিকেতনের কলাভবনে সেই বছরের প্রথম স্থান অধিকারপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রী | দেবাঙ্গনাকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা |
আমার সহকারীদের জন্য রইল আমার অশেষ শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ |
সব পাঠক পাঠিকার উদ্দেশ্যে রাখি পুজো অভিনন্দন | সকলে সুস্থ থাকুন, সাবধানে থাকুন |

মালবিকা চ্যাটার্জী

শ্রীমতী নন্দিতা ভাটনগর স্মরণে

শ্রীমতী নন্দিতা ভাটনগর

প্রয়াণ: ১লা মে ২০২০

শ্রীমতী নন্দিতা ভাটনগর

পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের আয়ু দীর্ঘ নয়, তার উপর আধিব্যধি ও অন্যান্য উপসর্গের উৎপাতে আরও সংক্ষিপ্ত হয়।
এই স্বল্পমেয়াদী জীবনে স্থায়ী সম্পদ যদি কিছু থাকে, তার মধ্যে বলতে হয় মানুষের মন জানবার সৌভাগ্য ও তার স্মৃতি।
কালের কবলে আর সবই – কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধন-মান।

শ্রীমতী ভাটনগরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় লেখা পড়ে তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল শিক্ষিতা, বাংলায় মনোরম ও স্বচ্ছ রচনায় পারদর্শিনী, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না এক মহিলার। সম্প্রতি তাঁর ফটো দেখে আমার ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে।

বহুকাল যাবৎ তিনি ক্যানাডার বাসিন্দা ছিলেন, তবু বাংলাভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ লেখার মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়।
আমাদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত বাংলাচর্চা করেন তাঁরা জানেন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ্য, ব্যাকরণশুদ্ধ বাংলায় কোনও ঘটনা বা কাহিনী, কারো জীবনী লেখা কী পরিমাণে পরিশ্রমসাপেক্ষ। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাভাষা পেয়েও সেই ভাষায় মনের সবটুকু ভাব প্রকাশ করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত বাংলার যে রূপটি প্রকাশ পায় তার মধ্যে অকারণে অবাংলা শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমতী ভাটনগরের বাংলা রচনায়, কোন ঘটনার বিবরণে, বিশেষতঃ বিদেশে বাংলাভাষা, সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষের রূপায়ণে যথার্থ বাংলারূপের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি।

পত্রিকায় তাঁর লেখার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সম্পর্কে পরোক্ষে মন্তব্য করার পরে তাঁর লেখা সম্পাদিকার দপ্তরে উপস্থিত হয়েছে। লেখার উৎকর্ষতার প্রশংসা করবার পরে কোন সদস্যের মুখে শুনেছি যে আমার মন্তব্য তাঁর সন্তুষ্টি উৎপন্ন করেছে। অথচ আধুনিক প্রথা অনুযায়ী আমাকে অথবা সম্পাদিকাকে উত্তরে কোনও 'Thank You' কার্ড পাঠাননি। আত্মপ্রচারে অনিচ্ছুক, বিবাহিতা বাঙালি স্ত্রী-জনোচিতা মনের সংকোচ মনে হয় তার একটি কারণ।
ভালমন্দের বিচার না করে তাঁর চরিত্রের এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম।

সবশেষে বলতে হয় দীর্ঘজীবী দম্পতিদের একজনের অভাবে নিঃসঙ্গতা অন্যজনের আয়ু সংক্ষিপ্ত করতে প্রায়ই দেখা যায়। শ্রীমতী ভাটনগরের ক্ষেত্রেও সেই সত্য প্রযোজ্য।
প্রবাস বন্ধুর পক্ষে তাঁর অভাব এক গুরুতর ক্ষতি। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অসিত কুমার সেন

নন্দিতা ভাটনগর

তোমরা যাকে নন্দিতা ভাটনগর নামে জেনেছ, সে আমার বেণুপিসি। সম্পর্কে আমি পিসি, কিন্তু ও আমার চেয়ে বয়সে বড় বলে আমিই পিসি বলতাম। ও আমার বড় পিসিমার নাতনি। আমার বড় পিসিমার বাড়ি ছিল জেজুর গ্রামে, তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল স্টেশনে নেমে সাইকেল রিক্সায় একটু ভেতরে যেতে হয়। আমরা প্রায়ই সদলবলে জেজুরে যেতাম। কটেজ ধরনের তিনটে বিল্ডিং; একটাতে দু'তিনটে শোবার ঘর, আর একটা বৈঠকখানা। তৃতীয়টাতে বিরাট দালান, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর। ঐখানেই বেণুপিসির সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। মা, কাকিমা, পিসিদের মাঝে আদরের দুলালী বেণু। সুন্দর, স্পষ্ট করে কথা বলে, প্রচন্ড কৌতুকপ্রিয়। উচ্ছ্বসিতভাবে হাসতে জানে, নিমেষে মানুষকে আপন করে নিতে জানে। খুব সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে জানে।

বাংলাচর্চা ওর অল্প বয়স থেকে – বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকাতে লিখত। পরে যখন সায়েন্স কলেজে যেত তখন আমাদের কলকাতার বাড়িতে খুব আসত। সায়েন্স কলেজে সত্যপ্রকাশ ভাটনগরের সাথে তার আলাপ, প্রেম ও পরে বিবাহ। বিয়ের পরই ক্যানাডায় চলে যায়; প্রথমে মন্ট্রিয়লে ছিল, পরে অটোয়ায়। পিসেকে (সত্যপ্রকাশ) একেবারে খাঁটি বাঙালি তৈরী করে নিয়েছিল। বিভিন্ন রকম কাজের মধ্যে নিজেকে যুক্ত রাখত বেণুপিসি। ওরা নিঃসন্তান ছিল। একটা ইউরেশিয়ান মেয়েকে দত্তক নিয়েছিল। তার নাম রেখেছিল 'কনিনা'।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকত। ছোটদের দিয়ে নাটক করত – সেই নাটক কখনও স্বরচিত, কখনও বিখ্যাত লেখকের নাটককে নিজেই একটু সংক্ষেপ করে, সহজ করে মঞ্চস্থ করত। মঞ্চসজ্জার যাকিছু ব্যবস্থা সবই পিসে করতেন। খুব সুনাম অর্জন করেছিল ওরা। দেশি বিদেশী প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছিল ওদের। ২০০৪-এ একবার হিউস্টনে এসেছিল।

বুড়ো বয়সে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। পিসেও ডিমেনশিয়াতে ভুগছিলেন। তখন ওরা বাড়ি বিক্রি করে 'ওল্ড এজ হোম'-এ চলে যায়। ছোট্ট জায়গায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আনন্দেই ছিল। যখন কথা বলতাম কখনো কোনো কিছু নিয়ে অনুযোগ করত না। আমাদের পারিবারিক কথা, পুরনো নানান কথা আর কতরকম তথ্য জানতে পেতাম ওর কাছে।

পিসে চলে যাবার পর শুধু বলত, "বড় একলা হয়ে গেলাম রে!" আর নিজে চলে যাবার ঠিক আগে আগে বারবার আক্ষেপ করত, "আমাদের জেজুরের বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। কত স্মৃতি জড়িয়ে ছিল, কিন্তু কে দেখবে বল?" ওর যেন একটা ভেতরকার বেদনা ফুটে বেরোত। চলে গেল আমার অনেক কাছের ভালবাসার একজন মানুষ।

"আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুঃখ সুখে,
আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক, যে গেছে সে চলে যাক
বিস্মৃতির তীরে।"

শুক্তি দত্ত

আমার প্রিয় বন্ধু নন্দিতা ভাটনগর

নন্দিতার কথা লেখা আমার পক্ষে সহজ নয়, কারণ সে ছিল আমার পরম আপন, অন্তরঙ্গ এক বান্ধবী | কারো সাথে আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা যে কত কঠিন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না | নন্দিতার সাথে কিন্তু জীবনে আমার একবারই দেখা হয় | আমার বোনঝি, পল্লী এবং নজরুলসঙ্গীত শিল্পী ডঃ নাশিদ কামাল আমাকে কলকাতায় Dover Lane Music Conference-এ নিয়ে গেলে সেখানেই নন্দিতার সাথে আমার প্রথম পরিচয় | নাশিদ ক্যানাডার অটোয়াতে পড়বার সময় তার স্থানীয় অভিবাবক ছিল নন্দিতা | রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং উচ্চমানের গায়কীতে নন্দিতার পারদর্শীতাও ছিল যথেষ্ট, বিশেষ করে টপ্পা গানে | তার স্বামী ছিলেন সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতির একজন বিরাট পৃষ্ঠপোষক | তাই প্রায়ই তারা গান বাজনার আসর বসিয়ে চিত্ত বিনোদন করত | নাশিদ দেশে ফেরার পরও তাদের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে | তারা একবার কলকাতায় এলে নাশিদ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় | সেই সূত্রে নন্দিতা আর তার স্বামীর সাথে শীতের রাতে জেগে বসে গান শোনা – সেটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা | তাদের সাথে একদিন চা খেতে গিয়ে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের মনোরম জায়গা দেখবারও সুযোগ হয়েছিল |

নন্দিতা ছিল অসম্ভব সুন্দর চরিত্রের এক মানুষ | যেমন সহৃদয়, সরল, তেমনি স্নেহশীল, বন্ধুসুলভ এবং পরোপকারী | তার সাথে আমার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে আমি আমেরিকা চলে আসবার পর | আমাদের দুজনের বয়স প্রায় কাছাকাছি | সপ্তাহে একবার অন্তত আমাদের কথা হতো | কত ধরনের বিষয় নিয়ে যে আলাপ করতাম আমরা তার কোনও হিসাব নেই | বেশিরভাগ বিষয়েই আমাদের মতামত মিলে যেত | আমার তখন জানা ছিল না যে ক্যানাডায় ১ নম্বর দিয়ে ডায়াল করা গেলেও বিলের অংক বেড়ে যায় | একথা জানার পর নন্দিতা আমাকে পরামর্শ দিল, "তুমি ডায়াল করার পর আমি হ্যালো বললে তুমি লাইন কেটে দিও | তখন আমি তোমাকে কল করব, কারণ আমাদের একটা প্যাকেজ আছে যাতে যে কোনো দেশে একই খরচে যথেচ্ছ কথা বলা যায় |"

অল্প কয়েক বছরেই আমার জীবনে নন্দিতা যে অবদান রেখেছে তা অতুলনীয় | কার সাথে যোগাযোগ করলে আমার সুবিধা হবে প্রয়োজনমতো সে জন্য তাদের সাথে আমার সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে | আমার সব সুখে দুঃখে তার কাছে যে উৎসাহ, সহানুভূতি আর সহযোগিতা পেয়েছি তার তুলনা মেলা ভার | পড়াশোনা, লেখালেখি সম্পর্কেও নানা ধরনের অমূল্য উপদেশ ও পরামর্শ সে আমাকে দিত | বলত, "অনেক ধরনের লেখা পড়বে, বুঝেছ? তবেই তোমার জ্ঞানের ও লেখার মান উন্নত হবে | তাছাড়া কী ধরনের লেখা সবাই পছন্দ করে তাও বুঝতে পারবে |" আর নন্দিতা যদি মালবিকার সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে না দিত, তাহলে "প্রবাস বন্ধু"তে লিখবার সুযোগ কি পেতাম?

সে পূর্ববাংলার বগুড়া শহরে এক জনপ্রিয় ডাক্তারের আদরের কন্যা | সেখানে তার শৈশব ও কুমারী জীবন কেটেছে, যে স্মৃতি সে কখনো ভুলতে পারেনি | তার ছোটবেলার কথা সে প্রায়ই বলত | তারা ১৯৪৭ সালে কলকাতায় চলে যায় এবং সেখানে সে বায়োকেমিস্ট্রিতে ভর্তি হয়, সেখানেই পাঞ্জাব প্রদেশের বিজ্ঞানী স্বামীর সাথে তার পরিচয় হয় | এরপর তারা দুজনে স্কলারশিপ পেয়ে মন্ট্রিয়লে পড়াশোনা করতে চলে যায় | অটোয়াতে নন্দিতা নানাভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কাজে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে | ক্যানাডার এক ফরাসী শিশুকে তারা পোষ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং নানান ধরনের শিশুদের কাজে জড়িত হয়ে পড়ে |
তার সাথে আমার সম্পর্ক এতই সহজ ও অকৃত্রিম ছিল যে কখনো সে আমার পূর্ববাংলার কথ্যভাষা নিয়ে কৌতুক করলেও আমাদের মাঝে কোনো বৈরিতার সৃষ্টি হয়নি | যেমন সে যখন ঠাট্টা করে বলত, "তোমরা বলো খাবারটা খুব মজার হয়েছে"| আমি বলতাম, "কেন, কী বলব তাহলে?" তার জবাবে সে বলত, "আমরা বলি খাবারটা সুস্বাদু হয়েছে |" আমি সেটা মোটেই মেনে নিতে রাজী হতাম না, কারণ ওভাবে ভাষাটা আমার কাছে দারুণ পোশাকি শোনাত |

এক কথায় নন্দিতার প্রয়াণে শুধু যে এক গুণী ও সহৃদয় বান্ধবী হারিয়েছি তা নয়; আমার জীবনে এক অতি সুন্দর সুখ দুঃখের সাথী ও উপদেষ্টাকে হারিয়ে ফেলেছি | সে এখন পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে গেছে | প্রার্থনা করি তার আত্মা অনন্তলোকে পরম শান্তিতে বিরাজ করুক |

হুসনে জাহান

নন্দিতা পিসি

নন্দিতা (ভাটনগর) পিসির সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু বহুবার টেলিফোনে কথা হয়েছে। প্রবাস বন্ধুতে লেখা দেওয়া, পত্রিকা পাওয়া, চাঁদা কিভাবে দেওয়া যায়, ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে কথা হতো। ভিন্ন দেশের একজন মানুষের প্রবাস বন্ধুর উপর এমন আগ্রহ ও শুভ কামনা একান্ত বিরল।

আরও একটি কারণে তিনি আমার খুব পরিচিত মানুষ হয়ে উঠেছিলেন – তাঁর জন্মস্থান বগুড়া, আর আমার জন্মস্থান রংপুর; মাত্র ৪০ মাইল দূরে হওয়ায় আমরা পরস্পরকে "দেশী মানুষ" ভাবতাম। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে অনেক কথা হতো। তাঁর বড় আফসোস ছিল যে তিনি সেই ছোটবেলায় বগুড়া ছেড়ে কলকাতা যাওয়ার পর সেখানে যাওয়ার আর সুযোগ পাননি।

তাঁর বাবা ছিলেন ডাক্তার ভক্তসখা বসু। সে সময় বগুড়া শহরে ডাক্তারের অভাব ছিল। তিনি তৎকালীন নওয়াব মোহাম্মদ আলীর আমন্ত্রণে বগুড়ায় আসেন। ডাক্তার হিসাবে তাঁর ভীষণ সুনাম ছিল বলে এবং বগুড়া ভাল লাগায় ডাঃ বসু দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বগুড়াতেই থেকে যান।

পিসির স্মরণ শক্তির প্রশংসা না করলেই নয়। তিনি আমাকে তাঁর বগুড়ার বাড়ির ঠিকানা দেন। যাঁর সাথে বাড়ি বদল হয়েছিল তিনি তাঁর নাম দিয়েছিলেন। কোন রাস্তা ধরে স্কুলে যেতেন সব বলেছেন। কোন রাস্তার কোনায় কি কি ছিল তিনি মনে রেখেছিলেন। নানা কারণে সেখানে আমি যেতে পারিনি। ইদানীং বগুড়া একটি বিরাট শহর। বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজসহ শহরের যা উন্নতি হয়েছে প্রায় সত্তর বৎসর আগে তিনি যা যা দেখেছেন তার কোনকিছু এখন দেখা যাবে কিনা জানি না।

শেষবার নন্দিতা পিসির সাথে কথা বলি তাঁর স্বামী সত্যপ্রকাশ ভাটনগরের মৃত্যুর (৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮) পর। তখন তিনি অটোয়া, ক্যানাডার একটি বৃদ্ধাশ্রমে বাস করতেন। সেদিন শুধু একলা থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে অভিযোগ করতে শুনিনি। তাঁর প্রফুল্ল মন, পরিচ্ছন্ন হৃদ্যতা বদলায়নি। মাঝে তাঁর দেওয়া ফোন নম্বরটি কাজ করছিল না। সেইজন্য আর তাঁর খোঁজ করতে পারিনি। হাস্যোজ্জ্বল মানুষটি গত ১লা মে ২০২০-তে চলে গেলেন।

এই সবুজ মনের মানুষটির জন্য কয়েকটি পঙক্তি উৎসর্গ করছি –

সবুজ মন

গেঁথে রাখে অতীতের স্মৃতি, ঘটন-অঘটন;
জীবন্ত রাখে বন্ধু-স্বজন, ফেলে আসা পথঘাট
দীঘি-নদী-নালা, স্কুল-কলেজ, খেলার মাঠ –
অতীতে চলে যেতে পারি অনায়াসে
যখন যা ভাবি তা দ্রুত সামনে ভাসে।

ভজেন্দ্র বর্মন

নন্দিতা-পিসি

নন্দিতা ভাটনগর থাকতেন ক্যানাডায়। আমরা কেউ তাঁকে দেখিনি। কেবল ওঁর মন ছুঁয়ে যাওয়া লেখাগুলি পড়ে অভিভূত হতাম।

আমার সঙ্গেও ওঁর সেভাবেই আলাপ। প্রথম যেদিন তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন সেদিনই বলে দিয়েছিলেন – তুমি যদি শুক্তিকে দিদি বলো, তাহলে আমাকে নন্দিতা-পিসি সম্বোধন করো। গোড়া থেকেই ওঁর আন্তরিকতা খুব ভাল লেগেছিল। প্রায়ই ফোন করতেন। আমিও করতাম। কত যে গল্প করতেন – নিজের ছোটবেলার কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা। কথা বলতে ভালবাসতেন, এবং এত সুন্দর গুছিয়ে, সপ্রতিভভাবে কথা বলতেন যে শুনতে খুব ভাল লাগত।

সবথেকে মজা লাগত – নন্দিতা-পিসির স্বামী ছিলেন পাঞ্জাবী; ফোনে কথা বলার সময় শুনতে পেতাম পেছনে গান চলছে। কী গান শুনছেন জানতে চাইলে বলতেন – আর কোনও গান শোনার কি উপায় আছে তোমাদের পিসেমশাইয়ের জন্য? সব সময় ওই রবীন্দ্রসংগীতই শুনতে হবে সারাটা দিন।

কর্তা-গিন্নি দুজনে থাকতেন। শেষদিকে সুবিধার কারণে চলে গিয়েছিলেন অন্য বাসস্থানে। দুঃখ হয় যে তারপর থেকে আর যোগাযোগটা তেমন ছিল না। তারপর এই বছরের মে মাসে জানতে পারলাম নন্দিতা-পিসি চলে গেলেন। মনের দুঃখটা ভীষণভাবে নাড়া দিল আবার।

আমরা যারা নন্দিতা-পিসির লেখা পড়েছি বা দূর থেকে হলেও তাঁর সঙ্গে খানিকটা যোগসূত্র তৈরী হয়েছিল, তারা সবাই নন্দিতা-পিসির অভাব আমাদের জীবনে এবং এই পত্রিকায় অনুভব করব।

নন্দিতা-পিসির আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

মালবিকা চ্যাটার্জী

বহু মানুষ ২০২০ সালে করোনার মহামারীতে প্রাণ হারিয়েছেন।
তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি।
আমাদের এই বিশ্বজোড়া অসময়ে বহু মানুষ ভেদাভেদ ভুলে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত।
তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।
ডাক্তার, নার্স, যাঁরা নিজেদের জীবন, নিজেদের সংসার একপাশে রেখে দিবারাত্রি করোনা আক্রান্ত মানুষের শুশ্রূষা ও সেবা করে চলেছেন, তাঁদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

তুমুলবাবুর ভাগ্যদোষ

যশোধরা রায়চৌধুরী

তুমুলবাবুর কথা আর বেশি না বলাই ভাল | আমাদের পাড়ার সবচেয়ে গোবেচারা প্রাণীটি | কাব্যলক্ষ্মী ধোঁকা দিল | আমফান নেট চুরি করে পালাল | করোনাদেবীর আশীর্বাদ মাথায় এল না |
অধুনা করোনাকাল, পাড়ায় পাড়ায় মোড়ে মোড়ে করোনামাতার মন্দির গজিয়ে উঠেছে, মেয়েবউ, খুড়ো-শালা-মেসো সবাই লাইন দিয়ে গিয়ে করোনার পদে নতি জানায়, করোনার থানে মাথা কোটে | তুমুলবাবুও ঠোকেন |

তুমুলবাবু যে জায়গায় থাকেন, মানে আমরা যে জায়গায় থাকি এ বাংলার সেটা না শহর, না গ্রাম | তবে অধুনা সব শহর, সব গ্রাম | মানে গ্রামগুলিও চেহারায় শহর | আবার শহরগুলিও ভেতরে ভেতরে গ্রাম | অথবা উল্টোটা | সবার হাতে হাতে হাথক দর্পণের মতো একটা করে স্মার্টফোন | মনগুলো সব অন্ধকার, আনস্মার্ট | শহুরেরা যদি গ্রাম্য হয়, পড়শির ভাল দেখতে না পারে, তাহলে আর কী বলা চলে | আর করোনাকালে তো সবাই সবাইকে সন্দেহ করে |

রোজ সকালে ও পাড়ার টোটোওয়ালা, পচা – টোটোর ব্যবসা লাটে উঠেছে বলে এখন টোটোতে করে মাছ নিয়ে আসে | তুমুলবাবুরা সে মাছ কেনেন |
আর কী বলব! এতদিন রূপকার্থে বলা হতো, কলিকালে সবার মুখে মুখোশ | এখন সত্যি সত্যিই সবার মুখে মুখোশ | লাল মুখোশ, নীল মুখোশ | সুতির মুখোশ, ডাক্তারি মুখোশ | এন নাইনটিফাইভ বলে একটা আছে, সে একেবারে যেন হনুমানের মুখ বানিয়ে ছাড়ে |
তুমুলবাবুর মুখোশ পুরনো হয়ে এসেছে, কান থেকে ঝুলে ঝুলে পড়ে, অর্ধেক সময়ে সে মুখোশ মুখের নিচে ঝোলে |
তুমুলবাবুর এককালে ছিল ছাপাখানার ব্যবসা | প্রথমে তো ছাপাখানার কম্পোজিটরদের সরিয়ে, টাইপ ফেস বসানোর প্রয়োজনটাই উঠে গেল | সব বদলে ডি.টি.পি, কম্পিউটার, এইসব ছাতার মাথা হয়ে গেল | প্রথমে খুব লস খেয়েছিলেন | পৈতৃক ব্যবসা | আবার নতুন করে ঢেলে সাজাতেই হ'ল | সেই থেকে পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলানোর অভ্যেস শুরু হ'ল তুমুলবাবুর | আজও মিলিয়ে চলেছেন | গিন্নি 'সুখি', ভাল নাম সুখলতা যেমন | ভীষণ জাঁদরেল কর্মঠ মহিলা | সে বহু বহু বচ্ছর আগে, তুমুলবাবুর মনেই পড়ে না, বিয়ে হয়েছিল শাড়িপরা জবুথুবু এক মেয়ের সঙ্গে | কিন্তু ক'দিন পরেই সে গিন্নিও আর রইল না, সে জবুথুবু ভাবও উধাও হ'ল | শাড়ির ধার আর মাড়াল না সে | কাজে অসুবিধা হয় এমন কিছুই সে বরদাস্ত করে না | সুখির রোজকার পোশাক আগে ছিল সালোয়ার কামিজ | তাও ব্যাগি | নব্বই দশকের জুহি চাওলা মেজাজে খাপসই | এখন সে করিনা মেজাজ, কঙ্গনা মেজাজ সব পেরিয়ে এসে আলিয়া মেজাজে উপনীতা | সুখি ঢলঢলে টি-শার্ট, বা তুমুলের পুরনো পাঞ্জাবি টপ করে পরে, আর তলায় ঢোলা সালোয়ার | এই পরেই সে ব্যাংক, বাজার সর্বত্র দাপিয়ে বেড়ায় | বাজখাঁই গলায় লোকেদের সঙ্গে তর্ক করে | কারুর তোয়াক্কা না করে সে নিজের বুটিকের ব্যবসা থেকে স্বামীর প্রেসের ব্যবসা সব চালায় | তুমুলবাবু এখন স্ত্রীর কর্মদক্ষতার অক্ষর সমূহের পাশে একটি হাইফেন |

ইদানীং লকডাউন তাই সুখির অসুখ | বাইরে দাপিয়ে বেড়াতে না পেরে, আর কর্মসহায়িকা চামেলির অনুপস্থিতিতে সুখি একটু জেরবার | সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে হাত খসখসে, তাই মনও খসখসে | কাজ বন্ধ, প্রেসের ছেলে মাণিক আর রতনকে মাইনে দিয়ে বাড়ি পাঠাতে তুমুলবাবুর হেবি কষ্ট হচ্ছিল, তাও সুখিই জোর করে সেটা করিয়েছেন | চামেলিকেও মাইনে দিয়েছেন | তারপর নিজেই কাপড়কাচা, বাসনমাজা, রান্নাকরা | ঘরমোছার ডান্ডা কিনে এনে তুমুলকে ধরিয়ে দিয়েছেন, নিজের বাসনটুকুও মেজে রাখতে বলেছেন | তারপরেও হরেক কাজ থাকে সুখির | আগের মতো বাইরে এদিক ওদিকে তদারকি একেবারেই বন্ধ |

প্রথম কয়েকদিন ভেবেছিলেন সবাই, লকডাউন দিনকয়েকের | তুমুলবাবু বিশাল শুকনো বাজার করে মুদির দোকান সাফ করে এনেছিলেন | সকালে খিচুড়ি ও রাতে ম্যাগি খেয়ে মুখ প্রায় পচে গেছে যখন, একদিন সকাল সকাল সুখি সকালের চা ঠকাশ করে তুমুলের সামনে নামিয়ে বললেন, তা, লকডাউন তো মনে হচ্ছে এক্সটেন্ড হতেই থাকবে | তা, এতদিন তো বাজারহাট রান্নাবান্না বন্ধ থাকতে পারে না | আমিই বেরোই তবে? কতদিন আর আলুভাজা আর খিচুড়ি খাব! ভুঁড়ি বেড়ে গেল তো |
তুমুল একদিন কাঁচুমাচুভাবে মুখোশ গলায় ঝুলিয়ে বেরুলেন |

সুখি একগোছা মুখোশ কিনেছেন, সেইসব মুখোশের দিকে ফিরেও না তাকিয়ে একখানা সার্জিকাল মুখোশ কেবল ধুয়ে ধুয়ে পরছেন তুমুল।

কথিত আছে মুখোশ চার প্রকার।

এক - প্রপার মুখোশ, যা নাক থেকে মুখ অবধি আবৃত করে।

দুই - দাড়িমুখোশ, যা গালপাট্টা বা চাপদাড়ির মত থুতনিতে লাগানো থাকে। নাক ও মুখ অনাবৃত থাকে।

তিন - যা কান থেকে ঝোলে, পৈতে মুখোশ।

চার - কণ্ঠি মুখোশ, যা ঝুলতে ঝুলতে গলায় এসে ঠেকেছে।

মোড়ের মাথায় করোনামাতার থানে পি.পি.ই পরা পুরোহিত একফোঁটা চরণামৃতের বদলে একফোঁটা স্যানিটাইজার দিল, সবাই ঠোঁটে ঠেকিয়ে মাথায় মুছে নিল। সবার দেখাদেখি তুমুলবাবুও তাই করলেন। তারপর হেঁটে বাজারে গিয়ে দেখেন বাজার উঠে পার্কে চলে গেছে। একটা বিশাল প্ল্যাকার্ডে অ্যারো দিয়ে লেখা আছে ওইদিকে গণেশ পল্লীর দুর্গাপূজা মন্ডপের জন্য নির্দিষ্ট পার্কে যান। বাজার বসেছে।

গিয়ে দেখেন সোশাল ডিস্ট্যানসিং মেনে দূরে দূরে সবজি, মাছ-মাংসের দোকান বসেছে। সব অচেনা মুখ। ভাল শার্ট-প্যান্টপরা ছেলেপিলেরা বাজার নিয়ে বসেছে, প্রত্যেকের মুখে মুখোশ, হাতে গ্লাভস। পুরনো সবজিওয়ালারা নাকি ভ্যান গাড়ি নিয়ে ভোর পাঁচটা থেকে পাড়ায় পাড়ায় হেঁকে হেঁকে বিক্রি করছে। সুখি অত সকালে ওঠে না, তাই ভ্যান থেকে সবজি কেনা আর হয়ে ওঠে না।

অচেনা, সুভদ্র সবজি বিক্রেতাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন তুমুলবাবু। চাপদাড়ি মুখোশের ওপর দিয়ে সবজি বিক্রেতার সঙ্গে যে কথোপকথন হ'ল তা এই প্রকার –

- হ্যাঁ রে, সরি, হ্যাঁ হে, পটল কত করে?

- মিনিমাম দু'কিলো, একশো টাকা করে।

- কী বলছিস, সরি, কী বলছেন? এত দাম! মিনিমাম দু'কিলো কেন?

- প্রথম প্রশ্নের উত্তর – আম্ফান ফনি হু লালা নিসর্গ ইত্যাদি সাইক্লোন টাইফুন সবকিছুর ফলে আনাজপাতির দুর্লভতা। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর – প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে, স্যানিটাইজ করা পটল পাচ্ছেন।

- মাথায় কিছু ঢুকছে না। এত বড় বড় বক্তৃতা তো দিচ্ছ, আনাজ ভাল হবে কি?

- নিয়ে গিয়ে একঘন্টা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটে চুবিয়ে রাখুন। তবে তারপর আর খেতে পারবেন না হয়তো, নষ্ট হয়ে যাবে।

- বাহ, বেশ অকাতরে বলে দিলেন তো?

- আরে ওসব করা তো বাধ্যতামূলকই। যাইহোক, কী নেবেন বলুন।

- আরে, দাও দাও দিয়ে দাও যা পারো। কুমড়ো পটল ভিন্ডি ঝিঙে। লেবু লংকা কই?

- তুমি বলবেন না আপনি বলুন। ওই তো, ছোট প্যাকেজিং-এ প্যাক করেই রেখেছি।

- সরি, আপনাকে নতুন দেখছি। মাস্কের মধ্যে দিয়ে যদিও কারুকেই চেনা যায় না।

- হ্যাঁ এবার থেকে আমাকেই দেখবেন। আমি সংবাদ সফর পত্রিকার সাব এডিটর ছিলাম। চাকরি চলে গেছে, এখন সবজি বেচছি। ফল নেবেন? ভাল ফল আছে। ওই যে ছেলেটি, ও আমাদের কাগজের স্টাফ ফটোগ্রাফার ছিল। দারুণ ফল বেচছে। আর মাছ যিনি বেচছেন, উনি প্রখ্যাত নাট্যকর্মী।

- উফফফফ, কী অবস্থা!

- হ্যাঁ, আলু ক কিলো? মিনিমাম প্যাকেজিং পাঁচ কেজি।

তুমুলবাবুর সামনেই এক মুশকো জোয়ান রাগী রাগী চেহারার যুবক এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়।

- কী ব্যাপার মশাই, আপনারা এখানে সবজি বেচলে আমার ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে যে বিক্কিরি করছে তার কী হবে?

- আপনার ছেলেগুলো? মানে?

তেড়িয়া হয়ে উঠলেন এই সাব এডিটর সবজি বিক্রেতা। চশমায় মুখোশের ভাপ জমেছে, চোখ ভাল করে দেখা যায় না।

- আমাদের পুরনো সবজিওয়ালারা।

- হুঁ, তা তাদের বলুন না অলিগলি চলি রাম করে যত পারে বেচতে। আমরা তো এখানে বসে বেচছি। বিরোধ কোথায়?

- আপনারা তো সব ইন্টেলেকচুয়াল, উঁচুতলার থেকে অনুপ্রাণিত পাস বানিয়ে এখানে এসে বেচছেন। এভাবে চললে আসল সবজিওয়ালারা মার খাবে।

- আসল না নকল – গায়ে কি সার্টিফিকেট লেখা আছে? আপনারা সব সিন্ডিকেটবাজ। তাই এসব ভুলভাল কথা বলছেন। কেউ মার খাবে না। খদ্দের আর বিক্রেতার মধ্যে রেশিও ঠিক আছে। আমার খবর যারা খেত, ওই ছেলেটার ফটো যারা খেত, তারা এখন করোনার ভয়ে খবর কাগজ কিনছে না। তার বদলে বাজার করছে। একমাত্র একটাই জিনিস কিনতে পারছে, মুদির

জিনিস আর সবজি মাছ ফল মাংস | তা তারা তাই কিনছে | যাই বিক্রি করুন, বিক্রি হবেই | মার কেন খাবে | সর্ব বেচনেওয়ালার সহাবস্থানে আমরা বিশ্বাস করি |

- না না, আপনাদের পাস দেওয়ার পেছনে এপাড়ার বড়লোক লেখাপড়াজানাদের নেপোটিজম আছে |

- তাই? আর ওদিকে যে গয়নার দোকানের মালিক মাংসের দোকান খুলল, অত্তবড় লাইন পড়েছে চিংড়ি মাছের জন্য ওই লোকটা তো শাড়ির দোকান চালাত, ওদের পাসগুলোর পেছনে কোনো নেপোতত্ত্ব নেই?

- সবেতেই আছে, তা আমার ছেলেরা তো আর বানের জলে ভেসে আসেনি?

- শুনুন, পাশের মাঠ ফাঁকা আছে, ওদিকে আবার ওদের ছ'ফুট দূরে দূরে বসিয়ে দিন না | কী আছে | লোকে তো এখন সবজি বাজার মাছ মাংস বাজার করেই পকেট ফাঁক করছে | সেলুন বন্ধ, বিউটি পার্লার বন্ধ, সকাল বিকেল আড্ডার ঠেক বন্ধ, চা দোকান বন্ধ | ওই একটি জিনিস অ্যালাউড | ওটাই সবাই করছে |

২

বাড়ির সামনে পচা তখনো আসতে শুরু করেনি | এর পর করবে | সবাই জলের ওপরে নাক তুলে নিঃশ্বাস নিতে শিখছে | তাই পচা আর কদিন বিনা কাজে বসে পচবে | সংসার চালাতে অন্য পেশায় যেতেই হয় | সে মাছ আনলে পাড়ার সব আবালবৃদ্ধবনিতা এসে নামেন তার টোটোর আশেপাশে |

- কী রে পচা, আজ তোর মাছ কতটা পচা?

এই দিয়ে কাহানি শুরু হয় | তারপর একে একে পচার সব মাছ উঠে যায় | বিশাল কাতলা বগলদাবা করে প্রথমে বেরিয়ে যান ডাক্তার বোস | তারপর আধখানা রুই, সেমি ভেটকি, আড় মাছের ঘাড়... কিছু আর পড়ে থাকে না | প্রাইজ পাওয়া মুখ করে তুমুলবাবু সেদিন ঘাড়ের মাছ নিয়ে ঢুকলেন | ও বাড়ির মনুদার নেওয়া কাতলার অর্ধেক | ওঁর আবার ল্যাজা পছন্দ | এরকম মানুষও আছে |

সুখি প্রথমে খুশি, তারপর অখুশি হলেন | কারণ পচা টোটো-চালক | মাছবিক্রেতাদের মতো অনায়াসে আঁশ ছাড়াতে পারেনি | অপটু হাতে কোনমতে কেটেকুটে দিয়েছে | সুখিকে প্রচুর ধস্তাধস্তি করে মাছটাকে আঁশমুক্ত করতে হ'ল |

একে তো মাছওয়ালা মাছের সঙ্গে করোনা দিচ্ছে কিনা এটা জানা নেই | তাই আধচামচ সার্ফ গোলা জলে বাড়িতে আসা সমস্ত প্যাকেট ডোবানো হয় | দুধের দইয়ের পনিরের পাউরুটির মাছের সবজির | তারপর সে প্যাকেট জল থেকে তুলে হাওয়ায় রাখা | সাবান করোনানাশক | করোনামাতার থানে এক টুকরো সাবান প্রসাদী করে আনলেই ব্যাস কেল্লা ফতে | সাবানে নিজেকে বার বার ধুয়ে ফেলা সুখির এখনকার একমাত্র ব্যসন | এদিকে ভুরু প্লাক করতে পারেননি সুখি বহুদিন | বিউটি পার্লারে করোনাভীতি | তাই কপালে শুয়োঁপোকা, চুল সর্পিল টিকটিকির লেজ | কাজ করে করে নখ ভেঙে গেছে, হাত এবড়ো-খেবড়ো | এমতাবস্থায় সাবানের জল একমাত্র আশ্রয় |

সুখি মাছ কুটল, ভাজল, তারপর মুখোশ খুলল, তারপর স্নান করল, তারপর মুখোশ কাচল | বারান্দায় সার সার মুখোশ কেচে শুকোচ্ছে | সেসব মুখোশের দিকে তাকিয়েই সুখির মাথায় একটা বাল্ব জ্বলে উঠল | প্রেস অনেকদিন বন্ধ, যেসব ইশকুলের পাঠ্যবই ছাপা চলছিল সেসবের তাড়া নেই, সব ইশকুল বন্ধ | এইবেলা একটা অন্য কাজ করলে কেমন হয়?

সুখি অনলাইন ম্যাগাজিন বার করবে, নাম দেবে 'মুখোশ'| যেই না ভাবা, রান্নার কথা ভুলে কাচাকাচির কথা ভুলে সুখি সোজা চলে গেলেন তুমুলবাবুর কাছে | একটা বহু প্রাচীন খবরের কাগজ পড়ছিলেন তুমুল তখন | এখন আর কাগজ রাখা হচ্ছে না, তাই পুরনোটাই পড়ে চলেছেন ক্রমাগত | সুখির মতো ফোনে অনলাইন খবর পড়া অভ্যেস হয়নি | এক পরিবারের ভেতর যেন দু-দুখানা প্রজন্মের ফারাক | সুখি পুরনো কাগজ কেড়ে নিয়ে বলল, - এইজ্জো! আমি ম্যাগাজিন বার করব | তুমি হবে সম্পাদক | ইশকুলে থাকতে কবিতা লিখতে না? সেই যে একটা লিখেছিলে, সুন্দরী ডায়না বসে দেখে আয়না সব্বাই মানা করে তবু করে বায়না? আর ওই যে একবার লিখেছিলে, ক্রিকেট খেলার বল/ গাছের তলার ফল?

- ম্যা-গা-জি-ন? ক্কী করে বার করব? প্রেস তো বন্ধ!

- ছোঃ, কিচ্ছু বোঝ না, জানো না, একেবারে বুদ্ধু তুমি । ই-ম্যাগাজিন করব | ই-ম্যাগ |

- ই?

- ই, মানে ইলেকট্রনিক | ডিজিটাল | ফোনে বা কম্পুতে পড়বে লোকে | কাগজ লাগবে না | বুঝলে?

- তারপর? কিনবে?

- না, আপাতত বের করতেও টাকা লাগবে না | লোককে বেচাও যাবে না | ফ্রি, সব ফ্রি | দেখছ না বড় বড় হাউজের কাগজ ফ্রিতে দিচ্ছে? আমরা পয়সা চাইব? লোকে দেবে কেন?

- বের করতে টাকা লাগবে না, কিরকম?

- মানে, নেট লাগবে; সে তো আছে। ডেটাপ্যাকেই হবে | ফ্রি ব্লগ সাইট দিয়ে ম্যাগ বেরুবে |
তুমুল চেয়ে রইলেন যেন হিব্রু ভাষা শুনছেন |

সুখি কাজে নেমে পড়লেন | তাঁর প্রথম কাজ হ'ল তুমুলের একটা ইমেল অ্যাকাউন্ট, তারপর একটা ফেবু অ্যাকাউন্ট খোলা | তার জন্য প্রোফাইল পিক চাই |
পিক? পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়? ওরে বাবারে!
তুমুল মাস্ক নামিয়ে দাঁড়ালেন, মাথায় একটা বেসবল টুপি বসিয়ে সুখি ছবি তুললেন | আজকাল যেন টুপি, মাস্ক এসব না দেখা গেলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে | মনে হয় যথেষ্ট জামাকাপড় পরা হয়নি |
ছবি উঠে গেল | ফেসবুকে তুমুলের নাম দিলেন সুখি, আমি তুমুল মুখোশ পত্রিকা | নিজে প্রথম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালেন | তারপর নিজের ফেবু বন্ধুদের সবাইকে বলে বলে অনেক ফ্রেন্ড করালেন | এরপর পত্রিকার কাজ | লেখক চাই | লেখক |
আজকাল ফেবুতে লেখক সবাই | কিন্তু কেউ আর লেখেন না | লকডাউনে সবাই ভিডিও করেন | ভিডিওতে কবিতা বলেন, গল্প বলেন | দু'মিনিট কবিতা আর দশ মিনিট কারেন্ট সিচুয়েশনের ওপর বক্তৃতা | এ এক দুঃসময়, পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন... ইত্যাদি বলেন | লকডাউনে সবাই ফেবুতে লাইভ করেন | লাইভে এসে সবাই পর্দার পানে চেয়ে থাকেন | ক্যামেরায় উঁকিঝুকি দেন | অপেক্ষা করেন কখন শ্রোতাকুল আসবে | এই করে আরো পাঁচ মিনিট যায় | সর্বমোট কবিতা পাঠ দশ শতাংশ | বাড়ির দেওয়াল, দেওয়ালে রবি ঠাকুর থেকে কার্ল মার্ক্সের ছবি অবধি ফোকাস | অনেক বইয়ের তাকে ফোকাস | ভাল পর্দা, ভাল আলো চাই | সব করতে করতেই লেখক এখন ক্লান্ত | লিখবেন কখন | তবু কয়েকজন লেখক পাওয়া গেল | এবার প্রচার চাই | শেয়ার চাই | পত্রিকা বেরুবার আগাম নোটিস ঝোলানো চাই |

পত্রিকার কাজ যে রাতে সম্পূর্ণ রেডি, সেই রাতেই ঝড় এল আবার | আমফানের পর সাম্পান ঝড়ে ইলেকট্রিকের পোল উল্টে, মোবাইলের টাওয়ার উল্টে সর্বনাশ করে গেল আবার |
নেট নেই আর | ই-ম্যাগ বেরবে ক্যামনে | সুখির মাথায় হাত | তুমুলের বুঝি আর সম্পাদক হওয়া হ'ল না | এদিকে সম্পাদকীয় রেডি |
ঝড়ের পরদিন সবাই আবার রাস্তায় | তুমুল বাজারে গিয়ে দেখেন সাব এডিটর আজ ঝিঙে এনেছেন | দুকেজি ঝিঙে প্যাক করে দিতে বলে তুমুল বললেন, - আমার পত্রিকা, 'মুখোশ' বেরুবে শিগ্গিরই | ই-পত্রিকা | লেখা দেবেন নাকি? তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে তুমুল মুখ নামিয়ে বললেন, - সম্পাদকীয় লিখিচি একখানা, একবার শুনুন তা!
পকেট থেকে নোটবুক বের করলেন তুমুল | এখনো খাতা কলমে মতি আছে তাঁর | তাই এ যাত্রা তাঁর সাহিত্যকর্ম বেঁচে গেছে | ফোনে চার্জ নেই, নেট নেই | তবু সাহিত্যের রথ থেমে থাকার নয় | সে গড়গড় করে ছুটবেই |
সাব এডিটর আলুর ঝুড়ি নামিয়ে রেখে পকেট থেকে এক দিস্তে কাগজ বের করলেন | ঘামে জেবড়ে গেছে তবু পড়া যায় | কলেজ জীবনে কবিতা লিখতেন | কবিতার তাড়া আজও পকেটে আছে | দেবেন নাকি তুমুলকে | রসিক পাঠক আর কতই বা পাওয়া যায়!

এক নৈশ সফর ও ডোরাকাটা শমন

অলোক কুমার চক্রবর্তী

ঘটনাটি অনেকদিন আগের – ১৯৬৪ সালের শেষ দুটি দিনের কথা | সাড়ে দশ বছর বয়সী আমি চিকিৎসক পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর কর্মসূত্রে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রমণের সঙ্গী | নেপাল সীমান্তের "কোশী ড্যাম প্রজেক্ট" থেকে মাত্র দশদিন আগে ওড়িশার ঝাড়সুগুডার কাছে ইব নদীর পাড়ে "ইব রিভার ব্রিজ প্রজেক্ট"-এর ক্যাম্পে এসে থিতু হতে না হতেই সেখানকার কাজ বিশেষ কারণে সাময়িক স্থগিত হয়ে গেল | আর সেই সময়ই মধ্য প্রদেশের এক প্রত্যন্ত এলাকায় "গোপদ রিভার ব্রিজ প্রজেক্টে" একটি বড় ধরনের দুর্ঘটনায় কিছু চিকিৎসা বিভ্রাট দেখা দেওয়ায় আদেশ এল ইব প্রজেক্টের ডাক্তারকে, অর্থাৎ বাবাকে তৎক্ষণাৎ যেতে হবে গোপদে | অতএব, আবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে রওনা! সেসময়ে এত ট্রেন চালু হয়নি | এখনকার মতো এত রাস্তাঘাট বা সড়ক পরিবহণের সুবিধাও ছিল না | যাইহোক, ৩০শে ডিসেম্বর বিকেলে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ এলাম বিলাসপুর | সেখান থেকে আবার রাত ন'টায় শাহডোল যাওয়ার জন্য কাটনী লাইনের ট্রেন – ঘন জঙ্গল ভেদ করে রাতের আঁধারে ছুটে চলল গাড়ি | বলে রাখি – তখন মাত্র অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ মেল ট্রেনে বাতানুকূল কোচ থাকত | এছাড়া সর্বত্রই প্রথম শ্রেণীর কোচই সর্বোচ্চ মর্যাদার | ডবল কম্বলের উষ্ণতাকে হার মানিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঘুম ভাঙিয়ে দিল | গুমগুম আওয়াজ জানান দিল ট্রেন সুগভীর 'খাডরা নালা' পার হচ্ছে | তারপরেই ঢুকল "খাডরা টানেলে" – দেখতে পাচ্ছি না কিছুই | শুধু শব্দের পরিবর্তন আর সহযাত্রীদের কথায় জানতে পারছি | অমরকন্টকের প্রবেশদ্বার পেন্ড্রা রোড, অনুপপুর পার হয়ে ভোর চারটে নাগাদ এসে নামলাম শাহডোল স্টেশনে |

হাড়ের ভেতরসুদ্ধ কাঁপিয়ে দেওয়া ঠাণ্ডায় জমে যেতে যেতে ঢুকলাম ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে | সেখানে আগের যাত্রীদের জ্বালিয়ে যাওয়া কিছু আগুন ও আংরা তখনও ছিল | সঙ্গী আমাদের কাজের লোক সুনীলদা তাড়াতাড়ি কিছু কাঠ ফায়ারপ্লেসে ঢুকিয়ে দিয়ে আগুনটা জোরালো করে দিল | আমরা পুরো হাত-পা ফায়ার প্লেসে ঢুকিয়েও যেন ঠাণ্ডা কাটাতে পারছি না | মনে হচ্ছে ভেতরের হাড়গোড়সুদ্ধ ঠকঠক করে কাঁপছে | সেসময় সমতলেও যে কোনো ভাল স্টেশনেই ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুমে ফায়ারপ্লেস থাকত | প্রসঙ্গতঃ বলি, পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও, এমনকি শীতকালে কাশ্মীর, দার্জিলিং, সিকিম বা অন্যান্য বিখ্যাত ঠাণ্ডার জায়গায় থেকেও শাহডোলের ওই একটি ভোরের তুল্য ঠাণ্ডার অনুভূতি আর কখনো পাইনি; হয়তো প্রস্তুতি ও আন্দাজ না থাকায় |

আমাদের গন্তব্যস্থল যদিও আমরা শুনেছি "গোপদ", আসলে গোপদ হ'ল মধ্যপ্রদেশের রোহিলখন্ড ও বিন্ধ্যাচল এলাকায় শোনের এক উপনদী | তারই ওপর দিয়ে একটি রেলসেতু তৈরি হবে – কাটনী থেকে রবার্টসগঞ্জ হয়ে চুনার পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেলপথে | এই জায়গাটিকে কেন্দ্রবিন্দু ধরলে, তখন এর চারিদিকে দু-আড়াইশো কিলোমিটারের মধ্যে কোনো রেলপথ বা স্টেশন নেই | এই রেলপথ পাতা হলে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে থাকা রেলপথবিহীন অরণ্যাঞ্চলের বুক চিরে তা চলে যাবে – এক নতুন সংযোগ স্থাপন করে অগম্য অঞ্চলকে করে তুলবে সুগম | বাস্তবে তাই হয়েছে | আমাদের যেতে হবে শাহডোল থেকে বাসে প্রায় দুশো কিমি দূরে "সীধী" নামে আরেকটি জেলা শহরে | সেখান থেকে কম্পানির গাড়িতে আরও শ'খানেক কিলোমিটার গিয়ে প্রোজেক্ট সাইট ও ক্যাম্প | সকাল ছ'টায় প্রথম বাস সীধী যায় মুঝৌলি হয়ে | কিন্তু এখান থেকে ঘুরে যাওয়া একজন সাবধান করে দিয়েছিলেন, "লাল মুঝৌলিওয়ালি বাস to be avoided." রুটের দুর্গমতা ও ঘুরপথের কারণে | তার দরকার হ'ল না | শাহডোলের স্টেশন-মাস্টার জানালেন, আমাদের নেওয়ার জন্য কম্পানির গাড়ি আসছে, আমরা যেন বাস না ধরি | সকাল সাতটা নাগাদ কিশোর তাম্বুলকর ড্রাইভার এল জিপ নিয়ে | জানা গেল, এই জিপ আমাদের সীধীতে কম্পানির ট্রানজিট গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিয়ে আবার শাহডোল ফিরে আসবে সন্ধ্যার ট্রেনের দুই আগন্তুককে নিতে | ডাক্তার সাহেবের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ি প্রজেক্ট সাইট থেকে সীধী এসে আমাদের নিয়ে যাবে |

৩১শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে চলল আমাদের জিপ | ছোট শহর এলাকা পার হতেই ঘন জঙ্গল আর কাঁচা, এবড়োখেবড়ো, ধুলোয় ভরা রাস্তা | গাড়ির গতি কমলে, বা কোনো প্রয়োজনে থামলে কিংবা পাশ দিয়ে অন্য গাড়ি গেলেই জিপের ভেতরটা ভরে যাচ্ছে ধুলোয় | মাঝে মধ্যেই পার হতে হচ্ছে জানা অজানা নানান নদী ও নালা | হালোঁ, দুধিয়া, বনাস এইসব ছোট নদী যেমন আছে, আবার অজানাও অনেকে | কোথাও নিচু ব্রিজ বা Cause Way, কোথাও বা তাও নেই, অল্প জলের প্রবাহিনী – নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে স্বচ্ছ স্রোত পার হয়ে গেল গাড়ি | সমস্ত রাস্তায় দুটি মাত্র গঞ্জ মতো জায়গা পেলাম – জয়সিংহনগর ও বেওহারী | বেলা সাড়ে বারোটার পর এসে পৌঁছলাম সীধী ট্রানজিট গেস্ট হাউসে | আমাদের আসার খবর জানা থাকায় মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা তৈরি পাওয়া গেল | গরম জলে স্নান করে আগে দূর করতে হ'ল শরীরে-নাকে-মুখে বসে যাওয়া ধুলোর আস্তরণ | পূর্বপরিচিত এঞ্জিনিয়ার কুলকার্নি আঙ্কলকে এখানে পেলাম গোপদ যাওয়ার অপেক্ষায় | দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরেই সীধী থেকে রওনা দেওয়ার কথা থাকলেও নির্দিষ্ট জিপটির কিছু মেরামতির প্রয়োজনে দুপুরে গেস্ট হাউসের আরামদায়ী বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে একটু ঘুমোনোর সুযোগ পাওয়া গেল | সন্ধ্যার আগে রওনা হওয়া যাবে না | তাই শেষ বিকেলে কেয়ারটেকারের সহায়তায় শহর দেখতে বার হওয়া গেল | জেলা সদর হলেও খুবই ছোট শহর | একটি পিচের রাস্তা ছাড়া বাকি সবই কাঁচা | ধুলোয় ভরা চতুর্দিক | বাসস্ট্যান্ড থেকে নানাদিকে যাওয়ার বাস ছাড়ছে | এছাড়া পরিবহণ ব্যবস্থা বলতে ঘোড়ায় টানা টাঙা আর রিকশা | বেশিরভাগ ঘরদোরই খোলার চালওয়ালা, অনেকের দেওয়ালও কাঁচা | তার মধ্যেই কিছু হাবেলি জাতীয় অট্টালিকাও আছে ধনী বা সামন্ত রাজা শ্রেণীর লোকেদের বৈভবের নিদর্শন | আছে রাজবাড়িও | টিনের দেওয়াল ও চাল দেওয়া একটি সিনেমা হল – দিলীপকুমার অভিনীত "লীডার" ফিল্মটি তখন সেখানে চলছিল | তবে সীধী একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র তা বোঝা যায় | সড়ক পথেই বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে তার যোগাযোগ – রেওয়া, সাতনা, পান্না, কাটনী, মির্জাপুর, শাহডোল ইত্যাদি শহর যেমন, তেমনই মধ্যপ্রদেশের ঘন জঙ্গলে ডুবে থাকা বিভিন্ন প্রান্তিক গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ যা সর্বাবস্থায় দৈনন্দিন প্রয়োজনে সীধীর ওপরই নির্ভরশীল | সাধারণ সরকারি হাসপাতালও এখানেই | পরবর্তী-কালের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা, মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রয়াত অর্জুন সিংহ এখানকারই সাংসদ ছিলেন | রাজন্যপ্রথা থাকাকালীন এই এলাকা তাঁদের রাজবংশেরই অধীন ছিল |

গাড়ির মেরামতি শেষ হতে রাত আটটা পার হয়ে যাওয়াতে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা জঙ্গলের রাস্তায় এককভাবে জিপে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয় – এই ভেবে স্থির হ'ল আমরা পরদিন, পয়লা জানুয়ারি ভোরে রওনা হব | বাবা বাধ্য হয়েই মত দিলেন, যদিও তাঁর অবিলম্বে গোপদ পৌঁছানো একান্ত জরুরি ছিল | যাইহোক, পথশ্রমের ক্লান্তি, রাত জাগা, ঠাণ্ডা – সব মিলিয়ে একটু তাড়াতাড়িই নৈশাহার সেরে ডুবে গেলাম নিদ্রাসাগরে | হা ভগবান! রাত সাড়ে বারোটায় আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে যখন তোলা হ'ল, দেখি সবাই রওনা হওয়ার জন্য তৈরি | মালপত্র জিপের ট্রেলারে তোলা হয়ে গেছে | জানলাম, একটি ডাম্পার সাইট থেকে শহরে এসেছিল কিছু জিনিসপত্র, শাবল, গাঁইতি, কোদাল ইত্যাদি কিনতে এবং শ্রমিক যোগাড় করতে | তাদের কাজ হয়ে গেছে | শ্রমিক ও জিনিসপত্র নিয়ে রাতেই পৌঁছে গেলে সকালে কাজে লাগতে পারবে | অতএব চরৈবেতি | আর শক্তিশালী সঙ্গী, অর্থাৎ ভারী চেহারার ডাম্পার, তায় আবার লোকভর্তি, পেয়ে আমাদের জিপের ড্রাইভার মহম্মদ আকীলও সাহসী, বাবারও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো প্রয়োজন | সব মিলিয়ে পরপর দ্বিতীয় রাতের জন্যও আমাদের ঘুম ভোকাট্টা!

১৯৬৪-র বর্ষশেষের রাতটিতে জিপের হেডলাইটের আলোয় মধ্যরাতের অন্ধকার ও ঘন জঙ্গল চিরে ধুলোয় ভরা পাহাড়ি রাস্তা ধরে চলেছি জিপের সামনের সিটে বসা বাবা ও কুলকার্নি আঙ্কলের মাঝে শীতে কম্পমান আমি (বাকিরাও অবশ্য তাই)| পিছনের সীটে সুনীলদা ও একজন খালাসি | জিপের সমস্ত ফ্ল্যাপ আটকানো সত্ত্বেও হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে | আমাদের অনুসরণ করছে কম্পানির ডাম্পার তার মোটা লোহার তৈরি ডালায় ভরা শ্রমিকদল ও লোহার জিনিসপত্র নিয়ে | তখনও দেশে রাজন্যভাতা বিলোপ হয়নি | দেশীয় রাজা, নবাব ইত্যাদিরা রাজন্যপ্রথা বিলোপ হলেও তাঁদের কেতা ও ঠাট মোটামুটি বজায় রেখেই চলতেন | তারই ফলস্বরূপ হঠাৎ এক জায়গায় টোল-গেটের মতো একটি গেট পথ অবরোধ করল আর সেখানেই অন্ধকার ফুঁড়ে আবির্ভূত হ'ল যথাবিহিত রাজকর্মচারীজনোচিত পোশাক, মানানসই গালপাট্টা এবং ঝকমকে বল্লমশোভিত এক তথাকথিত রাজার সান্ত্রি | জবরদস্ত সেলাম ও অভিবাদন জানিয়ে

তিনি পেশ করলেন যে, আমরা মহামহিম অমুক রাজাবাহাদুরের খাস রাজত্বে প্রবেশ করেছি | রাজাবাহাদুর অবগত আছেন যে নতুন ডাক্তারসাহেব আজ রাতে এই পথেই যাচ্ছেন | তাঁর সনির্বন্ধ নিবেদন, ডাক্তারসাহেব এই বিপদসংকুল পথে নৈশযাত্রা না করে যদি তাঁর হাবেলিতে রাতটুকু বিশ্রাম করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তবে রাজাসাহেব ধন্য হবেন | বাবাও ততোধিক বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে, রাজাবাহাদুরের এই মহানুববতার জন্য তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সম্মানিত | তবে এখন সাইটে দুর্ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছানো একান্ত প্রয়োজন | তাই এখন এই কৃপা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী | পরবর্তী সুযোগে তিনি অবশ্যই আসবেন | একই ঘটনা আরও দু'জায়গায় ঘটল |

ইতিমধ্যে গাড়ি চলেছে জঙ্গল পাহাড়ের আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই ভাঙা পথে, মাঝেমধ্যেই ছোট ছোট পাহাড়ি নালা পেরিয়ে | ব্রিজের বালাই নেই | গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ঝিকমিক করে উঠছে চাকা অর্ধেক ডুবে যাওয়া তিরতির বয়ে চলা জলস্রোত | স্বচ্ছ জলের তলায় নুড়িপাথরগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে | দুটি গাড়ির এঞ্জিনের একঘেয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ আর কিছু নাম না জানা কীটপতঙ্গের তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই | এভাবে চলতে চলতেই এক জায়গায় একটি পাহাড়ের ঢাল শেষ করে ওপাশের পাহাড়ের চড়াই ধরবার মাঝে পড়ল এরকমই এক স্রোতধারা | এপাশের রাস্তাটা ঢালু নেমেই 'ইউটার্ন' নিয়ে ডানদিকে চড়াই বেয়ে উঠে গেছে | আমাদের জিপ ফোর বাই ফোর গিয়ারে গোঁ গোঁ করে জলের স্রোত পার করে চড়াইয়ে খানিকটা উঠেই হঠাৎ হ্যাঁচকা মেরে থেমে গেল | পেছনে ডাম্পারও তাই | সামনে রাস্তার ওপর জিপের আলো পড়ে চকচক করছে গোলাকার বলের মতো দু'টি চোখ! আর তার মালিক – হলুদ-কালো ডোরাকাটা বিশাল চেহারা নিয়ে

আড়াআড়িভাবে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ শমন | একই সঙ্গে কুলকার্নি আঙ্কল বলে উঠলেন 'Oh my God', আর বাবা উচ্চারণ করলেন, 'কী অপূর্ব!' মুহূর্তের মধ্যে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন নেমে গেল | মনে হ'ল, শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি পা দিয়ে নেমে চলে গেল | তারপর সব চুপচাপ | আর – চরাচর ভুলে স্থবির, নিথর আমরা – নিজেদের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছি | সামনে রাস্তার ওপর স্বয়ং ব্যাঘ্র মহারাজ – মুখভাবে প্রচণ্ড বিরক্তি ও অবজ্ঞা | ভাবখানা যেন – "কারা এই অর্বাচীন আমার রাজত্বে বিরক্ত করতে এসেছে?" মহারাজ বোধহয় নীচের নালায় জল খেতে এসেছিলেন, নির্জন বনে হঠাৎ আমাদের গাড়ি দুটির এমন অপরিচিত বেয়াড়া আওয়াজে ফিরে যেতে যেতে কারণটিকে সামনে পেয়ে যেন শাসন করবার জন্যই দাঁড়িয়ে পড়লেন | সময় কতক্ষণ কেটেছে কোনো আন্দাজ নেই | মনে হ'ল অনন্তকাল | হঠাৎ আমাদের গাড়ির বুদ্ধিমান ড্রাইভার আকীল আঙ্কল ডাম্পারের ড্রাইভারকে ডেকে বলল, "সারে লেবারোঁকো জবরদস্ত হল্লা মচানে বোলো অওর লগাতার হর্ন বজাতে চলো"| ডাম্পারের ডালায় বসা লেবাররা শাবল গাঁইতি দিয়ে লোহার ডালায় দমাদ্দম মেরে পরিত্রাহি আওয়াজ তুলল, সেইসঙ্গে হল্লা | যোগ হ'ল দুটি গাড়ির হর্নও | বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ডোরাকাটা মহারাজ হাড়-হিমকরা এক মুখভঙ্গি করে প্রচণ্ড বিরক্তিসহ একটি "ঘ্যাঁয়াও" শব্দ তুলে কাঁপিয়ে দিয়ে যেন বললেন, "যত্তোসব বিরক্তিকর"! ধীরে ধীরে হেঁটে ওপরদিকের জঙ্গলে প্রবিষ্ট হলেন দারুণ আত্মবিশ্বাসী চালে | আবার আমাদের শরীরে যেন রক্ত চলাচল শুরু হ'ল | দুটি গাড়ির কনভয় আবার চলল জঙ্গলের অন্ধকার কেটে | রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছানো গেল ঈপ্সিত গোপদ নদীর ধারে সাইট ক্যাম্পে | কুয়াশা ঢাকা আলোয় টিমটিম করছে বিরাট এলাকা জুড়ে ক্যাম্প কলোনি ও ওয়ার্ক সাইট | নির্দিষ্ট কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি থেকে নেমে দেখি এখানকার লোক আমাদের জন্য গেস্ট হাউস থেকে বিছানা এনে পেতে তৈরি রেখেছে | আর অপেক্ষা করার ক্ষমতা ছিল না, এলিয়ে পড়লাম বিছানায় | বাবা মালপত্রভরা ট্রেলার খুলিয়ে ওই জিপেই সোজা চলে গেলেন সাইটে, চিকিৎসকের কর্তব্যবোধে | আর আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে আবছা টের পেলাম, সুনীলদা গায়ের ওপর লেপ-কম্বল চাপা দিয়ে বালিশ ঠিক করে দিল, জুতোমোজা খুলে দিচ্ছে | আমি ডুব দিলাম ঘুম সাগরের অতলে – ১৯৬৫ সালের প্রথম সকালটিতে আবার জেগে ওঠার জন্য |

ফিরে দেখা:

ঘটনাক্রমে উপরোক্ত ভ্রমণটির প্রায় ৪৫ বছর পর, ২০০৯ সালের জুলাই মাসে আমি নিজের চাকরির সুবাদে এরই কাছাকাছি এলাকায় বদলি হয়ে আসি | যে রেলপথটি তখন নির্মাণাধীন ছিল, এখন সেটা দিয়ে প্রচুর মালগাড়ি (প্রধানতঃ কয়লাবাহী) ও শক্তিপুঞ্জ, হাওড়া-ভোপাল, কলকাতা-আজমের ইত্যাদি এক্সপ্রেস ট্রেন দিনরাত ছুটে চলেছে | জলে ফুলে ফেঁপে থাকা সেই গোপদ নদী অজস্র বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দৌলতে এখন বিস্তীর্ণ বালুর চর আর বড় বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে বয়ে চলা শীর্ণপ্রায় জলধারা | ব্রিজের আশেপাশে রুক্ষ, অসমতল নির্জন প্রান্তর | কাছে স্টেশন হয়েছে "নিওয়াস রোড"|

শাহডোল স্টেশনের সেই ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুম এখন

বাতানুকূলিত ভি.আই.পি. রুম – যাত্রীসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই | প্ল্যাটফর্ম উঁচু হয়ে এই ঘরের মেঝে নীচে চলে গেছে – বেসমেন্টের মতো লাগে | আর সেই জীবনদায়ী ফায়ার প্লেসটির মুখ গেঁথে বন্ধ করা; ওপরে ফুলদানি, সুদৃশ্য ডেস্ক-ক্যালেন্ডার ইত্যাদি রেখে শোভা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে ঐতিহ্যের বিনিময়ে | আর আশ্চর্য সমাপতন – ২০০৯-এরই ডিসেম্বর মাসের এক সকালে বেওহারী থেকে গাড়িতে সেই ধুলোভরা রাস্তার জায়গায় রেওয়া-সীধী-শাহডোল চার লেনের ঝাঁ চকচকে এক্সপ্রেস হাইওয়ে ধরে যাওয়ার পথে জয়সিংহ নগরে বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ দেখতে পেলাম একটি বাস – লাল রং,

শাহডোল থেকে সকাল ছ'টায় ছেড়ে মুঝৌলি হয়ে সীধী যাচ্ছে | ৪৫ বছরেও বাসটির রং, সময়সূচি ও যাত্রাপথে এতটুকু বদল হয়নি | সেই ট্র্যাডিশন...

•••❀◆❀•••

কিশোরবেলা

ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তপনবাবু সেলুনে ঢুকে দেখলেন একটা চুল কাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে | আর একটি অল্পবয়সী ছেলে অপেক্ষায় | পাড়ার মধ্যে এই সেলুনটার কোন নাম নেই, সবাই 'বাপির সেলুন' বলে জানে | এই শহরে যখন সেলুন কালচার শুরু হয়নি, তখন বাপির বাবা কাঠের বাক্স নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুল কাটত | পুরনো লোকেরা এখনও তার গল্প বলে | বাপির আমলে এই সেলুনটা হয়েছিল, লব বড় হলে বাপি তাকে নিয়ে সেলুনটা চালাত | এখন বাপি নেই, এটা এখন লবের সেলুন, কিন্তু এখনও সবাই এটাকে বাপির সেলুনই বলে থাকে | এই সেলুনে তপনবাবু দীর্ঘদিন চুল কাটেন | লব বাবার আমলের এই খদ্দেরকে বেশ খাতির করে | তপনবাবুকে দেখেই লব বলে, 'বসুন জ্যেঠু, আর একটা' – বলে ছেলেটিকে দেখায় | সেলুনে দীর্ঘ সময় লাইন দিয়ে বসে থাকতে তপনবাবুর বিশেষ অপছন্দ | আজ অবশ্য খুব দেরী হবে না, তপনবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে পাশে রাখা পুরনো কাগজের তাক থেকে একটা রবিবারের ক্রোড়পত্র তুলে নিলেন |

হাতের কাজটা শেষ করেই লব কিশোরটিকে ডেকে নিল; আর সে বসেই কিছু নির্দেশ দিয়ে দিল | সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল ট্রিমার, তপনবাবুর কিশোরবেলায় যাকে নাপিতের কল বলা হতো, তারই উন্নত সংস্করণ | এখনকার ট্রিমার ইলেক্ট্রিসিটিতে চলে | ট্রিমারের তার প্লাগে গোঁজা হ'ল, চোখের নিমেষে ঘাড় এবং ঝুলফি সমেত আধখানা মাথা হাফচাঁচা হয়ে গেল | তারপর কেশশিল্পী শুরু করল মাথার ওপরের চুল নিয়ে কেরামতি | ধীরে ধীরে সেখানে তৈরী হচ্ছিল মোরগের ঝুঁটি অথবা লঙ্কা পায়রার পেখম জাতীয় একটা কিছু | এমন সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে প্রবেশ এক অল্পবয়সী মায়ের – 'হ্যাঁরে, তুই ইস্কুল যাবি না? সাড়ে দশটা বাজে | তুই একি চুল কেটেছিস রে? এই চুল নিয়ে তুই ইস্কুল যাবি? তোর এখনও চোদ্দ বছর বয়স হয়নি | তুই কাদের পাল্লায় পড়েছিস রে! তোকে আমি কী করে মানুষ করব রে! হায় হায়!' ছেলেটি নির্বিকার, মিটি মিটি হাসছে | আর নির্দেশ দিয়ে চলেছে | মা আর্তনাদ করছে আর বার বার বলছে, 'ছেলের এখনও চোদ্দ বছর বয়স হয়নি |' শেষে লবকে কাতর আবেদন, 'তুমি পাড়ার ছেলে, তুমি ওর এমন সর্বনাশ করো না | তুমি ওর মাথার ওপরের দিকটাও একই রকম করে দাও | ঝুঁটি প্লেন করে দাও |' কিন্তু

তাতেও ফল হ'ল না | সে বলল, 'আমি কী করব? আমাকে খদ্দের যা বলবে আমাকে তো তাই করতে হবে |' মা তখন নিরুপায় হয়ে ছেলেটির বাবাকে ফোন করে ডাকল এই সর্বনাশ থেকে রক্ষা করার জন্যে | এরই মধ্যে চুল কাটা হয়ে গেল, আর ছেলেটি দ্রুত বেরিয়ে সাইকেলে চাপল | মা-ও হায় হায় করতে করতে বেরিয়ে গেল |

আজকাল রাস্তাঘাটে ছেলেদের হাবভাব চালচলন তপনবাবুর নজর এড়ায় না | ব্যাপারটা তাঁর খারাপ লাগে বটে, কিন্তু খুব গভীরভাবে তিনি ভাবেননি বিষয়টি নিয়ে | পেপারেও দেখেছেন মনে পড়ল, মেদিনীপুরের কোনও এক স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রদের এইরকম চুল কেটে স্কুলে না আসতে নির্দেশ দেন | তাতে কাজ না হওয়ায় অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন | অভিভাবকরা সমস্যার গুরুত্ব স্বীকার করলেও বিশেষ কিছু করতে পারেননি | শিক্ষকরা তখন এলাকার সেলুনগুলোয় গিয়ে আবেদন করেন তারা যেন স্কুলের ছাত্রদের চুল এইরকমভাবে না কাটেন | কিন্তু তাতেও কিছু লাভ হয় না | সেলুনওয়ালারা বলে ছেলেরা এলাকার বাইরের সেলুনে চলে যাবে, আর ওদের ব্যবসা মার খাবে | মুর্শিদাবাদের স্কুলগুলিরও একই সমস্যা | তারা পুলিশের উপস্থিতিতে শহরের সমস্ত কেশশিল্পীদের ডেকে, মিটিং করে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করেছেন | ফল কী হয়েছে তপনবাবু জানেন না | কিন্তু আজ চোখের সামনে ঘটা ঘটনাটা তপনবাবুকে একদম নাড়িয়ে দিয়ে গেল | কিশোরটির বেপরোয়া ভাব, আর মায়ের বিপদগ্রস্তের মতো সেলুনে ছুটে আসা এবং সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখে তিনি ব্যথিত হলেন |

এই গল্পের কিন্তু এটি শেষ | শুরুটা পঞ্চাশেরও কিছু বেশি বছর আগে | বয়স চোদ্দ-ই হবে | একমাথা কোঁকড়া চুল, বড় বড় চুল রাখা কিশোরটির ফ্যাশন ছিল | মা বকত, 'লেখাপড়ায় মন নেই, আলবোট কাটা হচ্ছে!' কিশোরটি পরে জেনেছিল ওটা 'আলবোট' নয় Albert – ওটা হবে Albert Hair Cut | কিন্তু এতবার মায়ের কাছে 'আলবোট' কাটার গঞ্জনা শুনেছিল যে এখনও কায়দা করে চুল আঁচড়ানো প্রসঙ্গে তার 'আলবোট' কথাটাই মনে এসে যায় | তখন গ্রামে সেলুন ছিল না, বাড়িতে নাপিত আসত | ফলে বাবার সুবিধে হয়েছিল | বাবা দাঁড়িয়ে থেকে মুড়িয়ে চুল কাটিয়ে দিয়েছিল | কিন্তু আবার চুল বড় হয়েছিল | আবার আলবোট কাটা শুরু হয়েছিল | আর একটু বড় হয়ে উত্তমকুমারের মতো ঘাড়ে ইউ ছাঁট, বিশ্বজিতের মতো সামনের চুলগুলো টেনে এনে সানসেট বানানো কিশোরটির পছন্দ ছিল | আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতে আর একটি ছোট আয়না নিয়ে সে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে দেখত সানসেট ক'ইঞ্চি বেরিয়েছে, পেছন ফিরে দেখত ঘাড়ের ইউ কাটটা নিখুঁত হয়েছে কিনা | আর একটু বড় হয়ে গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের মতো গাল পর্যন্ত জুলফিও রেখেছিল |

সেদিনের সেই কিশোরটি আজ সেলুনে বসে ভাবছিল কার পক্ষ নেবে – বালকটির না তার মায়ের | এই ভাবতে ভাবতে সে চেয়ারে গিয়ে বসল | লব যখন জিজ্ঞেস করল – 'জ্যেঠু, পুজো আসছে তো, কীরকম কাটব?' ফাঁকা হয়ে যাওয়া মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলল কী আর কাটবে – 'কাটো যা খুশি |'

নামটি তাহার সোনোরা

সোমনাথ বসু

ছুটি পাওয়া গেল মাত্র চারদিন, আর এই করোনার সময় কোথায়ই বা যাওয়া যায়? অথচ বাড়িতে থেকে আর বাড়িতে বসেই কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে বেদুইন হওয়ার বাসনা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে | Work from Home-এর খপ্পর আর সকলের মতো আমাকেও জাপটে ধরেছে | ভাবলাম, অনেক নাম শুনেছি Fredericksburg শহরের, আর সেটা হিউস্টন থেকে গাড়িতে বেশি দূরও নয় | টেক্সাসের একেবারে মধ্যস্থলে, বিখ্যাত টেক্সাস হিল কান্ট্রি-র কথা তো সকলেই শুনেছেন – ছোট ছোট টিলা দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য | নিশ্চয়ই এই জায়গায় ভিড় কিছুটা কমই হবে, তাই social distancing-এর বাধা নিষেধটাও মান্য করা হবে এই বিশেষ সময় | শ্যালকবাবু থাকে El Paso-য়; ঠিক হ'ল সে আসবে পূর্বে ৩০০ মাইল আর আমরা যাব পশ্চিমে ৩৫০ মাইল | খুঁজতে খুঁজতে মধ্য জায়গাটা পাওয়া গেল, সোনোরা! বাহ্ রে, ভারী সুন্দর নাম তো! ব্যাস, টুকটাক খাবার দাবার আর নিত্য ব্যবহার্য ব্যক্তিগত জিনিস গুছিয়ে নিয়ে, আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু – রাস্তা বরাবর সোজা, Interstate 10 West |

একটা Airbnb ঠিক করে নেওয়া হ'ল দিন তিনেকের জন্য | ছিমছাম, সুন্দর, ছোট্ট বাড়ি, হাইওয়ে থেকে ঢুকেই একেবারে সোনোরা শহরের প্রান্তে | ছোট্ট শহর সোনোরা, হয়তো গ্রাম বললেই সঙ্গত হবে | এটি টেক্সাস প্রদেশের মধ্যস্থলে Sutton মহকুমার মুখ্য শহর, যার পোশাকি নাম, Seat of Sutton County | স্যান অ্যান্টোনিও থেকে প্রায় আড়াই-তিন ঘন্টার দূরত্বে এর অবস্থান | স্যান অ্যান্টোনিওর পর থেকে যতই পশ্চিমে যাচ্ছি, লক্ষ্য করলাম গাছের সাবলীল সবুজ ক্রমশঃ রুক্ষ থেকে রুক্ষতর হচ্ছে – যাকে বলে একেবারে Wild West | গাড়ি ছুটছে ৮৫ মাইল বেগে, আর চোখের সামনে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে গাছপালা আর মাটির রং-রূপ | মাইলের পর মাইল জুড়ে চোখে পড়ল ছোট ছোট গুল্ম জাতীয় (Cactus) গাছের সমারোহ | মরুভূমির মতো এর বিস্তার | আশপাশে জনবসতিও খুব কম, যেটুকু আছে তাকে জনপদ বলাই ভাল | এরই মাঝে সোনোরা যেন এক মরূদ্যান |

সোনোরার দুটি আকর্ষণীয় স্থান হ'ল – ফ্রেডেরিক্সবার্গ (Fredericksburg, www.visitfredericksburgtx.com) ও ক্যাভার্নস অফ সোনোরা – (Caverns of Sonora, www.cavernsofsonora.com)|

ফ্রেডেরিক্সবার্গে এলে হঠাৎ মনে হবে, যেন জার্মানিতে চলে এসেছি | ১৮৪৬ সাল থেকে জার্মান অভিবাসীরা এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে এবং প্রুসিয়ার প্রিন্স ফ্রেডেরিকের নামানুসারে এই শহরের পত্তন হয় | জার্মানির স্থাপত্যকলা ও সংস্কৃতিও যেন

তারা সঙ্গে করে বয়ে এনেছিল, আজ তাই ফ্রেডেরিক্সবার্গে দাঁড়িয়ে মনে হয়, টেক্সাসের বুকে ছিমছাম এই শহরটি একটা খুদে জার্মানি | ১৮৫০ সালের সময়টায় টেক্সাসের জনসংখ্যার ৫% ছিল জার্মান | পরে ১৯৯০-এর আদম সুমারী তথ্যে জানা যায় যে টেক্সাসের প্রায় ১৭% বাসিন্দার কোনো না কোনোভাবে এক জার্মান সূত্র আছে | আসলে নতুন আবিষ্কৃত এই বিশাল দেশে migration ব্যাপারটা তখন থেকেই চালু হয়ে গিয়েছিল | উদ্যমী, আগ্রহী ও নতুন জীবনের প্রতি উৎসাহী মানুষজনকে

ভূমি দিয়ে আকৃষ্ট করা হতো | তাঁরাই আবার আরো মানুষজনকে নতুন ভুবনের ও জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে অভিবাসী জীবনে টেনে আনতেন | এই রকমই একজন মানুষের নাম, Johann Fredrick Ernst | ১৮৩১ সালে তিনি জমির জন্য আবেদন করে ৪০০০ একর জমি পান টেক্সাসের অস্টিন কাউন্টির কাছাকাছি, যা এখনকার জার্মান অধ্যুষিত অঞ্চল, 'German Belt' বলে খ্যাত |

ইতিহাস অনুরাগীদের জন্য এই শহরের প্রধান আকর্ষণ হ'ল, এখানের মিউজিয়ামগুলি | আর যাঁরা প্রকৃতি উপভোগ করতে চান, সেই নিছক প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য আছে President Lyndon B Johnson-এর নামাঙ্কিত National ও State পার্ক – যেখানে বাইসন, টেক্সাস লং-হর্নস্ এবং হরিণের নিশ্চিন্ত বিচরণ বিশেষভাবে উপভোগ্য | এছাড়াও পঞ্চাশের ওপর ছোট-বড় আঙ্গুরক্ষেত (Vineyard) ও ওয়াইনারি (Winery) আছে |

প্রতিটিতেই কয়েক ঘন্টা সময় কাটানোর জন্য ওয়াইনারি ট্যুর, অসাধারণ খাবার ও ওয়াইন টেস্টিং-এর ব্যবস্থা আছে |

দিনটা মেঘলা – আমরা সারাদিন ফ্রেডেরিক্সবার্গের রাস্তায়, মিউজিয়াম ও দোকানে ঘুরে বেড়ালাম | দুপুরবেলা হাঁটতে হাঁটতে দেখি দাঁড়িয়ে আছি Catfish Haven রেস্টুরেন্টের সামনে |

ক্যাটফিশ-এর ফ্রাই (অনেকে ক্যাট ফিশকে মাগুর মাছের সঙ্গেও তুলনা করে থাকেন) ও আলুভাজা দিয়ে চমৎকার খাওয়া সারা হ'ল | গত ছয় মাসের করোনা সংক্রান্ত গৃহবন্দী অবস্থা আর কাজের অমানুষিক চাপের কথা এই দু'একদিনেই বেমালুম ভুলে গেলাম | সেদিন সান্ধ্যভোজে যাওয়া হ'ল বিখ্যাত জার্মান রেস্টুরেন্টে Friedhelm's Bavarian Inn – নানান রকম

সসেজের পাশাপাশি হরেক রকম মাছের ডিশও ছিল | দুর্দান্ত খাবার আর জমাটি আড্ডা দিয়েই বাঙালির জীবন সার্থক, দেশে বিদেশে এই ফর্মুলা সর্বজনগ্রাহ্য ও অনুমোদিত – এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না |

পরদিন সকালটা গড়িমসি করে বাড়িতে বসে আড্ডা দিয়েই কাটল | সঙ্গে ছিল রুটি, আলুর তরকারি আর নানা রকম ফল – ব্রাঞ্চ হিসেবে মন্দ নয় | সঙ্গে গরম গরম কফি, আহা! সকলে তৈরী হয়ে বেরোলাম সাড়ে এগারোটা নাগাদ | আজকের গন্তব্যস্থল আরেকটি দর্শনীয় স্থান, Caverns of Sonora |

জায়গাটি শহরের কেন্দ্র থেকে আট মাইল দূরে | মাটির প্রায় ৩০০ থেকে ৫০০ ফুট নীচে এই গুহার বিস্তার, যা বাইরে থেকে, অর্থাৎ ওপর থেকে কিছুই বোঝা যায় না | এ যেন ভূগর্ভস্থ এক সম্পূর্ণ আলাদা অথচ বিশাল জগৎ | ক্যাভার্ন বলতে যা বোঝায়, চোখে

না দেখলে এটিকে বিশ্বাসই করা যায় না – পাতালপ্রবেশে যেন এক স্বর্ণময় রাজপ্রাসাদ | টিকিট কেটে ট্যুর গাইডের সঙ্গে ভেতরে ঢুকতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, এক কথায় বলতে গেলে, astonishing! কথিত আছে, "Its Beauty Can Not be Exaggerated, Even by Texans." – Bill Stephenson (founder of the National Speleological Society)| ভেতরে ঢুকে সত্যি মনে হচ্ছিল, এ যেন সোনায় মোড়া | রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'গুপ্তধন' গল্পটা মনে পড়ে যাচ্ছিল – সোনা আরো সোনা, হয়তো কথাটা প্রকৃতিতে প্রতীকী! সত্যি প্রকৃতির এই অপূর্ব সম্ভারে আবার সৃষ্টিকর্তার মহান কীর্তির জন্য কুর্নিশ না করে পারলাম না |

গুহাটির আবিষ্কার মানব সমাজের কাছে হয়তো বেশী দিন নয়, কিন্তু আবিষ্কারের পর জানা যায় প্রত্নতাত্ত্বিক মতে গুহাটির বয়স কোটিরও বেশি | আর কোন প্রক্রিয়ায় এর সৃষ্টি জানাতে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন – মাটির অভ্যন্তরে জলস্তর ও চুনা পাথরের (lime stone) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যুগ যুগ ধরে তৈরী হয়েছে এই অপূর্ব সুন্দর শ্বেতবর্ণ স্ফটিকের (crystal) কারুকার্য | বিভিন্ন গঠনের স্ফটিকের সন্ধান পাওয়া যায় গুহার মধ্যে, যেগুলি প্রধানত stalactite, stalagmite ও helictite | এ যেন ওস্তাদ কারিগর যুগ যুগ ধরে নিপুণভাবে তৈরী করে গেছেন এক উজ্জ্বল রত্নশালা, মানুষ যা দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে | এগুলি সবই উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ স্ফটিক ও মূলত একই পদার্থ, চুনা পাথর (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট) থেকে সৃষ্ট, কিন্তু রাসায়নিক পরিবেশে ও বস্তুর অবস্থান বিশেষে গঠন ভিন্ন ভিন্ন |

Stalactite-এর স্ফটিকগুলি গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত নিম্নমুখী – অনেকটা বরফের দেশে যেমন বাড়ির কার্নিশ থেকে

কঠিন বরফের খন্ড বা আইসিকল (icicle) ঝুলতে থাকে তেমনই | এদের আকৃতি সূচাগ্র, যার থেকে টুপ্ টুপ্ করে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ে | অন্যদিকে stalagmite-এর অবস্থান গুহার মাটিতে ভর করে, ঊর্ধ্বমুখী | এদের অগ্রভাগ মসৃণ | এদিক থেকে বলতে গেলে, stalactite ও stalagmite সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী | কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে একই সাথে পাশাপাশি বিরাজমান | এদের মধ্যে সবথেকে মন কেড়ে নেওয়া ও কোমল গঠনের সৌন্দর্য দেখি helictite ক্রিস্টালে | এদের বিভিন্ন আকার হয় | কোথাও ফিতের মতো (ribbon), কোথাও বা প্রজাপতির আকৃতি, আবার কোথাও দেখে মনে হয়, হাতের

আঙুলের সমষ্টি যেন | Helictite-এর গঠনগুলো খুবই ভঙ্গুর ও নমনীয়, তাই কর্তৃপক্ষ হাতের নাগালের বাইরে এদের রেখেছেন এবং সেইসব জায়গায় পর্যটকদের প্রবেশ নিষেধ |

একই গুহার মধ্যে, একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান চোখকে তাক লাগিয়ে দেয় | বর্তমানে ক্যাভার্নের মোট সাত মাইলের মধ্যে জনসাধারণের জন্যে মাত্র দুই মাইল ঘেরা জায়গা বরাদ্দ | খনন ও গবেষণার কাজ পুরোদমে অব্যাহত | প্রকৃতির এই অদ্ভুত সৃষ্টির তারিফ করার কোনো ভাষা বোধহয় মানুষের অভিধানে নেই |

ফেরার সময় বারবার মনে হচ্ছিল, হিউস্টন থেকে এত কাছে প্রকৃতির নিজস্ব খেয়ালে গড়ে ওঠা যে স্বর্গ মাটির গভীরে লুকিয়ে আছে, কেন এতদিন 'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া' – দেখা হয়নি!

শিল্পী

দেবব্রত তরফদার

নয়ন পালের সাত পুরুষের বাস নদীয়া জেলার চাপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে | তারা কুমোর পাল | তার ঠাকুরদা হরেন পালের তৈরি মাটির পাত্র ছিল এ দিকের সেরা | কথিত আছে তার তৈরি মাটির হাঁড়ি কলসি নাকি মাটিতে পড়ে গিয়েও ভাঙত না | তা সোমবচ্ছর পৌনে আগুন আর নাম থাকলেও হরেন পালের ভাতের টান ছিল | একগাদা পুষ্যি নিয়ে সংসারকে ঠিক কব্জা করতে পারত না | বড় ছেলে নগেনের হাতের কাজ ছিল বাপের চেয়েও ভাল, কিন্তু একটু বড় হয়ে সে আর হাঁড়ি কলসির দিকে ভেড়েনি | মাটিকে ছাড়ল না কিন্তু কুমোরের চাক ছাড়ল |

লক্ষ্মীপুর থেকে তিন গাঁ পেরিয়ে পলদা নদী, তার দুই গ্রাম পেরিয়ে মহেশপুর সেখানেই কয়েক ঘর কুমোর আছে, যারা একমাত্র এই অঞ্চলে প্রতিমা বানায় | এদের অবস্থা কিছুটা স্বচ্ছল কেননা দু'এক বিঘে জমি জিরেত আছে প্রায় সবারই | সারা বছরই মাটির কাজ করে, আর পুজো-পার্বণে প্রতিমা গড়ে; তাও খুব বেশী নয়, দশ গাঁয়ে বারো তেরোটা ঠাকুর । তা পনেরো বছরের নগেন গিয়ে জুটল বিশে পালের কাছে, তার পেটেলগিরি করতে | বিশে পালের বয়স প্রায় আশি, বয়স্ক পালেরা তাকে গুরু বলেই মান্যি করে | এখন চোখে খুব ভাল একটা ঠাওর হয় না কিন্তু কিছুটা আন্দাজেই যা গড়ে তোলে তার তুলনা মেলা ভার | অবশ্য অসুবিধে হয় চক্ষুদানের সময়, তা সে কাজটা বুড়োর ছেলে নারান পালই করে থাকে | তা নগেন তিনটি বছর ধরে বিশের পেটেলগিরি করে আঠারোতেই ওস্তাদ হয়ে উঠল | তার হাত আর তুলি সমানে চলে | আর পরের বছরেই কালীগঞ্জের এক পালের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সঙ্গে চলে গেল মধ্যপ্রদেশ, পুজোর তিনমাস আগে | পেট ভাতায় কাজ করবে আর কাজের শেষে লাভের একটি সামান্য অংশ পাবে | পুজোর পর ছোঁড়াটা নতুন জামাকাপড় আনে সবার জন্য, আর মায়ের হাতে তুলে দেয় কড়কড়ে দু'হাজার টাকা | আর বিকেলেই নতুন কাপড় নিয়ে দেখা করতে চলে যায় মহেশপুরে তার বুড়ো ওস্তাদের কাছে |

তাদের ছেলে লায়েক হয়েছে তাই পালবউ হরেনের কাছে এই বছরেই ছেলের বিয়ে দেবার জন্য বায়না করে | হরেনের একটু আপত্তি ছিল, মেজ ছেলেটি খাটার উপযুক্ত হোক, নাহলে এই বয়সেই সংসারের চাপ ওর একার মাথায় পড়ে যাবে | কিন্তু গিন্নি নাছোড়বান্দা | অগত্যা মেয়ের সুলুক সন্ধান চলতে থাকে |

কালীপূজো পেরিয়ে গেল, নগেন জগদ্ধাত্রী পুজোর কাজ করতে চলে গেছে কেষ্টনগরের ঘূর্ণিতে, বিখ্যাত বীরেন পালের কাছে | আর এই সময়েই নগেনের বিয়ের প্রস্তাব আসে মহেশপুরের খোদ ওস্তাদের বাড়ি থেকে | পাত্রী বিশে পালের নাতনি, নারান পালের মেয়ে কমলা | হরেন বউয়ের কাছে কিছু ভাঙেনি, রাতে সবাই খেয়ে শুয়ে পড়লে হরেন দাওয়ায় বসে মৌজ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে বউকে ডাকে |

- নগেনের মা, ইধার পানে আয় |
- কি বুইলচ?
- বড়খুকার বিয়ির সম্মন্ধ এইচে মোষপুর থেকি |
- মোষপুরির কুন বাড়ি?
- যে বাড়িতি খুকা কাজ শিকত |
- ওমা আমার কী হবে, পেম ভালবাসা হয়েল নাকি? পালবউ কাঁদতে বসে রাত দুপুরে |
- চুপ কর, কাল আমি দেকি আসি, এই বলে হরেন মুচকি হাসে |

পরদিন একা একাই মেয়ে দেখে এসে হরেন বেজায় খুশি –

- মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ মা সরস্বতী | গাঁটরা ইস্কুলে কিলাস টেনে পড়ে, আমাদের ছেলি তো কিলাস ফোর |
- ক্যানে আমার ছেলি ফ্যালনা নাকি, অমন চিহারা, ধীরস্থির কাজের ছেলি কডা আচে এ দিগরে, মা ফোঁস করে ওঠে |

অতঃপর পরের মাঘ মাসের পর থেকেই এবাড়ির উঠোনে আলতা পরা নতুন পায়ের ছাপ পড়ে | আর বউটিও তেমনি; এরই মধ্যে একপাল কচিকাঁচা ননদ দেওরের ঝক্কি সামলায় একা | এখন পালবউ আর পালের কাছে ছেলের বউ তাদের পেটের মেয়ের বাড়া | এসব চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা | এর মধ্যে কত কিছুর পরিবর্তন | নগেন বছর কয়েক মধ্যপ্রদেশে কাজ করার পর আর বাইরে যায়নি | পরে তার নিজের ভাইদের ছাড়াও কাকার ছেলেদের প্রতিমার কাজ শেখায়, কারখানা বানায় নিজের গ্রামে | তার কাজের সুনাম দূর দুরান্তে ছড়িয়ে পড়ে |

অবশেষে সে কুমারটুলিতে কাজ করতে যায় | সেখানে একফালি জায়গাও নেয় এবং পরিবারের লোকজন নিয়ে কাজ করতে শুরু করে | এই সময়ে হরেন পাল মারা যায়, পালবউও

গেছেন কয়েক বছর আগে | কমলাই সংসারের কর্ত্রী | দেওররা আলাদা থাকলেও পাশাপাশি থাকে এবং সম্পর্ক ভাল | নগেন ও কমলার তিনটি ছেলে, মেয়ে নেই | মেয়ের শখ তাদের পূরণ হয়নি | ছেলেদের শেষ দুজন তেমন লেখাপড়া শেখেনি প্রথম থেকেই তারা বাবার সঙ্গেই কাজ করে | বিয়ের পরের বছরই কমলার প্রথম সন্তান হয় তার বয়স তখন মাত্র সতেরো | হরেন ছেলের বউকে বাপের বাড়ি না পাঠিয়ে কেষ্টনগরে ভাল ডাক্তার দেখিয়েছে, কিন্তু আসল সময়ে যমে মানুষে টানাটানি | হরেন আর পালবউ সারারাত মাতৃসদন হাসপাতালের গাছতলায় বসে থেকেছে | পালবউ যত দেবতার নাম জানে তাদের ডেকেছে আর কেঁদেছে | শেষে ভোরবেলায় মা আর বাচ্চা আলাদা হ'ল | নগেন তখন কাজ করতে গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশে | দু'মাস পর মহেশপুরে গিয়ে ছেলেকে দেখল | কমলা স্বামীকে দেখে কেঁদেকেটে একসা, কান্না তার থামেই না | আর নয়ন হয়ে ওঠে সবার নয়নের মণি | কাকা পিসিরা তাকে কোল থেকে নামায় না | ছেলের বাবা মা দুজনেই সুন্দর তাই ছেলে হয়েছে রাজপুত্তুরের বাড়া | হরেন খুব ধুমধাম করে নাতির অন্নপ্রাশন দেয় |

নয়ন বড় হতে থাকে; অসম্ভব শান্ত ছেলে, মাটি নড়ে তো ছেলে নড়ে না | প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয় | এর পর পিঠোপিঠি তার দুই ভাই হয় সুবল আর বলরাম | তারা দুজনেই ডানপিটে, তাদের অত্যাচারে বাড়ির সবাই অস্থির, ভাঙছে-ফেলছে, কারখানায় গিয়ে কাদা মাখছে | পরে তারাও স্কুলে যেতে শুরু করে | দু তরফের মা বাবা সবাই শিল্পী; কাজেই বড় হতে হতেই তারাও মাটি ধরতে শিখে গেল | হরেন এখন হাঁড়ি কলসির কাজ বাদ দিয়ে ছেলেদের সাহায্য করে | নগেনের ছোট দুটোর লেখাপড়ায় মন নেই | কমলা তাদের বকাঝকা করে আর বলে, - বাপের মতোই তোদের মাটি মেখে খেতে হবে |

- আর দাদা? সুবলের প্রশ্ন |
- দাদা কলেজ পড়বে, চাকরি করবে |
- আমি আর ভাই বাবার সঙ্গে ঠাকুর গড়তে যাব দূর দেশে |
- তাই যাস |
- তুমি কাঁদবে না? অবোধ বালকের প্রশ্ন |

হঠাৎই কমলার চোখে জল আসে | বিয়ের পর নগেন মাসের পর মাস বাড়ি থাকত না, সেকথা মনে পড়ে | দুষ্টু ছেলেটাকে কোলের মধ্যে টেনে একটু আদর করে বলে, - যা পালা, অনেক কাজ পড়ে আছে |

দিন যায়, বাচ্চারা বড় হয় | হরেন পাল ক্রমশ অশক্ত হয়ে পড়ে | একদিন বাচ্চারা মৃত্যুর পদধ্বনি শোনে ঘরের আঙিনায় | দাদু কেন আর ফিরে আসবে না এটাই বুঝতে পারে না একদম ছোটটা |

নয়ন ক্লাসে ভাল রেজাল্ট করে, তার মতো সুবোধ ছেলে বিরল | কিন্তু দুষ্টু ভাইদের সামলাতে ও পারে না | তবে শুধু লেখাপড়া নিয়ে থাকে না; পালের ছেলে কাজেই মাটি লাগে তার হাতে | একটু অদ্ভুত প্রকৃতির সে | কাঁচা মূর্তি গড়তে গড়তে চুপ করে যায়, তন্ময় হয়ে কী দেখে কে জানে | কমলা অনেক সময় দেখে কারখানা ঘরে সে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে নিচুস্বরে | গিয়ে দেখে কেউ নেই | জিজ্ঞেস করতেই ছেলে লজ্জা পেয়ে হাসে | কমলার ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে | এমনিতেই ছেলেটা সবার চেয়ে আলাদা, কী হবে কে জানে | শাশুড়ির সঙ্গে একান্তে আলোচনা করে | আর পালবউ পরদিন ছোটে ময়দানপুর কালীবাড়িতে, কখনো মসজিদের মওলানা সাহেবের কাছ থেকে জলপড়া নিয়ে আসে |

নয়নের একমাথা অগোছালো রুক্ষ চুল, ফর্সা ছিপছিপে চেহারা দেখে মনে হয় যেন গ্রীক দেবতাদের মধ্যে থেকে উঠে এল | কাদামাটির থেকে রঙ তুলির সঙ্গেই তার সখ্যতা বেশি; তুলি হাতে নিলে বাহ্যজ্ঞান থাকে না | তার হাত যেন কথা বলে! আর ষোলো বছরের ছেলেকে দেখে নগেনেরও বুক কাঁপে – মনে মনে বলে এ কে? আমরা কারিগর, আর এ তো সাধক! নগেনের বেশিরভাগ প্রতিমায় এখন নয়ন চোখ দেয় | প্রতিমা তৈরি করতে গিয়ে গড়ার থেকে সে ভাঙে বেশি, কিছুতেই মনের মতো হয় না | নগেন কাজ করে তার নিজের ছাঁচে, তাছাড়া তার দাদাশ্বশুর বিশে পালের ছাঁচও তার আছে | নয়নের কিছুতেই পছন্দ হয় না তার বাবা বা তার গুরুর ছাঁচ | সে নিজেই ছাঁচ বানিয়ে ফেলেছে প্রতিমার মুখের | তা দেখে অভিজ্ঞ কারিগর নগেন ভাবে তার ছেলের কাজ বহুদূরে ছড়িয়ে পড়বে | কিন্তু পড়া আর মাটির কাজের মধ্যে সখ্যতা কই! তাছাড়া কমলা একেবারেই পছন্দ করে না ছেলের এই মাটি ঘাঁটাঘাঁটি |

সুবল পড়া ছেড়েছে ক্লাস সেভেনে, বাবার পেটেলগিরি করে কখনো-সখনো | দাদার কান্ড দেখে বলে, - তুমার হাতে পড়লি এক বছরেও একটা ঠাকুর শেষ হবে না |

ভাইয়ের কথা শুনে নয়ন হাসে, সে কোন কিছুতেই রাগে না | কিন্তু দাদার তুলি চালানোর ব্যাপারে সুবলের গভীর আস্থা |

ছোটটা আবার মাকে বলে, - দাদার আঁকা চোখ তোমার মতো জ্যান্ত।

কমলা বলে, - দূর বোকা ও তো ঠাকুরের চোখ। ছোট্ট বলরাম মাকে ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না, নিজের মতো করে বলে,

- দাদার আঁকা মুখ দেখলি বুকের মদ্যি ব্যথা করে।

কমলার ভয়ে বুক কাঁপে কেন?

নয়ন যেবার পাশ করে কলেজে ভর্তি হ'ল সেবারই নগেন কলকাতার কুমোরটুলিতে ঘর নিল। আর সুবল চলল বাবা-কাকার সঙ্গে কাজ করতে। এতটুকু ছেলে, বুক মোচড়ালেও ছেড়ে দেয় কমলা। পালের ছেলে, একদিন তো ছাড়তেই হবে।

কলেজ ভর্তি হয়ে পড়ায় মন বসে না নয়নের। শহরের ছেলেদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না, আবার অনেক মেয়েও পড়ে তাদের সঙ্গে, যাদের সামনে সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। সে প্রায়ই কলেজ কামাই করে আর ঘুরে বেড়ায় কৃষ্ণনগরের পালপাড়া আর ঘূর্ণিতে। এখানকার মাটির পুতুল জগৎ-বিখ্যাত। বীরেন পাল, কার্তিক পাল, সুবল পাল, শম্ভু পাল, মহেশ পাল এইসব শিল্পীদের কাজের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। এঁরা সবাই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে এঁদের কাজ। তন্ময় হয়ে তাঁদের কাজ দেখে নয়ন। অনেকেই এই ছেলেটিকে চিনে গেছে, জেনেও গেছে সে কী করে। বীরেন পাল মহাশয় তাকে অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করে না, চোখে কৌতূহলও ধরা পড়ে না; শুধু নিবিষ্ট মনে দেখে। তার এই তন্ময়তা ছাড়া কখনো কখনো তাকে খুব ক্লান্ত লাগে। কী চায় সে? নিজেই জানে না। অবাস্তব ধারণা তার মধ্যে কাজ করে। ঠাকুরের মুখ চোখ নাক আঁকতে আঁকতে তাদের জীবন্ত দেখে। একা থাকলে কখনো আপন মনে কথাও বলে। কমলা ছেলেবেলা থেকেই এসব লক্ষ্য করেছে। কমলার মাঝেমধ্যে অচেনা মনে হয় ছেলেকে।

সব পুজো শেষে নগেন বাড়ি ফিরে এসেছে। সরস্বতী পুজোর কাজ কিছুদিন পর থেকে শুরু হবে। কৃষ্ণনগরে পালপাড়ার কারখানাগুলো ফাঁকা এখন। অনেকদিন কলেজ যাওয়া হয়নি নয়নের। এরমধ্যে একদিন কলেজ থেকে এসে নয়ন ঘোষণা করে যে সে আর পড়বে না। কমলা আশাহত হয়ে ভেঙে পড়ে ও খাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিন্তু নয়নের পরিবর্তন দেখা যায় না। এত ঘটনার পরও তার ক্লান্ত মুখে হাসি লেগে থাকে। শেষে নগেন সামাল দেয় – ঠিক আছে... কাজকর্ম করুক। নিজে থেকে লেখাপড়া না করলে জোর করে কিছু হবে না। সে জানে ছেলে তার জাত শিল্পী।

কিছুদিন পরই সরস্বতী পুজোর কাজে বাবার সঙ্গে কুমোরটুলি যায় নয়ন। সারা মরশুমে মাত্র দু'তিনটি ঠাকুর করেছে সে, নগেন হাতও দেয়নি। তবে রঙের কাজে নয়ন দশ জনের সমান। যে তিনটি ঠাকুর সে বানিয়েছে, তার থেকে চোখ ফেরানো যায় না! অন্য বয়স্ক পালদের চোখে ছিল মুগ্ধতা, তারা বাহবা দিয়েছে খুব। যারা প্রতিমা বায়না দিয়েছিল তারা সবাই খুব খুশি। প্রতিমাগুলি চলে যাবার পর নয়ন খুব মনমরা। সেদিন রাতে খায়নি। পরে কিছু ছোটখাট কাজ বাকি ছিল সেগুলোতেও হাত লাগায়নি। পর পর কয়েক রাত জাগা, ভাল কাজ করার পর মন্ডপে প্রতিমা চলে গেলে খারাপ লাগে ঠিকই। কিন্তু শিল্পী হলেও সে পালের ছেলে, প্রতিমা গড়াতেই তাদের রুটি রুজি, এমন করলে তাদের চলে! ছেলের ব্যবহার অতিরঞ্জিত মনে হয় নগেনের। আর রাগের মাথায় জীবনে যা করেনি তাই করে বসে। নয়নকে একটি চড় মারে। ঘটনায় সবাই হতবাক, সুবল ছুটে এসে দুজনের মাঝে দাঁড়ায় – দাদার গায়ে হাত দেবে না বাবা। পনেরো বছরের ছেলের আচরণে বাবা অবাক। যাইহোক, নয়নই ভাইকে নিয়ে সরে যায়। তারপর দুজনে কাজে লেগে যায়। ছেলের গায়ে হাত তুলে আফসোস হয় নগেনের, এমন ছেলে তার! কমলা জানতে পারলে তার কপালে দুঃখ আছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছে সুবলের ব্যবহারে, অসম্ভব ডানপিটে হলেও তিন বছরের বড় দাদাকে কখনই তুই সম্বোধন করেনি। আর আজ তার আচরণে বোঝা গেল নয়ন সুবলের শুধু দাদাই নয় গুরুও বটে। আশ্বস্ত হয় নগেন, তার অবর্তমানে তার ভোলাভালা ছেলেটির পাশে দাঁড়ানোর মতো লোক রইল। ওপাশ থেকে নয়নের নিচুস্বর আর সুবলের হাসি ভেসে আসছে। ব্যাপারটা মিটে যাওয়ায় নগেন খুশি। কিন্তু নয়নকে তার স্বাভাবিক লাগে না। আজ কয়েক বছর এখানে আসার পর অনেক ভাল, শিক্ষিত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ঠাকুর গড়ার সুবাদে – সেরকম একজন হলেন অধ্যাপক সুবীর মুখার্জী। নগেন তাঁকে নয়নের সব ব্যাপার খুলে বলে। অধ্যাপক জানান তাঁর একজন বন্ধু আছেন যিনি এই ব্যাপারে বড় ডাক্তার। পরদিনই সেই ডাক্তারের কাছে নয়নকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নয়নের সঙ্গে দু'ঘন্টা কথা বলে অধ্যাপককে জানান নয়ন একদম স্বাভাবিক, এবং অনেক বড় বড় শিল্পীর মধ্যে এই ব্যাপারটি দেখা যায়, যারা নিজের সৃষ্টির মধ্যে

জীবন্ত সত্তা খোঁজে।

বাড়ি ফিরে নগেন কমলার সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করে। এর পরই কমলা আর তার শাশুড়ি নয়নের বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নগেন ভাবছিল আরো দু এক বছর যাক, সংসারটা আর একটু গুছিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু সবার চাপে মত দিতে হয়। পিসিরাও মেয়ে খুঁজতে শুরু করে। কমলার মত হ'ল সুন্দরী মেয়ে ছাড়া তার সুন্দর ছেলের বিয়ে দেবে না। পাত্রী পাওয়া যায় কাছেই বড় আন্দুলিয়ায়। এক প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকের মেয়ে। বর্ধিষ্ণু পরিবার, চাষবাস, ব্যবসা আছে, কিন্তু সাত পুরুষের মাটির কারবার নেই। তারা ছেলে দেখে, আর ছেলের সম্পর্কে খবর নিয়ে খুশি হয়। অতঃপর পরের ফাল্গুনে কমলার ঘরে নতুন লক্ষ্মী আসে। তার গুণ আর রূপের ছটায় পালবাড়ি আলোকিত হয়। ধনী বাপের মেয়ে কল্যাণী মাটির ঘরে মানিয়ে নেয় খুব তাড়াতাড়ি।

সুবল, বলরাম রাজ্যের বাইরে যেতে শুরু করেছে। সংসারের সুরাহার জন্য তাদের আর বাধা দেওয়ার প্রশ্ন নেই। নয়ন যেতে চেয়েছিল কিন্তু সুবল তাকে যেতে দেয়নি। একে দাদার সবে বিয়ে হয়েছে তারপর তার মতো শিল্পী মানুষের উপর কাজ চাপানো যায় না সে জানে। তার খুশিমতো তাকে কাজ করতে দেওয়া উচিত। তাই সে বাড়িতেই কাজ করে। কখনো দেখা যায় সারা দিনরাত জেগে কাজ করছে, আবার কখনো দেখা যায় অসমাপ্ত মূর্তির সামনে চুপচাপ বসে আছে। কখনই বেশি প্রতিমার বায়না নেয় না সে, তাই সংসারেও মাঝে মাঝে টানাটানি চলে। কল্যাণীর কাজ হ'ল সময় পেলেই স্বামীর কাজ দেখা। অনেক সময় স্বামীর সঙ্গে সারারাত জাগে কিশোরী মেয়েটি। সুপুরুষ আত্মভোলা মানুষটিকে সে অসম্ভব ভালবাসে।

দু'বছর পর কমলা সুবলের বিয়ে দিয়ে দেয়, আর সেই বছরেই কল্যাণীর কোল জুড়ে ঘর আলো করে আসে আঁখি। সে কাকাদের নয়নের মণি। নতুন কাকী কোল থেকে তাকে নামাতেই চায় না। সুখের সংসারে কালের অমোঘ নিয়মে একদিন চলে যায় পালবউ। আঁখি বড় হতে থাকে। এর মধ্যে সে এক ছোট্ট সঙ্গী পেয়েছে, নতুন কাকীর ছেলে। সে স্কুলেও যেতে শুরু করে।

নয়নের নাম জেলার শিল্পী সমাজে ছড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে তার তুলির গুণ। অল্প কয়েকটি প্রতিমা সে করে, কিন্তু প্রতিমার চক্ষুদানের জন্য বিভিন্ন পালেদের কাছ থেকে বরাত আসে। এমনকি যে সব পালদের শিল্পী হিসেবে নাম আছে তাদের কাছ থেকেও। শুধুমাত্র তার আঁকা চোখের জন্য প্রতিমা অন্য মাত্রা পায়। এতে কম পরিশ্রমে আয় বেশি করা যায়। কিন্তু নয়ন অন্য জাতের শিল্পী তাকে পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। সে সারাদিনে দু'তক্তা প্রতিমার চোখ দেয়। কাজটা পরিশ্রমের, কারণ সারাটা সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

এবার পুজো এসে গেলে নগেন তুতো ভাইদের নিয়ে কুমোরটুলিতে যায়। সুবল, বলরাম গাড়িভর্তি জিনিসপত্র আর লোকজন নিয়ে যায় মধ্যপ্রদেশে রায়পুরে। এই সময় সংসারে টাকার টানাটানি হয় খুব। অবশ্য মহালয়ার দিন থেকেই টাকা আসতে শুরু করে। সে এখনও প্রায় দুমাস। নয়ন তার ইচ্ছেমতো অল্প কয়েকটি বায়না নিয়েছে, শেষদিকে দু-চারতক্তা চক্ষুদান করবে।

এসময় একদিন স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফেরে আঁখি। দিদিমণি তাকে বকেছে, সে পড়া বলতে পারেনি। কল্যাণী মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে বলে, - কেন মা তোমায় তো সব শিখিয়ে দিয়েছি।

- আমি বোর্ডের লেখা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

কল্যাণী বই বার করে পড়তে দেয় মেয়েকে, দেখা যায় মেয়ের পড়তে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে।

পরদিনই কৃষ্ণনগরে চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া হয় তিনি ভাল করে পরীক্ষা করে বলেন, - এ চোখের সমস্যা নয়। তারপর কলকাতার এক ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। কল্যাণীর বাবাকে নিয়ে নয়ন পরদিনই কলকাতা যায়। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর শিশুটির ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে, তবে ম্যালিগ্ন্যান্ট নয়, এই বাঁচোয়া। বাপ মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি অপারেশনের কথা বলে। সব মিলিয়ে তিন লাখ টাকার ধাক্কা। কল্যাণী শিশুটিকে আঁকড়ে ধরে চোখের জল ফেলে। নয়ন নির্বাক বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে।

বাড়ি ফিরে কমলাকে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু সে বুঝতে পারে অঘটন কিছু ঘটেছে। পুজো কাছে, বাবা ভাইদের খবর দিলে তারা আসতেও পারবে না বরং কাজের ক্ষতি হবে। নয়ন দিনরাত জেগে ক'দিনের মধ্যে অতি দ্রুত প্রতিমাগুলি শেষ করে ফেলে। পিতৃত্ব তার শিল্পীসত্তার পথ ঘুরিয়ে দিয়েছে। এরপর বিভিন্ন পালদের কাছে সে খবর পাঠায় প্রতিমার চক্ষুদানের বরাত নিয়ে। একদিন ভোরবেলা ঘুমন্ত মেয়েটিকে কোলে নেয় নয়ন। কল্যাণী

এই প্রথম দেখে স্বামীর চোখে জল | সে নিজেকে স্থির রাখতে পারে না | অসহায় হয়ে নয়নকে বলে, - চোখের জল ফেলবে না, মেয়ের অকল্যাণ হবে, তারপর বলে, তুমি যাও, কেউ নিতে পারবে না আমাদের ধনকে |

তার স্বরে কী শক্তি ছিল কে জানে, নয়ন ঘুমন্ত মেয়েকে একটা চুমো দিয়ে তুলির ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায় |

টানা এগারো দিনে ষাটতক্তা প্রতিমার চক্ষুদান করে নয়ন | প্রায় চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেছে প্রতিদিন | স্নান-খাওয়া নেই, চোখদুটি অসম্ভব উজ্জ্বল, তাকানো যায় না | যখন সে চক্ষুদান করে তখন তাকে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী বলে মনে হয় | অতি সাধারণ প্রতিমা তার তুলির টানে অসাধারণ রূপ পায় |

বেথুয়াডহরির পালপাড়াটি পুরাতন, বহুকাল ধরে কাজ করছে এমন একজন পাল তার কাজের পর হাত ধরে বলে, - বাবা শিল্পী হিসেবে আমারও নাম ছিল এককালে | আমার গর্বও ছিল, কিন্তু বাবা, তোমার কাজ না দেখলে আমার শিল্পী জীবন অপূর্ণ থেকে যেত |

এখন এসব কথা স্পর্শ করে না নয়নকে | আগে চক্ষুদানের সময় প্রতিমার জীবন্ত সত্তা খুঁজত; এখন প্রতিমার সঙ্গে তার ছোট্ট শিশু, আঁখি মায়ের মুখ এক হয়ে যায় | একদিন সে যখন একটি মুখে চক্ষুদান করেছে, অভিজ্ঞ লোকেরা তাকে দেখে ভাবে লোকটি বোধহয় মারা পড়বে কিন্তু তার সামনে কোন কথাই বলতে পারে না |

এইসব কাজের জন্য প্রায় একলাখ টাকা জোগাড় হয়েছে; বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে একজনকে দিয়ে | এখনো অনেক কাজ বাকি | বেথুয়াডহরিতে শেষ চক্ষুদানের কাজটি যখন শেষ করে তখন রাত্রি দশটা | এরপর হরিনারায়ণপুরে তিনপাটা কাজ আছে, সেখান থেকে বার্নিয়ায় দু'পাটা কাজ করে বিকেলের মধ্যে তেহট্ট পৌঁছাতে হবে | দুদিনের কাজ আছে প্রায় দশ-বারো পাটা, তারপর আন্দুলিয়া হয়ে বাড়ি | সেখানেও তার নিজের তিনটি প্রতিমা অপেক্ষায় | কারো মানা না শুনে বেরিয়ে পড়ে, ক্ষ্যাপা মানুষটিকে বেশি কিছু বলতে পারে না | দুজন তার সঙ্গে যেতে চায় | নয়ন বারণ করে | দশ কিলোমিটার রাস্তা, দুদিন পর অমাবস্যা কিছুক্ষণ পর যেন অন্ধকার পাতলা হয়ে আসে | পিছনে একটি কুকুর অনেকদূর পর্যন্ত আসে, প্রথমে ডাকছিল, পরে চুপ করে যায় | নয়ন তার সঙ্গে কথা বলে | কুকুরটি লেজ নাড়ে, গ্রামের সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে | দূরের গ্রামে বিজলি বাতির আলো, স্টেশনের আলোটাও দেখা যায় | শরীর ভেরে আসছে | পাশেই বড় একটি গাছ | অন্ধকরে বোঝা যায় না কী গাছ, বোধহয় তেঁতুল হবে | তার নিচে বসে নয়ন | কতক্ষণ বসেছিল কে জানে, তার চটকা ভাঙে এবং হঠাৎই কান্নায় ভেঙে পড়ে | তার কান্নার শব্দে কোন নিশাচর পাখি গাছ থেকে উড়ে যায় | সাক্ষী থাকে নিশুত রাতের অন্ধকার, রাতের তারারা আর ঝাঁকড়া সেই তেঁতুল গাছ | আর তখনই যেন অন্ধকারের মধ্যে ভেসে ওঠে এক চিন্ময়ী মাতৃমূর্তি | সে দেখে সহাস্যময়ী হৈমবতী, যাঁর সঙ্গে তার কথা হয়েছে হাজারবার সেই ছোটবেলা থেকে | তাঁর যেন হাজারো চোখ, যা এই কদিনে এঁকেছে সে, হাতে ত্রিশূলের বদলে বরাভয় মুদ্রা | কতকিছু বলতে চেয়েছিল নয়ন, কিন্তু কিছুই বলতে পারে না | একসময় পূব আকাশে লাল আলোর রেখা ফোটে | আকাশপটের চালচিত্র দেখে সেই মহান পটুয়ার কথা ভাবে সে, যিনি চারদিকে তাঁর আঁকা পট সাজিয়ে রেখেছেন | এখন একবারও মনে হয় না যে আঁখির জীবন থেকে এইসব ছবি হারিয়ে যাবে | ভোরের পাখিরা ডাকতে শুরু করেছে | ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে নয়ন চলে হরিনারায়ণপুর গ্রামের দিকে | এখনো তার অনেক কাজ বাকি |...

(দু একটি চরিত্র কাল্পনিক, কিন্তু হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়)

শয়তানের হাতে বেহালা

রাহুল রায়

বিপদটা বাঁধল আমি আমার একটা লেখায় এক বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর সাথে সঙ্গত করা তবলা-বাদককে 'তবলচি' সম্বোধন করায়। লেখাটা একটা মাসিক পত্রিকায় বেরোনোর পর একজন সুধী পাঠক 'চিঠিপত্র' শাখায় আমার এই সম্বোধনকে নিয়ে ভীষণ আপত্তি তোলেন। ওঁর মতে আমার তবলচি-র বদলে তবলিয়া বা তবলা-বাদক সম্বোধন ব্যবহার উচিত। উনি এ কথাও বলেন যে অনেক বড় বড় সঙ্গীত-শিল্পীর 'তবলচি' সম্বোধনে আপত্তি আছে – অনেকটা যেন বাবুর্চি, মশলচির মতো শোনায়। কথাটা সত্যি। বলা বাহুল্য যে সুধী পাঠক ও আমাদের দেশের সঙ্গীত শিল্পীদের অনেকেই রন্ধন-পেশা ও সেই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্ট্যাটাস সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না।

উত্তরে আমি নিজের সমর্থনে লিখলাম তবলিয়া বা তবলা-বাদক শব্দদুটি নিঃসন্দেহে সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত, তাই তাদের গায়ে হিন্দুয়ানির গন্ধ লেগে আছে। অন্যদিকে তবলচির উৎপত্তি নিঃসন্দেহে মুসলমানী। আমি এ কথাও লিখলাম যে খুব উঁচুদরের সঙ্গীত শিল্পী হিন্দু হলে তিনি হন পণ্ডিত, আর মুসলমান হলে হন উস্তাদ। সুতরাং একজন তবলা-প্লেয়ারকে তবলচি, তবলিয়া বা তবলা-বাদক- যার যা পছন্দ তাই বলতে পারে। এতে দুই সম্প্রদায়ই সন্তুষ্ট থাকে, আর এ নিয়ে সাম্প্রদায়িক তর্ক-বিতর্কেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না।

আমার এই যুক্তি ধোপে টেকেনি। আমি নিজে সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর সাথে বেহালা বাজিয়েছিলাম। তাই সুধী পাঠক আমায় 'হিপোক্রিট' সম্বোধন করে লিখলেন –"আপনি বেহালা বাজান। আপনাকে বেহালাচি বলে ডাকলে কেমন লাগবে?" এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এই নামে আমায় বা অন্য কোন বেহালা-বাদককে কেউ ডেকেছে কিনা জানা নেই।

আমাদের দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কির মধ্যে এদিক ওদিক ঘাঁটতে ঘাঁটতে ওজী ই-পত্রিকার (Ozy.com) এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় একটা চমৎকার লেখা পেয়ে গেলাম 'Why the devil plays the fiddle'।১ লেখাটা পড়ে আমি তথাকথিত 'হেড অফ দ্য নেইল টু হিট আপন' পেয়ে গেলাম অকল্পনীয়ভাবে – তা হ'ল স্বয়ং আমি। সুতরাং আমি সুধী পাঠককে লিখে জানালাম যে – "যেহেতু আমি বেহালা বাজাই ও যেহেতু আমি কোন 'তবলা-প্লেয়ার'-কে তবলচি, তবলিয়া বা তবলা-বাদক বলে ডাকতে আপত্তি কোথায় তা নিয়ে তুমুল তর্ক করছি, তাহলে আমিই সেই তথাকথিত ডেভিল অথবা স্যাটান বা শয়তান।" আমাদের তর্ক ওখানেই শেষ।

সত্যি কথা বলতে কি, যদি আমি ষোলশো শতাব্দীর আগে ইউরোপে বসবাস করতাম তাহলে বেহালা-বাদক হিসাবে সমাজের চোখে নিজেকে শয়তান বলে পরিচিত হলে বিশেষ মিথ্যে বলা হতো না। খ্রীষ্টধর্মের প্রথম দিকে নিজেকে পার্থিব আমোদ প্রমোদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ধার্মিক জীবনের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ বলে পরিগণিত হতো। এ ব্যাপারে অন্য ধর্মের রূপও একই। বিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের নব-জাগরণের অন্যতম নেতা স্বামী বিবেকানন্দ নিজের গুরু শ্রী রামকৃষ্ণের বন্দনায় 'খণ্ডন ভববন্ধন' নামে বিখ্যাত গানটি রচনা করেছিলেন। তার এক জায়গায় আছে 'বঞ্চন কাম-কাঞ্চন / অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়-রাগ'। সুতরাং সব ধর্মেই তার যাজকদের যৌন-সংসর্গ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আজও, বিশেষ কয়েকটি উদারনৈতিক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য ধর্মের অনুশাসনে এই প্রথা পুরোপুরি চালু রয়েছে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই অনুশাসন ছিল আরো কঠোর। আর তাতে যৌনতা সম্পর্কীয় যে কোন আচরণের সাথে যুক্ত ছিল নৃত্য ও সঙ্গীত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চতুর্থ শতকে সেইন্ট ক্রিসোটোম ফতোয়া জারি করেন – যেখানে নাচ-গান হয়, সেখানেই শয়তান বাস করে। এটা অবিশ্বাস্য মনে করা আদৌ আশ্চর্যজনক নয়, কারণ বর্তমানে যিশু খ্রীষ্টের বন্দনায় রচিত বিভিন্ন 'হিমস' যে কোনও চার্চের 'সারভিস'-এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু ১৪-১৫ শতাব্দীর আগে খালি গলায় 'চ্যান্টস' ছাড়া আর অন্য কোনরকম সঙ্গীত চার্চে নিষিদ্ধ ছিল। ক্যাথলিক চার্চের মত অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্রসহ গান করা ছিল ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নিকৃষ্টতর লোকজন বা 'পেগান'-দের কাজ। তার কারণ এই ধরনের সঙ্গীত নাকি নাচ ও অন্যান্য নিচু ধরনের কাজ এমনকি ব্যভিচারেও আকৃষ্ট করে।

কিন্তু আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ 'Why the devil plays the fiddle'-এ ফিরে যেতে হলে একটু ইতিহাস জানার প্রয়োজন। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বেহালা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হলেও এর জন্ম ইউরোপে। কিন্তু ষোলশো শতাব্দীর

মাঝামাঝির আগে সারা ইউরোপে ভায়োলিন বলে কোনও 'মিউসিকাল ইন্সট্রুমেন্ট'-এর হদিশ পাওয়া যায় না | রবাব ও রাবেক বলে কাঠ দিয়ে তৈরি দুটি 'বো অ্যান্ড স্ট্রিংস্ ইন্সট্রুমেন্টস্' আরব ও মধ্য-প্রাচ্যের ব্যবসায়ীরা বেশ কয়েক বছর ধরে ইউরোপে আমদানি করছিল | পনেরোশো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইতালির ক্রেমোনা শহরে 'আমাতি' নামের এক নামজাদা সঙ্গীত-যন্ত্র তৈরির কারিগর বা 'মিউসিকাল ইন্সট্রুমেন্ট-মেকার'-এর এই দুই আরবী বাদ্যযন্ত্রের দিকে নজর পড়ে, ও তার থেকেই জন্ম নেয় ভায়োলিন বা বেহালা | মানুষের গলার মতো 'টোনাল কোয়ালিটি', ছোটখাটো আকৃতি, যাতে একে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় – এইসব গুণের জন্য দ্রুত সারা ইউরোপে বেহালার খ্যাতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে | আর শিগ্গিরিই শুঁড়িখানা থেকে আরম্ভ করে যে কোন আনন্দ-উৎসবে শোনা যেতে শুরু করল বেহালার সুর | সেখান থেকেই সমস্যার শুরু | বেহালার এই প্রতিপত্তি ক্যাথলিক চার্চের কর্তাদের একেবারে পছন্দ হয়নি | প্রথমত বেহালার সাথে আনন্দে মেতে ওঠার সোজাসুজি যোগ থাকায় ধরে নেওয়া হয় যে লোকেরা ধর্মের অনুশাসন-মোতাবেক কৃচ্ছসাধন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে | তা ছাড়া মধ্যযুগীয় ইউরোপের ধারণা অনুযায়ী মধ্য ও দূর-প্রাচ্যের লোকেদের সামাজিক নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার সবই ছিল 'পেগান' বা ঈশ্বর-অবিশ্বাসী, এমনকি যৌনতাপূর্ণ ও ন্যক্কারজনক | যেহেতু বেহালার মূল বাদ্যযন্ত্র এসেছে আরব দেশ থেকে, চার্চের কর্তারা নিদান দিলেন যে বেহালা ঈশ্বরের শত্রু শয়তান বা ডেভিলের তৈরি | শিগ্গিরই এই সম্পর্কীয় নানা গুজব হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে শুরু করল | শুধু বেহালা শয়তানের হাতের যন্ত্র – সেখানেই শেষ নয়, যারা বেহালা বাজায় তারা নিজেরা শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়! সঙ্গের এনগ্রেভিং ১৮৪০ সালের | এখানে দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা জুসেপ্পে তারতিনি শুয়ে শুয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি করছেন, আর তাঁর পায়ের তলায় বসে ডেভিল বেহালা বাজাচ্ছে |

এই ছবিতে 'ডেভিল' বা 'স্যাটান'-এর পরিবেশনা বেশ বিচিত্র ও মজাদার | সে মানুষ নয়, আবার চেনাজানা কোন জন্তুও নয় | কেন এমন হ'ল তা খুঁজতে গেলে বাইবেলে বর্ণিত অ্যাডাম ও ইভের 'গার্ডেন অফ ইডেন'-এ আপেল খাওয়ার গল্প মনে করতে হয় | এই গল্পে ঈশ্বরের শত্রু শয়তান একটা সাপের রূপ নিয়ে এসে অ্যাডাম ও ইভকে আপেল খাওয়ার উৎসাহ দেয় | সেই আপেল খেয়েই অ্যাডাম ও ইভের মনে যৌনতার সংক্রমণ হয় | আর সেই অনুযায়ী এটা ছিল মানুষ-কৃত প্রথম পাপ |

বাইবেলের এই বর্ণনায় শয়তান সাপের বেশে এলেও মধ্য যুগের মধ্যেই 'ডেভিল' বিচিত্র রূপ নেয় | একের পর এক বর্ণনায় শয়তানের মাথায় ধারালো শিং দেখা দেয় | তার পায়ের

পাতা ছাগল বা খচ্চরের পায়ের মতো দু'ভাগে কাটা | অনেক শয়তানের শরীরে লম্বা ল্যাজ রয়েছে | কারোর আবার রয়েছে পাখির মতো ডানা | মুখে কাল্পনিক রাক্ষসের মতো বড়-বড় দাঁত | কিন্তু শরীরের বাকি অংশ মানুষের মতো | কোন কোন বর্ণনায় 'ডেভিল'-এর রয়েছে দুটো বা তারও বেশি সংখ্যক মাথা, আর হাতে অবধারিত রয়েছে 'পিচ ফর্ক', যা দিয়ে খুঁচিয়ে পাপীদের শাস্তি দেওয়া যায় | শয়তানের এই রূপ আমার ছোটবেলায় শোনা ও ছবিতে দেখা রাক্ষস-খোক্কস-ভূত-পেত্নি-ব্রহ্মদত্যির বর্ণনা থেকে আদৌ দূরে নয় | এমনকি ছোটবেলায় শোনা ও ছবিতে দেখা নরকে পাপীদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনাও একেবারে এক | যেমন চোদ্দশো শতাব্দীর ফ্রান্সের এই ছবিতে 'হেল'-এ দুই পাপীর ওপর শয়তানদের অত্যাচারের চিত্র আমার ছোটবেলার শোনা-জানা ছবির সাথে একেবারে মিলে যায় |

যেহেতু মধ্য যুগীয় ক্যাথলিক চার্চের মত অনুযায়ী বেহালা শয়তানের হাতের যন্ত্র, তৎকালীন সমাজের চোখে যারা বেহালা বাজায় তারা হয়ে দাঁড়াল শয়তানের সহচর অথবা স্বয়ং

শয়তান | ১৬৫৫ সালে টমাস বালথাসার নামের একজন বিখ্যাত জার্মান বেহালা-বাদক লন্ডনে বাজাতে আসেন | শোনা যায় যে অনুষ্ঠানের শেষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর ঝুঁকে পড়ে দেখেন যে বেহালা-বাদকের পা মানুষের পায়ের বদলে ছাগল বা খচ্চরের পায়ের মতো ভাগ করা কিনা |

ঊনিশশো শতকে নিকোলো পাগানিনি ছিলেন এক

Niccolo Paganini (1782-1840)

****

প্রবাদ-প্রতিম বেহালা-বাদক | তাঁর বাজনার মান ও 'টেকনিক' আজও কেউ ছুঁতে পারেনি | কিন্তু তাঁর বাজানোর ক্ষমতা দেখে গুজব রটে যায় যে পাগানিনির ওপর শয়তান ভর করেছে | পূর্বে উদ্ধৃত অ্যাডিশন নুজেন্ট-এর লেখায় এই রটনার এক দারুণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় | সেই লেখা থেকেই কিছু অংশ অনুবাদ করে তুলে দিচ্ছি |

১৮৩১ সালের বসন্তকালে লন্ডনের কিংস্ থিয়েটার একবারে কানায় কানায় ভর্তি | সবাই অধীরভাবে অপেক্ষা করছে এক ইতালিয় বেহালা-বাদকের বাজনা শোনার জন্য | ইনি বেহালাবাদক ও সুরস্রষ্টা হিসাবে যথেষ্ট নাম করলেও লন্ডনে আগে কোনদিন আসেননি | কিন্তু শ্রোতাদের সঙ্গীত শোনার আগ্রহের সাথে মিশে আছে এক অজানা আশঙ্কা ও স্নায়ু-বৈকল্য বা 'নার্ভাসনেস'| পুরুষদের দৃষ্টি সোজা মঞ্চের দিকে | তারা নার্ভাসভাবে মাঝেমাঝেই দু'পা 'ক্রশ' করছে আবার খুলে ফেলছে | আর মহিলারা ঘন ঘন হাতের পাখা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, আর অপাঙ্গে চারিদিক দেখছে | এর কারণ, সারা শহরে প্রচণ্ড গুজব – পাগানিনি নামকরা বেহালাবাদক হলেও সে শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয় | আর শয়তানকে কে না ভয় করে! প্রেক্ষাগৃহের আলো কমল, আর কালো, লম্বা কোটপরা একজন দীর্ঘাঙ্গ, লম্বা চুলওয়ালা লোক মঞ্চে এসে দাঁড়াতেই চারিদিকে নিচুস্বরে ভয়ার্ত আওয়াজ শোনা গেল | লোকটির মুখ-চোখের চেহারা প্রায় বাজপাখির মতো ধারালো | হঠাৎ মঞ্চ একেবারে নিঃস্তব্ধ, আর লোকটি তার লম্বা লম্বা সরু আঙ্গুল দিয়ে বেহালার 'নেক' বা গলা চেপে ধরল, যেন কোন জন্তু তার শিকারের গলা চেপে ধরেছে | তারপর বেহালার 'বো' বা ছড়টাকে প্রায় একটা অস্ত্রর মতো হাতে ধরে লোকটি বেহালার তারগুলোকে আক্রমণ করল এক শিকারীর মতো | শুরু হ'ল পাগানিনির নিজের সৃষ্ট 'ইল স্ট্রীঘে' 'দ্য উইচেস' বা 'ডাইনী'-দের নাচের সুর | মনে

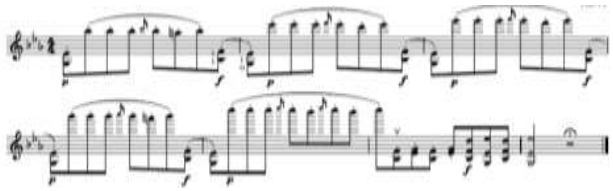

The secret behind Paganini's amazing technique

****

হ'ল তারা যেন এক অপার্থিব নাকী গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে | আবার মাঝে মাঝে বেহালার থেকে বেরোচ্ছে যেন কান্নার সুর, আর তার সাথে সাথে 'ম্যায়েস্ত্র' পাগানিনির লম্বা চুল পাগলের মতো এলোমেলো নেচে বেড়াচ্ছে! অনুষ্ঠানের পর এক সঙ্গীত সমালোচক 'এথেনিয়াম' পত্রিকায় লেখেন – হতভাগ্য বেহালাটি বাইবেলে বর্ণিত 'জামিয়েল' নামের এক 'মিথোলজিকাল' শয়তান শিকারীর হাতের পুতুল হয়ে মরণভয়ে আর্তনাদ করেছে |

দুই হাজার তেরো সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'The Devil's Violinist'-এ পাগানিনির ভুমিকায় অভিনয় করেন বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বেহালা-বাদক ডেভিড গ্যারেট |২ একটি দৃশ্যে দেখা যায় ডেভিড গ্যারেট পাগানিনির সৃষ্ট 'ক্যাপ্রিস ২৪' বাজাচ্ছেন পূর্বে বর্ণিত লন্ডনের কিংস্ থিয়েটারে | প্রেক্ষাগৃহে সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখছে ও শুনছে সেই বাজনা | মেয়েদের মুখে শীৎকারের মতো আওয়াজ | হঠাৎ দেখা গেল পাগানিনি-রূপী ডেভিড গ্যারেটের পিছনে মাথায় শিংওয়ালা শয়তানের 'সিল্যুয়েট' দুলতে দুলতে উঠে সারা মঞ্চ ভরিয়ে ফেলছে | তাই দেখে মেয়েরা মূর্ছিত হয়ে পড়ছে ভয়ে আর বিস্ময়ে | পাগানিনি সম্বন্ধে নানান গুজবের কোন অভাব ছিল না |

স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল সর্বজনবিদিত | আর তাই কারা যেন রটিয়ে দেয় যে তিনি তাঁর এক মহিলা বন্ধুকে খুন করেছেন | আর পাগানিনির বেহালার ‘G-স্ট্রিং’ নাকি সেই মৃত মহিলার পাকস্থলীর নাড়ি দিয়ে তৈরি | তা না হলে তার থেকে এমন আওয়াজ বেরোয় কী করে! এই গুজবগুলি সত্য না হলেও এর জন্য শিল্পীকে প্রচুর বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত | আঠারোশো চল্লিশ সালে ৫৮ বছর বয়সে পাগানিনির মৃত্যু হয় | কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে শয়তান সম্পর্কীয় রটনার ফলে ক্যাথলিক চার্চের নির্দেশে তাঁকে ‘খ্রীষ্টীয়ান বেরিয়াল’ দেওয়া যায়নি | এরপর নানা প্রচেষ্টা, এমনকি ভ্যাটিকানে পোপের কাছে একাধিক আর্জি ও বেশ কয়েকবার তাঁর দেহাবশিষ্ট এখান থেকে ওখানে সরানোর পর ৫৬ বছর বাদে পাগানিনির জন্মস্থান ইতালির পারমায় তাঁকে শেষবারের মতো কবর দেওয়া হয় |

সেদিন সন্ধ্যেয় খাওয়াদাওয়া খুব ভাল হ’ল, আর তার সাথে ছিল আমার প্রিয় ‘পিনো নোয়া’| অনেকটাই খেয়ে ফেলেছি | ভরা পেট আর বেশ একটু রঙিন মন নিয়ে আমি আমার বেহালাটা হাতে তুলে নিলাম | মাথায় ছিল নিকোলো পাগানিনি আর তাঁর বিখ্যাত কম্পোসিশন ‘ইল স্ট্রীঘে’| অবশ্যই পাগানিনির প্রতিভা, ক্ষমতা, তালিম কোনটাই আমার নেই | সুতরাং বেহালা নিয়ে কিছুক্ষণ এলোমেলো বাজানোর পর হাল ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম |

পরের দিন সকালে দেরি করে ঘুম ভাঙল মাথায় দপদপে ব্যথা নিয়ে | দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম | কিন্তু তবু কিছু হয় না | শেষে ব্যথা কমাতে হাতের আঙ্গুল দিয়ে চুলের মধ্যে বিলি কাটতে গিয়ে মনে হ’ল মাথার সামনে দুধারে শক্ত মতো ফোলা | তা ছাড়া আমার শিরদাঁড়ার শেষে কি যেন একটা গজিয়েছে, বেশ অস্বস্তিকর | আমি প্রচণ্ড ভয়ে চোখ বন্ধ করলাম, যদি এবার আমার পায়ের দিকে নজর পড়ে!

****

১. Addison Nugent, https://www.ozy.com/flashback/why-the-devil-plays-the-fiddle/87458

২. https://www.youtube.com/watch?v=YCsVEsQlm7o

•••৯◆৫•••

মায়া, কায়া এবং অর্ধনারীশ্বর

সুস্মিতা রায়চৌধুরী

“**ক**য়েদী ১০৩ নয়, ওর নাম নীপমঞ্জরী”... জেল থেকে বেরোনোর সময় অ্যাটেন্ডেন্স খাতায় সই করতে করতে আরেকবার তীব্র প্রতিবাদী-কণ্ঠে বলে ওঠে মৃত্তিকা | পুলিশের তাচ্ছিল্য অগ্রাহ্য করে সে বেরিয়ে আসে স্যাঁতসেঁতে কারাগারের দমবন্ধকরা পরিবেশ থেকে | মনে মনে ভাবে, ‘সংশোধনাগার’ নামটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য করা উচিত | সানগ্লাসেস্-এ চোখ ঢেকে গাড়িতে স্টার্ট দেয় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই মৃত্তিকা সেন, পেশা এবং নেশা যার ওকালতি | কয়েদী ১০৩ থেকে আসল নামটা ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াই শুরু কাল থেকে | খুনের আসামী না রোজ খুন হওয়া একটা লাশের বাঁচার মরিয়া চেষ্টা তা প্রমাণ-সাপেক্ষ | আর তারপরের লড়াইটা ছাপোষা সামাজিক হওয়ার |
পাশ থেকে দুজন বলে গেল আর একদিন পর দেবীপক্ষ | গাড়ির জানলার কাঁচটা তোলে মৃত্তিকা, দূরে যেন শুনতে পাচ্ছে – “ওগো আমার পথ দেখানো আলো/ জীবনজ্যোতিরূপের সুধা ঢালো/ দিক হারানো শঙ্কাপথে আসবে/ অরুণ রাতে আসবে কখন আসবে/ টুটবে পথের নিবিড় আঁধার সকল দিশার কালো |”
বাড়ি পৌঁছে কেসটা আবার ঝালিয়ে নেবে ভাবতেই কলিং বেল বেজে ওঠে | রাধাদি এসে বলে, “কুন্দনিকাদিদি এসেছে |”
“বসতে বলো, আমি আসছি” বলে একবার কেস-ফাইলটায় চোখ বোলায় মৃত্তিকা | কতটা নির্যাতনের শিকার হলে একটা মানুষ গুলি করে মারার পরেও নিজের বাবার মাথাটা থেঁতলে দিতে পারে, তা একবার ভাবার চেষ্টা করে সে | আদালতের চার দেওয়ালে যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব ছোঁয়ার বয়ঃসন্ধিতে, শাশুড়ির বউকে পুড়িয়ে মারা, বা বরের মানসিক নির্যাতনের শিকার বউ – এসব তার কাছে জলভাত | এসব কেস সে নেয় না; বরং তার বেশি সময় কাটে নেতা বা কালোবাজারি বা হাই প্রোফাইল রাজনৈতিক কেস নিয়ে | কিন্তু এই প্রথমবার সে সাধারণের অসাধারণ হওয়ার লড়াইটা লড়ছে | খুনটা নীপমঞ্জরী চ্যাটার্জী করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ফিঙ্গার প্রিন্টও তাই বলছে এবং সে নিজেও তা স্বীকার করেছে মৃত্তিকার কাছে | কিন্তু মৃত্তিকাকে যা আকর্ষণ করে, সেটা পর্দার আড়ালে থাকা | এই সমাজে যেটা অসুস্থ মানসিকতা | সেই ধারণাটাকে ভুল প্রমাণ করার মরিয়া চেষ্টাটা শেষবারের মতন করবে সে | এই কঠিন

রাস্তায় তার একমাত্র সারথি কুন্দনিকা ব্যানার্জী – পেশায় মডেল এবং নীপমঞ্জরীর বান্ধবী, আর তার একমাত্র ভালবাসা। ধনী সম্ভ্রান্ত চ্যাটার্জী পরিবার যেখানে মুখে কুলুপ এঁটেছে, উপরন্তু তাদের বাড়ির বউকে মার্জিত ভাষায় অসুস্থ, চরিত্রহীন বলতেও পিছপা হয়নি, সেখানে ছোটবেলার ভালবাসা আজও লড়তে প্রস্তুত এই নেকড়ে সমাজের বিরুদ্ধে। মৃত্তিকা উঠে আসে ভিসিটরস্ রুমে। আজ কিছুটা বিহ্বল লাগছে কুন্দনিকাকে । সে বলে ওঠে, "নীপোকে বাঁচানো যাবে তো, মৃত্তিকা?"

একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে মৃত্তিকা বলে, "তুমি শুরু থেকে আর একবার পুরোটা বলো তো আমায়।"

নীপমঞ্জরী এবং কুন্দনিকা দুজনে সেই ছোটবেলার স্কুল থেকে বন্ধু। ছোটখাটো চেহারার সাধারণ মানের ছাত্রী নীপমঞ্জরী; অনেকের কাছেই খুব এলেবেলে। লাস্ট বেঞ্চের বদমায়েশীর সাথে তাল মেলাতে না পারা, আবার সুখ্যাত ইংরেজি মিডিয়াম শিক্ষিকাদের চোখে ফার্স্ট বেঞ্চের উপযুক্ত না হওয়ায় নীপমঞ্জরী সর্বত্রই বড্ড বেমানান। টিফিন টাইমে হাত ধুয়ে আসার পরে রোজ দেখা টিফিন নেই, বা ছুটির সময় হঠাৎ ব্যাগ না খুঁজে পাওয়া, বা অহেতুক শিক্ষিকাদের চোখে যে কোনও দোষে অপমানিত হওয়া – যেখানে অন্যরা শুধু একটু বকা খেয়েই ছাড় পেয়ে যায় – এসবের সাথে লড়তে থাকা নীপমঞ্জরীর স্কুলের দিনগুলো অসহনীয় এবং ভীষণ একাকীত্বে ভরা। কুন্দনিকা তা দেখলেও কোনদিন এগিয়ে যায়নি, কারণ নীপমঞ্জরী "ব্যাড গার্ল"। ওর সাথে কথা বললে তাকেও বাঁকা চোখে দেখে সবাই। তাদের দেখা হওয়ার কারণটাও নীপমঞ্জরীর এক বছর পাস না করতে পারা। অতএব ফেল করা একটা মেয়ের স্কুলে একঘরে হওয়াই স্বাভাবিক, সেটা মেনে নিয়েছে নীপমঞ্জরী নিজেও। একদিন টয়লেটে কথা হলে পর কুন্দনিকা বোঝে কী ভীষণ দুঃসহ এই স্কুলের জীবন তার কাছে। তাই শায়নের নোংরা প্ল্যানটায় আর চুপ থাকতে পারেনি কুন্দনিকা। তখন ক্লাস নাইন। তারই বন্ধু শায়ন এবং সবাই মিলে প্ল্যান করেছিল নীপমঞ্জরীকে নিয়ে একটু মজা করবে। সুন্দর সৌম্য শায়ন, সহজেই ভালবাসায় বাঁধে নীপমঞ্জরীকে। সবাই বলত ওরা ঘনিষ্ঠ হয়েছে বাড়িতে। কিন্তু কুন্দনিকা নীপমঞ্জরীকে প্রথমবার খুব খুশি দেখেছিল। অথচ সে সবটাই তো একটা নিছক মজা! চার মাস যেতেই শায়ন রটিয়ে দেয় নীপমঞ্জরীর শরীর নিয়ে সে কী কী করেছে এবং সে কতটাই সহজলভ্য। এর পর একদিন কয়েকটি ছেলে দল বেঁধে নীপমঞ্জরীকে কটুক্তি করে ও তার শরীর স্পর্শ করার চেষ্টা করে। শিক্ষিকাদের কাছে গিয়ে সে নালিশ করলে তাকে শুনতে হয়, "ইউ আর স্পয়লিং দি রেপুটেশন অফ দি স্টুডেন্টস্।" সত্যিই তো প্রথম হওয়া শায়নের নামে এসব শোনাও পাপ। বাড়তে থাকে নির্যাতন, যখন বুলিইং শব্দটাও ওরা শেখেনি। কিন্তু সেই প্রথমবার কুন্দনিকা তার ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। অপমানিত, লজ্জিত, একা একটি ছাত্রীর 'প্রিয় বান্ধবী' তখন সে। ডাকসাইটে সুন্দরী, ভাল রেজাল্টকরা কুন্দনিকার ওপর কথা বলবে এমন ছাত্রছাত্রী তখন নেই। সেই শুরু নীপো-কুন্দর সখ্যতা। কুন্দনিকা তাকে বোঝায় বাড়িতে সব জানাতে। নিজের সেকেলে গোঁড়া মধ্যবিত্ত পরিবারে কুন্দর পরামর্শে সব কথা খুলে বলে খুব মার খেয়েছিল নীপো সেদিন। "পড়াশুনা করতে যাও না নোংরামো?" এমনই উত্তর দিয়েছিলেন নীপোর বাবা। কুন্দ বোঝে একমাত্র সেই তার পরিবার। মেয়ে বলে তার অবাধ বিচরণ নীপোর বাড়িতে তখন। নীপমঞ্জরীকে সবরকমভাবে পড়াশোনায় সাহায্য করে সে।

কুন্দ বলেছিল, "জানবি আমাদের পরিচয় শুধুমাত্র পরীক্ষার রেজাল্ট। তারপর খুন করলেও তোকে মাফ করে দেবে সবাই।" ভাল নম্বর পেয়ে স্কুলের গন্ডি পার করে দুজনে। তার সাথে যেটা জন্ম নেয়, তা হ'ল আত্মবিশ্বাস। নীপমঞ্জরী ক্রমশ ফিরে পায় তার অভিন্নতা।"

এই বলে কিছুটা থমকায় কুন্দনিকা।

মৃত্তিকা জিজ্ঞেস করে, "ও প্রথম কবে এই অত্যাচারের শিকার হয়?"

উত্তর আসে, "স্কুল বা পরিবার থেকে যে অকারণে ব্যাড, ন্যাস্টি বা সংসারের বোঝা, তার অত্যাচারিত হওয়ার শুরু সেই ছোট থেকেই।"

একই কলেজে কমার্স নিয়ে ভর্তি হয় দুজনে।

কুন্দনিকা বলে, "জানো মৃত্তিকা, কী সহজভাবে ভাল থাকার চেষ্টা করত নীপো। কলেজে একটু সাজতে পারলেই ভাবত পুরোটাই যেন সিনেমার মতন।" কিন্তু বেশীদন টিকল না সেই সুখ। নীপোকে সেদিন দুপুর থেকে ফোনে পায়নি কুন্দ। বেশ খানিক চিন্তা নিয়েই ওদের বাড়ি পৌঁছায় সে। কিন্তু সেই প্রথমবার তাকে বার করে দেয় নীপোর বাবা – এই বলে যে, হুটহাট তাদের বাড়িতে আসা যাবে না। সে বোঝে কোথাও কিছু একটা ঠিক নেই। কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা, অতএব ফিরে যেতে বাধ্য হয় সেদিন কুন্দনিকা। রাত দশটায় একটা মেসেজ আসে

নীপোর, "আমি আত্মহত্যা করতে ভয় পাই রে, কিন্তু আজ আর বাঁচতে পারছি না..."

সেদিনের রাতটা আজও ভোলা যায়নি | মেসেজের পর মেসেজ করে যাচ্ছিল কুন্দনিকা, কিন্তু কেউ সেসব দেখেনি | দুদিন এমনভাবেই কাটে | ওর বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এলেও নীপোর বাবার সাথে তর্ক করা মানে নীপোকেই আরও খারাপ পরিস্থিতির সামনে এগিয়ে দেওয়া – সেটা সে জানত | তখনও কথার অমান্য হলে মেয়ের গায়ে হাত তুলতেন নীপমঞ্জরীর বাবা |

তিনদিনের মাথায় মেসেজ আসে, "অটো স্ট্যান্ডে দাঁড়াস, কলেজ যাব একসাথে |" কুন্দ জানত এখন সবটা দিয়ে ভালবাসতে হবে নীপোকে | এই ক'দিনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি তৈরী হয়েছে তার | বন্ধুত্ব না তার থেকে বেশী কিছু বুঝতে পারছে না সে | শুধু মনে হতো এখুনি চাই নীপোর হাতদুটো | মনে হতো একবার কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেই ভাল হয়ে যাবে নীপো | কুন্দর মা সিঙ্গল মাদার | শত কাজের ব্যস্ততাতেও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মেয়ের এই চঞ্চলতা | ঠিক কারণটা বোঝাতে পারেনি সে মাকে | কিন্তু মা বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছিলেন তাকে |

ঠিক সময় দেখা হয় দুজনের | নীপো বলে, "আমায় কোথাও নিয়ে চল |"

নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল কুন্দ তাকে | বুকে মাথা রেখে চুলে বিলি কাটতে কাটতে যেন শান্তি পাচ্ছিল সে নিজেও |

নীপো বলে, "কাকামণি আমার শরীরটা শেষ করে দিচ্ছে রে |" ককিয়ে কেঁদে ওঠে নীপমঞ্জরী | ছোটবেলা বলতে তার বাবা মা আর অবিবাহিত এই কাকা | এতদিন কুন্দর থেকে লজ্জায় লুকিয়ে রেখেছিল এইসব কথা | ক্লাস সেভেনে প্রথম নিজের কোলে বসিয়ে অদ্ভুতভাবে আদর করেছিল কাকামণি | সে ভয় পেয়ে মাকে বলায় মা বলেছিল কাউকে না বলতে | এরপর সে নিজের বাড়িতেও সারাক্ষণ মায়ের সাথে সাথে থাকত |

নীপো বলতে থাকে, "জানিস কুন্দ শায়নের সাথে আমার কিছু হয়নি | ও যখন নিভৃত দুপুরে শুধু চুমু খেয়েছিল আমায়, সেদিন খুব ভাল লেগেছিল আমার | কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় আবার ফাঁকা বাড়িতে কাকামণি জোর করে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমায় ছুঁয়ে দেখতে বলে ওঁকে | আমাকেও নগ্ন করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে আমার শরীরটা | বাবা এসে পড়ায় কাকামণি পালালে বাবা আমার গায়ে হাত তোলে, এই বলে যে, আমি নাকি জঘন্য, নোংরা |"

কুন্দনিকার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল একটা ভয়ংকর আগুনে | নীপো বলতে থাকে, বার বার তার সাথে এসব হতে থাকে | কিন্তু তার বাবা জানলেও বলে মেয়ে হয়ে এসব কথা কাউকে না বলতে, কারণ দোষটা নাকি তার মেয়ে হয়ে জন্মানোর | কাকামণির ওপর তার বাবা চিৎকার করলেও কাকামণি ছিল নির্বিকার | মা বলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেই শান্তি | কিন্তু তিনদিন আগে শুধু স্পর্শে থেমে থাকেনি ব্যাপারটা | তাকে জোর করে শারীরিক সম্বন্ধে লিপ্ত করায় কাকামণি | বার বার ধর্ষিত হয় সে একটা লাশের মতো | বাবাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল মা, সেই সুযোগে এইসব | পরে বাবার পায়ে পড়ে সব বললেও, সমাজের ভয়ে নীপোকে বলা হয় চুপ করে থাকতে | আর মা কান্নায় ভেঙে পড়ে ঠাকুরের কাছে মাথা চাপড়ালেও কোনও প্রতিবাদটুকু করে না | কুন্দকে সবটা বলে দেবে জানতে পেরে তার মোবাইল নিয়ে নেয় বাবা | ওদিকে কাকামণির গায়ে বাবা হাত তুলতেই কাকামণি বলেন তিনি চলে যাচ্ছেন বাড়ি ছেড়ে | কিন্তু নীপো – সে যাবে কোথায়? তাই মেয়ে হওয়ার মাসুল তাকে ওই বাড়ির চার দেওয়ালে থেকেই দিতে হয় রোজ |

উদাসীন কুন্দনিকা মৃত্তিকার দিকে তাকায় | জিজ্ঞেস করে, "জেলখানার অভিজ্ঞতা আগেও ছিল নীপোর, খুব অসুবিধা হচ্ছে না তাহলে, বলো?"

সেই দুপুরবেলা কুন্দনিকা প্রথম বুঝতে পারে যে সে অন্যরকমভাবে ভালবাসে নীপমঞ্জরীকে | সে তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নীপোর কাকামণিকে খুন করবে | জেল হলেও পরোয়া নেই | রাগে, অসহায়তায় কাঁপতে থাকা কুন্দকে জড়িয়ে ধরে নীপো | তার শীতলতায় ঠান্ডা হয় কুন্দর মন, কিন্তু প্রতিশোধের আগুনটা জ্বলতেই থাকে | আলতো করে কুন্দ চুমু খায় নীপোর কপালে | বাধা দেয় না সেও | আদরে ভরিয়ে দেয় তার কোমল শরীর | তরল রোদ্দুরে মিশে যায় স্রোতস্বিনী খরস্রোতা মেয়েবেলা | আশ্রয় পায় আলিঙ্গনে | খুব ভাল লাগছিল মধুপর্ণের ঔরসে সমকামীতার সুন্দরীগাথা |

"সেই বছরও পরের দিন মহালয়া ছিল জানো মৃত্তিকা, মনে হচ্ছিল এই সঠিক পিতৃপক্ষের অবসান," বলে কুন্দনিকা | কোমল ওষ্ঠে প্রাণ পায় তিতিবিরক্ত একাকীত্ব | রাই-রাধার কামুক পেলব ভালবাসার স্পৃহায় তখন প্রতিশ্রুতির দ্বায়িত্ববোধ | সামাজিক কঠিন মনস্তত্ত্বকে তোয়াক্কা না করে সিঁদুরের ছিটেয় পথ হারায় দুপুরের ধ্রুবতারা |

কুন্দ নীপোর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "বিয়ে করবি

আমায়? চাকরি তো আমরা দুজনে ভালই পাব। ক'টা দিন একটু লুকিয়ে রাখলে তারপর কেউ আইনত আটকাতে পারবে না আমাদের। ভালবাসিস আমায় নীপো?"

নীপমঞ্জরীর নিঃশব্দ সম্মতিতে একটাই ভয়, "আমি তাহলে শায়ন বা অনিন্দ্যর কথাও ভাবি কী করে বল তো, আমি কি তাহলে উভয়কামী?"

অনেক অজানা প্রশ্ন এমন থাকে, কিন্তু সহজ উত্তর চাওয়া বারণ। সমাজবদ্ধ মানুষ হওয়ার মাপকাঠিতে এসব শুধুই অসুস্থতা। কিন্তু হঠাৎই ধরা পড়ে যায় ওদের অশালীন ভালবাসা। দশমী ছিল সেদিন। যখন সিঁদুর খেলে নীপোর ঘরে এসে বসে কুন্দ, হঠাৎই নীপো একটা চুমু খায় তাকে। কুন্দ বারণ করলেও ভালবাসতে ইচ্ছে করে মনের মানুষকে সিঁদুররাঙা রূপে। মাকে নিয়ে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিল বাবা। শুরু হয় মধুমাসের মধুমিলন। বিসর্জনে বোধন হয় প্রকৃত ভালবাসার, অনাবিল হাসির, সুস্থ ভাল থাকার। ওদিকে তখন, "আসছে বছর আবার এসো মা"। ওদের ভালবাসায় তখন পরের বছর শুধু নয় সারা জীবনের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু হঠাৎই অবসান হয় দেবীপক্ষের। ধরা পড়ে যায় অশিক্ষিত সমাজের সামনে 'বিকৃত মানসিকতা'। কুন্দনিকার পরিবার তুলে তাকে মারধোর করেন নীপমঞ্জরীর বাবা। শাসানো হয় কুন্দনিকার মাকেও। সিঙ্গল মাদার মানেই চরিত্রহীন। পাড়ায় টিকতে দেওয়া হবে না মেয়েকে সামলাতে না পারলে। কুন্দকে খুনের ধমকিও দেওয়া হয়। কুন্দনিকা তখনও বলে যায়, নীপোর কোনও দোষ নেই। ভয়ে তখন বাইশ বছর বয়সীর পা ভিজে যাচ্ছে সকলের সামনে।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় সেদিনের পর। তাই সেদিনের পর ঠিক কী ঘটেছিল, সেসব অনেক পরে জানতে পারে কুন্দনিকা। দুবছর আগে যখন তার নীপো... নীপমঞ্জরী চ্যাটার্জীর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুজোর পরেই। কুন্দকে পাঠানো শেষ মেসেজ ছিল, "আমি পারলাম না, বাবা আমাকে মেরে ফেলছে, মায়ের ওপরেও চলছে অত্যাচার।" কুন্দনিকা আটকায়নি তাকে। নির্বোধ একটা অসহায়তায় নিজেকে বুঝিয়ে নিয়েছিল, যদি কোনওদিনও ফিরে আসে নীপো, আগলে রাখবে তাকে।

ঘড়িতে রাত ন'টা। মৃত্তিকা এবার থামায় তাকে। "বাড়ি যাও, অনেক রাত হ'ল। আমি জানি বাকিটা। শুধু একটাই কথা, খুন কিন্তু নীপমঞ্জরী করেছে, কোনও আবেগে নিজের নাম জড়াবে না কাল। কেস তাহলে বাঁচাতে পারব না আমি। বাকিটা তুমি জানো।"

বেরিয়ে যায় কুন্দনিকা ব্যানার্জী, জীবনের রঙ্গমঞ্চে আসল অভিনয়ের যবনিকা পতন ঘটবে কাল। কাল চূড়ান্ত রায়ে মৃত্তিকা সেনের প্রথমবার অশিক্ষিত ভীরু সমাজের মহিষাসুর বধ করার সুযোগ।

আজ সকালটা একটু যেন অন্যরকম। কেমন গুমোট বেঁধে আছে চারিদিক। ঈশানকোণে খানিক মেঘ জমেছে কালো করে। দগদগে পোড়া গরমে যেন খাঁখাঁ করছে পিচগলা রাস্তা। মায়ের এবার ঘোটকে আগমন। ছারখার করে দিতে পারে শস্যসবুজ বসুন্ধরা। ভালই হয়। তবে যদি ওলটপালট হয় সবকিছু। এসব ভাবতে ভাবতেই মৃত্তিকা সেন হাতে উঠিয়ে নেয় তার কালো কোট। শোষণ বা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে আইন আছে কিন্তু পরিবারের পরোক্ষ প্ররোচনার বিপক্ষে আজ লড়তে হবে তাকে। শুধু আবেগের বশে সবটা না বলে দেয় কুন্দনিকা!

আদালতে পৌঁছায় মৃত্তিকা। নীপমঞ্জরী গতকাল বেশ শান্ত ছিল। যেন সে জানে ঠিক কী করতে হবে তাকে এবং তার কোনও অনুতাপ নেই তার বাবাকে খুন করায়।

স্কুলের বন্ধু থেকে চ্যাটার্জী পরিবার সবাই আজ উপস্থিত ন্যায়ের মন্দিরে। এসেছেন কুন্দনিকার মা। শুধু নীপমঞ্জরীর মা আজও আসেননি। কিছু মায়েরা বোঝে না মাতৃত্ব শুধু ন'মাসের কষ্ট সহ্য করা অধিকারবোধ নয়, বরং নিজের ভেতর বাড়তে দেওয়া এক মন-হুঁশের সৃষ্টি। আরেকবার ঋতুমতি হয়ে ওঠার গর্ব, নিজেকে প্রস্ফুটিত করার এক দায়িত্ববোধ আর স্বয়ংসিদ্ধা হয়ে ওঠার এক অদম্য প্রচেষ্টা।

নীপমঞ্জরী এগিয়ে আসে মৃত্তিকার দিকে – বলে, "জিতেছি আমি, শুধু কুন্দর অপেক্ষার অবসান হতে পারে আপনার যুক্তিতে।"

কাঠগড়ায় খুনের আসামী নীপমঞ্জরী। অন্যদিকে সাক্ষী বদল হতে থাকে। প্রশ্ন, পাল্টা প্রশ্নের সাক্ষী হয় সততা। শায়ন বসুর জবানবন্দীতেও উঠে আসে স্কুলের বুলিং। আজ সে কাপুরুষ নয়; এক মেয়ের বাবা সে। সবার শেষে কাঠগড়ায় আসে কুন্দনিকা। মুখোমুখি প্রকৃত বন্ধুত্ব। মৃত্তিকা জিজ্ঞেস করে, "আপনাকে কবে যোগাযোগ করেন নীপমঞ্জরী এবং কী বলেন সেটা আদালতকে খুলে বলুন।"

কুন্দনিকা সবটা আরেকবার মনে করে উত্তর দেয়। "জোর করে

বিয়ে দেওয়া হয়েছিল নীপোর | যোগাযোগ হয় ওর বিয়ের চারমাস পর | ফোনটা নীপমঞ্জরী করে তাকে | বিয়ের পর সব ভুলে নীপমঞ্জরী ভেবেছিল এবার চুটিয়ে সংসার করতে পারবে সে; দুঃখের দিন তার শেষ | কিন্তু সবাই যা ভাবে তা হয় না | চরিত্রহীন ব্যভিচারী স্বামীর আসল রূপটা প্রকাশ পেতে থাকে রোজ | শুধু নারীসঙ্গ নয়, অফিসের বিভিন্ন পার্টিতে নীপমঞ্জরীকে সে জোর করে অন্যের সাথে শারীরিকভাবে লিপ্ত হতে বলে | না মানলেই চলত মারধোর | নীপমঞ্জরীর বাবার কাছে অভিযোগ জানানো হয় এই বলে যে, সে একজন ইউসলেস্, বেকার বউ | আবার শুরু হয় মানসিক অত্যাচার | বাবা ক্রমাগত বলতে থাকে, 'শ্বশুরবাড়িতেও মানাতে পারছিস না যখন, এবার তাহলে আত্মহত্যা কর |' এমন এক সময়ে কুন্দনিকাকে যোগাযোগ করে সে | তার সঙ্গে দেখা হবার পর নীপোর গায়ের কালো দাগ দেখে সে জানতে পারে প্রত্যেক রাতে তার অসহনীয় অত্যাচারের কাহিনী | এর মধ্যে নীপোকে বাধ্য করা হয়েছিল দুজনের সাথে শুতে | একজন অভ্রর, মানে নীপমঞ্জরীর স্বামীর ম্যানেজার, আর একজন তার বন্ধু | তৈরি করা হতো ভিডিও, যাতে ভয় দেখানো যায় এই বলে যে, কারোর কাছে অভিযোগ করলেই বাজারে আসবে সেইসব | বাবা রোজ বলতে থাকে এসব প্রত্যেক বাড়িতেই একটু-আধটু হয়; সহ্য করতে না পারলে আত্মহত্যা করে নিলেই ভাল | শাশুড়ি নির্বাক, তাঁর উপদেশ, একটা সন্তান এলেই এসব ঠিক হয়ে যাবে | স্বামীকে বেঁধে রাখার ছল জানতে হয় |"

এতটা বলে কুন্দনিকাকে থামতে হয় মৃত্তিকার আদেশে | মৃত্তিকা আদালতে পেশ করে নীপমঞ্জরীর সেইসব ভিডিও যেখানে খুব স্পষ্ট যে, কোনো এক তৃতীয় ব্যক্তি এই ভিডিওটি করেছেন |

মৃত্তিকা সেন বলেন, "ইয়োর অনার, অভ্র ও তার মায়ের মত অনুযায়ী যদি এই ভিডিও স্বেচ্ছায় বানানো হয় তাহলে সেখানে নীপমঞ্জরী এমন লাশের মতন পড়ে আছে কেন? সাধারণত যারা এমন ভিডিও বানায় তারা মুখ দেখায় না, যাতে এম.এম.এস করলে কোনো অসুবিধা না হয়, কিন্তু এখানে পুরুষটির মুখ দেখা না গেলেও নীপমঞ্জরীর মুখ স্পষ্ট | ইয়োর অনার, দিনের পর দিন সেই ছোটবেলা থেকে পুলিশ এবং শোষণের শিকার এই মেয়েটিকে বারবার মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে তার নিজের বাবা | ঘরবন্দী করে সবার সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দেওয়া হয় তার | এবং বিয়ের পরেও এমন চরিত্রহীন পুরুষের সাথে বসবাস না করলে মৃত্যুর প্ররোচনা দিতে থাকেন তার নিজের বাবা |"

বিপক্ষ উকিল বলে ওঠেন, "এর সাথে খুনের কোনও সম্পর্ক নেই |"

"আছে, ইয়োর অনার |" বলেন মৃত্তিকা সেন |

"অবজেকশন ওভাররুল্ড" আদেশ দেন মহামান্য জজ্ |

নীপমঞ্জরীর দিকে এগিয়ে যায় মৃত্তিকা – "ঠিক কী কারণে ঘটেছিল ঘটনাটা, কেন আপনি খুন করলেন নিজের বাবাকে?"

ছাপোষা ভীতু মেয়েটা আজ কঠিন, সোচ্চার | নীপমঞ্জরী একটু দম নিয়ে শুরু করে সবটা – "আচমকা আবার ফিরে আসে কাকামণি | শুরু হয় আমার ওপর আরও নোংরামি | বাবাকে এই বলে কাকামণি বাড়িতে ফিরে আসে – যে তাকে থাকতে না দিলে অভ্রকে জানিয়ে দেবে সে সবকিছু | বাবা তাই আমায় আবার বলে, মানিয়ে নিতে | ফোনে শুরু হয় নোংরামির আব্দার | ওদিকে তখন বেড়েই চলেছে অভ্রর উন্মত্ত ভ্রষ্টামি | কুন্দনিকার পাশে থাকার আশ্বাসে আমি তখন ডিভোর্সের কথা জানাই অভ্রকে | অতএব চ্যাটার্জী পরিবার থেকে নিষ্কৃত হই আমি | কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হয় না | কুন্দনিকার নিশ্ছিদ্র আশ্রয় আমার অধিকার | কিন্তু বাবা ঠিক বুঝতে পারে কোথায় যেতে পারে মেয়ে! অতএব কুন্দনিকার মায়ের থেকে জোর করে জেনে নেয় আমাদের নতুন ঠিকানা | অভ্রকেও সবটা জানায় বাবা | অভ্র আমায় ঘেন্নায় কটূক্তি করে বলে – বাপের-বাড়ি না ফিরলে সবাইকে দেখিয়ে দেবে ভিডিও, কিন্তু বাড়ি ফিরলে ডিভোর্স দেবে সে কথাও দেয় | সমাজের কাছে লজ্জায় তখন নাকি মাথা কাটা যাচ্ছে আমার বাবার! কুন্দনিকা মানা করলেও ডিভোর্সের পর মুক্তির লোভে সম্মতি জানাই আমি |"

'আর কটা দিন, তারপর মুক্তি' কুন্দনিকাকে এই বলে সে বাড়ি ফেরে | কিন্তু কুন্দনিকা জানত কোথাও একটা খুব বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে! বাড়িতে ফিরতেই কাকামণির থাবার কবলে পড়ে সে | অবাক হয়ে সে দেখে বাবার নিশ্চুপ সম্মতি, আর মায়ের ঠাকুরঘরে লুকিয়ে কান্না | কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না | উপরন্তু বাবা বলে কাকামণি যা বলছে তাই করতে, নাহলে পাড়ায় সব বলে দেবে কাকামণি | মাথা হেঁট হয়ে যাবে পুরো পরিবারের | দাপিয়ে বেড়ায় পাশবিক পুরুষত্ব | কাকামণি খুলে দিচ্ছে একটানে গায়ের কাপড় | বাধা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় তারস্বরে চিৎকার করে নীপমঞ্জরী, "আর পারছি না, শরীরটা ছিবড়ে হয়ে গেছে, একটু বাঁচতে দাও আমায় | খুব ব্যথা সারা

গায়ে, আর পারছি না।" ঋতুস্রাবের রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে।
"একটু বাঁচতে দাও। এবার কি শেষ ভোগ করবে আমায়? কথা দাও এই শেষ, তাহলে মেনে নেব সব। আর পারছি না।"
নিষ্ঠুরভাবে মুখ চেপে ধরে বাবা। চিৎকারে লোক জানাজানি হলে সমাজ জেনে যাবে মেয়ে উভয়কামী, সমাজ জেনে যাবে মেয়েকে রাখেনি স্বামী। ছি ছি! রোজ ভীড় বাসে ধর্ষিত হয় কত নারী, রাতের অসম্মতিতে, নিজের বাড়িতে। এ আর এমন কী! কিন্তু সমকামীতা যে পাপ! হায় রে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অমানুষিক মনোভাব! মুখ চেপে ধরে বাবা হাতদুটো বাঁধতে বলে কাকামণিকে। আর সামলাতে পারে না নিজেকে নীপমঞ্জরী। হাতের সামনে পেয়ে যায় কাকামণির পিস্তলটা। আত্মরক্ষার কারণে লাইসেন্স পিস্তল থাকত তাঁর কাছে। গুলি চালায় নীপমঞ্জরী নিজেকে বাঁচাতে। পালিয়ে যায় কাকামণি। গুলি করার পরেও পেপারওয়েট দিয়ে দুবার বাবার মুখের ওপর আঘাত করে সে। নিজেকে বাঁচাতেই এই পদক্ষেপ কারণ ভীত, সন্ত্রস্ত নীপমঞ্জরী আর পারছিল না ধর্ষিত হতে। অনুশোচনা নয়, আশ্চর্য কঠিন এক নির্লিপ্ততা তার সারা মুখে।
কিছুক্ষণ চুপ সবাই। আদালতে কি সবার মাথা হেঁট আজ?
বিপক্ষ উকিল জজের দিকে তাকিয়ে বলে, "দেখুন, কতটা সাবলীলভাবে খুন করা হয়েছে নিজের বাবাকে, যে বাবা আর্থিকভাবে এবং পড়াশোনা করিয়ে বড় করেছে নিজের একমাত্র মেয়েকে। তাছাড়া এই খুন পূর্বপরিকল্পিত। নীপমঞ্জরী এবং কুন্দনিকা দেবীর মধ্যে সমকামীতাই এই খুনের কারণ। অহেতুক ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে অভ্র চ্যাটার্জীকে, যিনি সন্তান নিতেও রাজী ছিলেন। কোনো অভাব ছিল না নীপমঞ্জরী দেবীর। ইয়োর অনার, নীপমঞ্জরী দেবী মানসিক ভারসাম্যহীন এবং সমাজের জন্য আতঙ্ক। তাছাড়া খুন যে সেল্ফ ডিফেন্সে করা হয়েছে তার প্রমাণ কী? ওঁকে অবিলম্বে খুনের শাস্তি দেওয়া হোক।"
মৃত্তিকা সেন হেসে প্রত্যুত্তর করেন, "আমার উকিল বন্ধু ঠিক বলেছেন যে নীপমঞ্জরী দেবীর বাবা ওঁকে বড় করেছিলেন। কিন্তু স্বাবলম্বী করেছিলেন কি? পাশে ছিলেন কি মেয়ের অসহায়তায়? আমাদের সমাজে সন্তানের জন্ম অনেক ক্ষেত্রেই যেন একটা নিয়মমাফিক আনন্দ বা সমাজে ভাল হওয়ার মাপকাঠি। বাবা-মা হবার পর সব আনন্দ বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে বড় করো এবং তারপরে নিজের না পাওয়াগুলো তার ওপর চাপিয়ে দাও। অনেকটা যেন অতিরিক্ত ভালবাসার অধিকার, যেখানে সন্তানের চাহিদা বা ইচ্ছেগুলো নিঃশ্বাস নিতে পারছে কিনা তা দেখার আবশ্যকতা নেই। নীপমঞ্জরী দেবীর মতন অনেক শৈশব নষ্ট হয় এই বুলিইং-এর কারণে; কিন্তু ছোটদের কথা শোনার কোনো বন্ধু নেই। বাবা-মা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেজাল্ট নিয়ে চিন্তিত। অথচ ভিত তৈরির সময়েই আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করে বড় হয়ে ওঠা! আর সমকামীতা বা উভয়কামীতা নয়, দোষী সে, যে মিথ্যাবাদী, যে প্রবঞ্চক, যে ব্যভিচারী। একটি মেয়ে সমকামী হলে সে অসুস্থ নয়; বরং অসুস্থ সেই ব্যক্তি, যে অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভোগ করেন। ইয়োর অনার, একবার ভাবুন নীপমঞ্জরী কতবার শোষিত হয়েছেন? একটিমাত্র বন্ধু – তাকেও ছেড়ে ভেবেছিলেন যে ঠিক আছে সংসার করে দেখি, কিন্তু সেখানেও তাকে বিকৃত শারীরিক লালসায় ব্যবহার করেন স্বয়ং তার স্বামী। বন্ধুরা, কাকা, বর প্রত্যেকজনের কাছে তিনি শুধুমাত্র একটি ভোগ্যপণ্য, আর তার রক্ষক বাবা সবথেকে বড় ভক্ষক। ধিক্কার এই পিতৃত্বে। যেখানে একটি পিতা একা মাতৃত্বের সংজ্ঞা আনছে আজকাল, সেই উত্তরণে এরকম পিতৃত্ব তো সমাজের অবক্ষয়। ভালবেসে ভাল থাকতে চাওয়ার মাশুল দিতে হয়েছে রোজ নীপমঞ্জরী দেবীকে এবং শেষে পৈশাচিক অত্যাচার। খুনটা না করলে আর কীভাবে বাঁচতেন উনি সেদিন? আর প্রমাণ? কাকাকে খুঁজে পেলেই পাওয়া যাবে প্রমাণ।" এই বলে শেষ করে মৃত্তিকা।
খানিক নিস্তব্ধতার পর জজ্ বলেন, "সত্য সামনে এলেও প্রমাণ চাই এবং এখানে প্রত্যক্ষদর্শী কেউ..."
শেষ হয় না সবটা। দরজার দিক থেকে কেউ এগিয়ে এসে বলে, "প্রমাণ আমি, আমার মেয়ে নির্দোষ, আমিই দোষী। মা হয়েও কোনওদিন মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাহস জোগাইনি। সেদিন ওরা আবার মেরে ফেলছিল আমার মেয়েকে। ও খুন না করলে বাঁচতে পারত না।" কান্নায়-সাহসে এগিয়ে এলেন নীপমঞ্জরীর মা। আজ তিনি মহামায়া, নারীশক্তির জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি! কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে সবটা বলেন তিনি।

বিচার শেষ। জয় হয় নারীত্বের। সমাজে এখনও কানাঘুষো চলবে; কিন্তু দেবীপক্ষের শুরুতে আরেকবার শুদ্ধ হবে ধরা। প্রয়োজনে পার্বতী, মা-চন্ডী রূপ ধারণ করবে বার বার। যে রূপেই আঘাত হানা হোক না কেন, নারীশক্তি অমৃত সেবন করবে তার নিজস্ব মাধুর্যে।

অস্তাচলের আগামীতে মৃত্তিকা সেনের চেম্বারে ঢোকে নীপমঞ্জরী আর কুন্দনিকা|

মৃত্তিকা সেন হেসে বলেন, "আজ তোমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগটা পেলাম | অর্থ আর বিবেকের লড়াইয়ে হেরে যাচ্ছিলাম ভীষণভাবে | কুন্দনিকা, তুমি নীপমঞ্জরীকে খুনটা করতে বলে ঠিক করেছিলে| এমন ব্যক্তির বেঁচে থাকার কোনো অধিকার বা প্রয়োজন নেই | নীপমঞ্জরী, এবার আত্মবিশ্বাসটা হারিও না| সেদিন তুমি বাড়ি ফেরার পর যে ওটাই হতো তোমার সাথে, সেটা জেনেই যে তোমরা এই পূর্বপরিকল্পনা করেছিলে, এতে কোনও অন্যায় নেই | বিষবৃক্ষকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলাই উচিত | ভাল থাকো, নিজেকে ভালবেসে বাঁচতে শেখাটা খুব প্রয়োজন|"

'ধন্যবাদ' বলে এগিয়ে যায় এযুগের "অর্ধনারীশ্বর"| দেবীপক্ষের শুরু কাল থেকে | ভোরের প্রস্ফুটিত শঙ্খধ্বনিতে বিনাশ হয় সমাজবদ্ধ মহিষাসুরের দাপট | সমাজ আমরাই, আমরাই সৃষ্টি | শরতের মেঘে ভেসে আসে তরল রদ্দুর| দূরে ধ্বনিত হয় –

"তুমি রণকতন্ত্র টঙ্কারে হানো খরকলম্বজলে
সব রথ তুরঙ্গ ছিন্ন ছিন্ন সুতীক্ষ্ণ করবালে|
নাচো ধূম্রনেত্র দনুজমুণ্ড চক্রপাতনে খণ্ডী,
তব তাতাথৈ তাতাথৈ প্রলয় নৃত্য ধ্বংসে বাঁধন গণ্ডী|
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি|"

নো লাঞ্চবক্স

অদিতি ঘোষদস্তিদার

"কাল থেকে লাঞ্চে ব্রেড বাটার ছাড়া কিচ্ছু যেন না থাকে!" কথাটা ছুঁড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল মিতুল|

সুনীতা বাসন মাজছিল | হাতটা কোনো রকমে ধুয়ে সিঁড়ির মুখটাতে দাঁড়িয়েই চেঁচাল, "কেন? তোমার আজকাল পরোটাও মুখে রুচছে না?"

প্রতিপক্ষ নিরুত্তর|

যত রাগ গিয়ে পড়ল পরিবারের একমাত্র পুরুষ মেম্বারটির ওপর| রাগ হবে না? তার জন্যেই তো চাকরি-বাকরি, কাজের লোক পরিবেষ্টিত আরামের জীবন ছেড়ে আসতে হ'ল আমেরিকায় মাস ছয়েক আগে| এসে থেকে সারাদিন জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব করে যাচ্ছে! তাতেও একটুতে সবার মেজাজ! এল অন্য ভাবনারাও | নুন দিইনি কি তরকারিতে? নাকি ঝাল বেশি? খেতেই পারেনি বোধহয়!

এদেশে স্কুলের সময় তো অনেক বেশি | সেই কোন সকালে একগ্লাস দুধ খেয়ে গেছে! আহারে! রাগ গলে দুঃখ আসছে|

ইউপি-র ব্রাহ্মণ সুনীতারা| নিরামিষাশী|

স্কুলে লাঞ্চ মেলে| কিন্তু মিতুলের অপশন প্রায় থাকে না বললেই চলে| তাই লাঞ্চ বক্সে আলুর পরোটা, পোলাও, পুরি, সবজি| ঘুরিয়ে ফিরিয়ে | খুব খুশি হতো মিতুল মায়ের হাতের টিফিন পেয়ে | বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে গুণকীর্তন চলত | ক'দিন ধরে উচ্ছ্বাসে যেন ভাঁটা পড়েছে| আর আজ এই|

বাসনমাজা শেষ করে ওপরে গেল সুনীতা | মিতুল চুপচাপ টেবিলে বসে|

"কিরে, বাজে হয়েছিল পরোটা? আয়, ভাল করে ভেলপুরি মাখছি|"

মিতুল উঠে এসে মায়ের কাঁধে মাথা রাখল| ধরা গলা|

"কাল থেকে নো লাঞ্চ বক্স মা! কাগজে মুড়ে রুটি-মাখন দেবে| তাহলে তো আর কারির-গন্ধওয়ালা-ব্রাউন বলতে পারবে না!"

দু-টুকরো

সুজয় দত্ত

(১) ভোজ

"কই রে কমলা, বাইরের ঘরটা ঝাঁট দেওয়া হ'ল? এবার বারান্দায় আয়।"

"এই হ'ল বলে, বৌদি। খাটের তলায় ঝুল জমেছে অনেক, ঝ্যাঁটা দিয়ে পোস্কার করতিছি।"

"দূর বাবা, এই সকালবেলা অফিসটাইমে তোকে ঝুল ঝাড়তে হবে না, রান্নাঘরে একগাদা বাসন পড়ে আছে..."

"আসতিছি গো আসতিছি। আগে তোমার তয়-তরকারীগুলো কেইটে দিই, তুমি রান্না বসাও, তারপর বাসনে হাত দেবো'খন।"

আশির দশকের মাঝামাঝি কলকাতার একপ্রান্তে মধ্যবিত্ত আবাসনে দুকামরার ছোট ফ্ল্যাট। রোজ সকালে ঘড়ি ধরে সোয়া ছ'টায় কাজে আসে কল্পনা। সেই শহীদ কলোনী বস্তি থেকে হাঁটতে হাঁটতে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা – যদি না শরীর খারাপ থাকে বা বৌদিদিমণির কাছে আগেভাগে ছুটি নেওয়া থাকে। বৌদি মাঝেমাঝেই ওকে 'কমলা' বলে ডেকে ফেলেন। আসলে আগে এ-বাড়ীতে কমলার মা কাজ করত তো, তাই।

"ও বাবা, এই অ্যাত্ত শিম? দাঁড়াও, কাটাপোনার আঁশটা আগে ছাইড়ে দিই, তুমি মাছটা ভেইজ্যে নাও। তারপর শিমে হাত দিতিছি। আজ কী করবে গো বৌদি? শিমবেগুন না শিম দিয়ে নিরিমিষ্যি ঝোল?"

"শিমবেগুন। তোর অত খবরে দরকার কী? কাটতে বসেছিস, কাট। আর হ্যাঁ, নলিবেগুনগুলো ডুমোডুমো করে কাটবি আজ, লম্বালম্বি নয়।"

"না গো বৌদি, শিমবেগুন কত্তিছ, করো, কিন্তু এই কচি কচি শিম দিয়ে শিম-সর্ষে যা হয় না... এক্কেরে ফাস্টোকেলাস। পোস্তবাটা দিয়ে শিম বড়ির ঝালও খুব জমে, কিন্তুক শিম-সর্ষের মতো না।"

"আঃ, এখন সকালবেলা তাড়াহুড়োর সময় ঐসব রান্নার ফিরিস্তি দিস না তো! কাট, কাট, হাত চালিয়ে কাট।"

"কাটতিছি তো। না গো, শিম-সর্ষে মোট্টে শক্ত নয়, শিমগুলো গোটাগোটাই থাকবে, শুধু চিরে বিচিগুলো বার করি নিতি হবে। সর্ষেটা ভাললো করে বাটতি হবে কিন্তু, বড়ির ঝালের পোস্তর মতো অত্ত মিহি করে নয়, কিন্তুক বেশ পিষে পিষে। আর এসব রান্নায় তোমাদের ওই রেপছি তেল, শাপলা তেল একদম দিওনি গো বৌদি, শুদ্ধ সর্ষের তেল –"

"ধ্যাৎ, শাপলা তেল আবার কী? স্যাফোলা, স্যাফোলা। নাঃ, তুই যা গল্প জুড়েছিস, দিলি আজ দাদাবাবুর অফিসের দেরী করিয়ে।"

"না না, কত্তিছি কত্তিছি। শিমে তো অত বেগুন লাগবেনি গো, চারখান সরিয়ে রেইক্যে দিই? বেগুনপোস্ত করবে।"

"উঁউঃ, বেগুনপোস্ত করবে না ইয়ে করবে। ছ'টায় উনুন ধরিয়ে সাড়ে আটটার মধ্যে অফিসের ভাত রেডি করতে হয়, আবার বেগুনপোস্ত? বকিস না তো উল্টোপাল্টা!"

"ওই দেকো, তোমায় একা হাতে কত্তে বলতিছি নাকি? আমি বেগুন কেইটে দেব, পোস্ত বেইটে দেব। আচ্চা, দাদাবাবুকে বলতে পারোনি রোজ রোজ নলিবেগুন না এনে বড় বড় ঠাসবেগুন আনতে? এই শীতের দিনে বেগুনপোড়া দিয়ে গরম গরম রুটি, সঙ্গে কুচো পিঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা – আঃ..."

"এই তুই ওঠ তো ওখান থেকে! যা রান্নাঘরে বাসন মাজগে যা। বাকি তরকারী আমি কেটে নিচ্ছি।"

"যাচ্ছি গো যাচ্ছি। এই আলুর খোসাগুলো ছাইড়ে দিয়ে যাই। তোমার হাত কেইটেছিল না কাল? এই গোল গোল নতুন আলুর কাশ্মীরী আলুদ্দম নুচি দিয়ে একদিন খাওয়াতে পারো তো দাদাবাবুকে, ছোড়দাবাবুকে – ছুটির দিন দেকে। আমি বেলে দেব'খন। পাতে একটু খেজুরগুড় কি নলেন গুড় –"

বৌদি জোরে বকুনি দেওয়ার আগেই তাঁর এগারো-ক্লাসে-পড়া ছেলে নিজের বেডরুম-কাম-স্টাডিরুম থেকে জামা পরতে পরতে বোঁ করে বেরিয়ে এসে বলল, "চা-টা একটু ঘরে দিয়ে আসতে পার না কেউ? প্রতি মঙ্গলবার ট্যুইশনে লেট্ করে যাওয়া আর স্যারের বকুনি খাওয়া – ভাল্লাগে, বলো? ওয়ান আদার থিং – ফর হেভেন্স সেক্ রোজ সক্কালবেলা থেকে তোমাদের এই চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় রান্নার গল্প বন্ধ করবে? আই সিম্পলি কান্ট টলারেট ইট।"

"সেকি গো ছোড়দাবাবু, রান্নার গল্প ভাল লাগেনিকো তোমার? দুমুঠো খাওয়ার জন্যিই তো সব গো। দাঁড়াও, একদিন আমি তোমায় মশুর মামলেট করে খাওয়াব –"

"হোয়াট?"

"মশুর মামলেট গো, ওই যে পুরু করে ডিমের মামলেট করে তার ভাঁজে ভাঁজে মশুর কেইটে কেইটে দিতে হয় – ব্যাঙের ছাতা গো ব্যাঙের ছাতা। তারপরেতে সেই মামলেটের গায়ে এট্টু মাখন মাখিয়ে..."

"হোপলেস" বলে চা-ব্রেকফাস্ট হাতে নিয়ে বোঁ করে আবার

নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে | খেয়েদেয়ে জামাজুতো পরে প্রায় ছুটেই বাস ধরতে বেরিয়ে গেল | দেখতে পেল না যে, বাসন-মাজা ঘর-মোছা কাপড় -শেষ করে বিদায় নেওয়ার আগে তার প্রতিদিনের বরাদ্দ বাসিরুটি আর গুড়ের সঙ্গে একটা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগও পেয়েছিল আজ কল্পনা তার বৌদির কাছ থেকে | তাতে ছিল কালকের বাসি গন্ধঅলা ডালমাখানো ভাত আর টকটক আলুচচ্চড়ি | বয়স কম, তাই এটাও জানা বাকী ছেলেটার যে, এই পৃথিবীর সব কল্পনারই ওই শিমবেগুন-শিমসর্ষে-বড়ির ঝাল-বেগুনপোস্ত-বেগুনপোড়া-আলুদ্দম-লুচি-নলেনগুড় আর মশুর মামলেট আসলে থাকে তাদের প্রাত্যহিক বাসিরুটির ঠোঙায় আর বাসিভাতের ক্যারিব্যাগে | আর থাকে তাদের কল্পনায় | শুধুই কল্পনায় |

****

(২) কান

"আজকের এই স্মরণসভায় আমরা উপস্থিত হয়েছি এমন একজনের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে যিনি শুধু এই স্কুলে চল্লিশ বছর শিক্ষকতাই করেননি, অবসরের আগে কিছু বছরের জন্য প্রধান শিক্ষকের পদও অলংকৃত করেছেন |"

ব্যস্ত বাসরাস্তা আর ট্রামলাইনের ধারে একটা বিরাট হাসপাতাল কমপাউন্ডের ঠিক উল্টোদিকে সুদৃশ্য লোহার গেট পেরিয়ে চারতলা স্কুল বিল্ডিংটি | 'L' আকৃতির বিল্ডিংটির দুই বাহুর সংযোগস্থলে ছোট সিমেন্টের চাতাল, সেখান থেকে কয়েকধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে প্রশস্ত খেলার মাঠে | গত ফেব্রুয়ারীর স্পোর্টসের লাইনমার্কিং অর্থাৎ চুনের দাগ এখনো জায়গায় জায়গায় দৃশ্যমান | সেই মাঠে কয়েক সারি চেয়ার পেতে আর তাদের মধ্যেকার সরু প্যাসেজমতো জমিটায় ডেকরেটরের লাল কার্পেট বিছিয়ে আয়োজন করা হয়েছে স্মরণসভার | সিমেন্টের চাতালে একটা টেবিলকে ঘিরে কতকগুলো গদিমোড়া চেয়ার, টেবিলের দুপাশে দুটো বড় ফুলদানিতে রজনীগন্ধার লম্বা লম্বা স্টিকস্, আর একপাশে একটা তেপায়া ইজেল স্ট্যান্ডে মোটা গোড়ের মালা জড়ানো একজনের ছবি | শীর্ণ, শুভ্রকেশ, ঈষৎ লোলচর্ম |

"এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছর পরে সহকারী শিক্ষকের অস্থায়ী পদে প্রথম এখানে পদার্পণ করেন তিনি | পার্মানেন্ট হন তার তিন বছর বাদে | সেই তখন থেকে অবসরের আগে অবধি যে অসংখ্য ব্যাচকে উনি ওঁর জ্ঞানের আলোয় সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের অনেকেই আজ এ-রাজ্যের বা দেশের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত | কেউ কেউ স্বনামধন্যও বটে |"

টেবিলের ওপর দুটো বেঁটে বেঁটে মাইকস্ট্যান্ড, তার একটা থেকে মাইক খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছেন স্কুলের এখনকার সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রশান্তবাবু | বাংলা পড়ান, কথাও বলেন বেশ সুন্দর, কিন্তু বাঙালির সেই রোগটা ওঁরও আছে – মাইক হাতে পেলে সহজে ছাড়তে চান না | সুতরাং পরবর্তী বক্তা, স্কুলের সদ্য-প্রাক্তন হেড্-মাস্টারমশাই বীরেনবাবু, কখন সুযোগ পাবেন বলা শক্ত |

"তাঁর সেই কৃতী প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে আজকের সভায় উপস্থিত আছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রী নীলোৎপল সেন, যিনি 'পরিচয় গুপ্ত' ছদ্মনামে লিখে থাকেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের বর্তমান অধিকর্তা শ্রী ইন্দ্রনীল চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর শুভ্রকান্তি দে –"

নিজের নামটা শুনতে পেয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে হাত তুলে নমস্কার জানালাম | হ্যাঁ, আমি আজ একজন বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত এই সভায় | চাতালের টেবিলের একধারে একটা চেয়ার দখল করে বসে আছি অন্য অতিথিদের সঙ্গে | ইতিউতি তাকাচ্ছি, মনে মনে নিজের বক্তৃতাটা ঝালাচ্ছি, আর মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরাদৃষ্টিতে হাতঘড়িটা দেখছি | এই অনুষ্ঠান মিটলেই সোজা ইউনিভার্সিটি যেতে হবে আমায়, আজ দুপুরে টানা দু'ঘন্টা লেকচার আর তারপর ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে জরুরী মিটিং |

"ছাত্ররা, তোমরা যেহেতু মণীন্দ্রবাবুকে, মানে প্রয়াত শ্রী মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যকে শিক্ষক হিসেবে পাওনি, তোমাদের জ্ঞাতার্থে বলি উনি চল্লিশ বছর ধরে এই স্কুলে সংস্কৃত, বাংলা ব্যাকরণ আর ন্যায়শাস্ত্র অর্থাৎ লজিক পড়িয়ে গত দু'হাজার এক সালে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করেন | দীর্ঘ বারো বছর তিনিই ছিলেন এখানকার একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষক – যতদিন না শ্রী অশোককানন চক্রবর্তী মহাশয়, যিনি আজ মঞ্চে উপস্থিত আছেন, একজন তরুণ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন নতুন হায়ার সেকেন্ডারী পাঠ্যক্রম চালু হওয়ার সময় |"

মণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য – সংস্কৃত – বাংলা ব্যাকরণ | কথাগুলো কানে যেতেই মনের টাইম মেশিন তার লঞ্চপ্যাড থেকে সাঁ করে রওনা দিয়েছে অতীতে – তিন দশক আগে, এই বিল্ডিংয়েরই দোতলার এক ক্লাসরুমে | জুলাই মাসের গরম, চারটে

সিলিংফ্যান অতিকষ্টে ঘুরছে | একঘর ছেলের সামনে টিচারের চেয়ারে বসে আছেন এক লম্বা, ঋজু চেহারার ভদ্রলোক | মাথায় ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল, নাকের নীচে সরু কালো গোঁফ | কিছু ছেলে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে | কিছু তাদের ডেস্কের পাশে মেঝেতে নীলডাউন | বাকীরা বসে – মুখ দেখলেই বোঝা যায় বুক দুরুদুরু তাদের | ক্লাস সেভেনের সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী বইটা অনেকের টেবিলের ওপর রাখা, কিন্তু বন্ধ | স্যার পড়া ধরছেন; না পারলে তিন ক্যাটেগরির শাস্তি | একদমই কিছু বলতে না পারলে নীলডাউন, অর্ধেক বলতে পারলে বেঞ্চের ওপর আর ছোটখাট ভুল থাকলে স্রেফ স্যারের টেবিলে গিয়ে কানমলা খেয়ে আবার নিজের সীটেই ফিরে আসা | প্রথম রাউন্ডে আমি পার পেয়ে গেছি, 'লতা' শব্দের সম্প্রদানকারক আর অপাদানকারকের শব্দরূপ জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওটা আমার খারাপ মুখস্থ নেই | কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডে যে প্রশ্নটা ক্রমশঃ আমার ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসছে আমার সহপাঠীদের একে একে কুপোকাত করে, সেটা মারাত্মক | কিছুতেই মনে করতে পারছি না | অজহৎলিঙ্গ বিশেষণ? সে আবার কী? কথাটা ব্রেনের সার্চ এঞ্জিনে বারবার দিচ্ছি, আর বারবার একটাই তথ্য উঠে আসছে যার সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনো সম্পর্ক নেই | সেই সময় ভারতীয় ক্রিকেট দলের হোম সিরিজে তাদের নবীন তারকা ব্যাটসম্যান আজহারউদ্দিন আবির্ভাবেই পর পর তিনটে টেস্টে সেঞ্চুরি করে রাতারাতি দেশের নায়ক বনে গেছেন | কাগজে লেখা হচ্ছে, রেডিওয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন আজহার ভারতের টেস্ট টিমে থাকলে ভারত কখনো হারবে না | অজহৎ শুনে আজহার মনে এলে ব্রেনকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় কি? কিন্তু এদিকে বিপদ যে ঘনিয়ে এল বলে, আর দুটো ছেলে পরেই যে আমার পালা! ওদুটোর ওপর ভরসা নেই, জীবনে পড়াশোনা করে না | যা ভেবেছি ঠিক তাই – আমার পাশের ছেলেটাকে "নীলডাউন" গর্জনে মাটিতে বসিয়ে দিয়েই স্যারের দৃষ্টি আমার ওপর | আমি ক্লাসে ভাল ছেলে বলে পরিচিত, শাস্তি-ফাস্তি পাওয়ার তেমন অভ্যেস নেই, আজ এই পরিস্থিতিতে পড়ে দুহাতের চেটো বরফ | কোনোরকমে দাঁড়িয়ে উঠে চুপ করে আছি, স্যারের "কী হল কী?" গর্জনে মাথার মধ্যে যেটা ঘুরছিল সেটাই মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল – "ক-কখনো হারবে না, স্যার"|

"মানে? 'হারবে না' আবার কী? 'হারাবে না' বল |"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, হারাবে না, হারাবে না –"

"কী হারাবে না? উত্তরটা শেষ কর! অ-জহৎ-লিঙ্গ..."

"লি-লি-লিঙ্গ স্যার"

এটা স্রেফ আন্দাজে মেরেছি | 'লিঙ্গ' কথাটার মানে তো আর 'হারাবে না' নয় | তাহলে বোধহয় "কী হারাবে না?"-র উত্তরই হ'ল 'লিঙ্গ'|

"এইত্তো, এটা বলতে তোর এতক্ষণ লাগল কেন? এবার উদাহরণ দে |"

"হ্যাঁ স্যার?"

"আরে যা বললি, তার উদাহরণ দিবি তো!"

এইরে, এইভাবে তীরে এসে তরী ডুববে? এবার তো আমাকে আজহারউদ্দিন কেন, গোটা ভারতীয় দলের এগারো জন ক্রিকেটারও বাঁচাতে পারবে না | পারলও না | কয়েক মিনিট নীরবতার পর আবার গর্জন, "তুই না ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হোস? এই সামান্য জিনিসটা বলতে পারলি না? আয় এদিকে আয় |"

পালাবার তো পথ নেই | গেলাম | এঁর কানমলা আবার অন্য স্যারদের কানমলার মতো নয় | একটা কান ক্লকওয়াইজ প্যাঁচ দেন, অন্যটা অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ | প্রায় একশো আশি ডিগ্রি | ব্যথা থাকে অনেকক্ষণ|

এই স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে সেই টেবিলে বিশিষ্ট অতিথির আসনে বসেই আমার হাতদুটো নিজের অজান্তে কখন যেন দু'কান ছুঁয়েছিল | সম্বিৎ ফিরল ঘোষকের ঘোষণায় – এবার আমার বক্তৃতার পালা | কখন যে প্রশান্তবাবু আর বীরেনবাবুর বলা শেষ হয়ে গেছে, খেয়ালই করিনি | যাইহোক, আমার বক্তৃতা ভালই হ'ল | সবকিছু মিটে-টিটে যাওয়ার পর সভাপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ কানে এল গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন নীচু ক্লাসের ছাত্রের কথোপকথন – "আচ্ছা, ওই নীল শার্ট পরা চশমা-চোখে স্যারটা মণীন্দ্রবাবুর নাম শুনে কানে হাত দিচ্ছিল কেন বল তো?"

"আরে, জানিস না? গুরুদের নাম শুনলে ওরকম করতে হয় | আমার ছোড়দি পন্ডিত অনির্বাণ ভট্টাচার্যর কাছে গান শেখে | উনি সবসময় গাইবার আগে ওঁর গুরু পন্ডিত অজয় চক্রবর্তীর নাম নিলেই কানে হাত দেন |"

নিয়তি

জয়া চৌধুরী

আমার আব্বা যখন দ্বিতীয় বিয়ে করেন, তখন আমার এগারো বছর বয়স | নয় বছর বয়সে মা মারা গেলেন টাইফয়েডে | দুই ফুপু পালা করে আমার দেখাশোনার দায়িত্ব নিলেন | তাঁদের নিজেদের সংসার সামলে দিন দিন সেটা কঠিন হতে লাগল | বাধ্য হয়ে আব্বা আবার বিয়ে করলেন | বিয়ের দিন দুপুরে, দুই ফুপু আমায় নিয়ে গেলেন নতুন মায়ের ঘরে | নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি, এত রূপবতী মানুষ হয়!

নতুন মা আমায় ডেকে কাছে বসালেন, বললেন, 'আপনার কি আমারে পছন্দ হয়েছে?'

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ |'

তারপর বললেন, 'তাহলে কি আপনি আমারে মা বলে ডাকবেন?'

আমি আবারও বললাম, 'হ্যাঁ |'

মা আমার কপালে চুমু খেয়ে, জড়িয়ে ধরলেন আমাকে | আজও আমার নতুন মা আমায় জড়িয়ে থাকেন একইভাবে | আমার আরও দুই ভাই জন্মাল | মা নিজের ছেলেদের পরম যত্নে, মমতায় বড় করে তুললেন কিন্তু জড়িয়ে থাকলেন শুধু আমাকে | আমি বড় হলাম | বিয়ে হ'ল | চাকরি হ'ল | কিন্তু দূর থেকেও ছায়ার মতো সঙ্গী হয়ে থাকলেন আমার নতুন মা | আমার সমস্ত না বলা কথা কিংবা কষ্ট – কী করে যে তিনি বুঝতে পারেন সে আমি নিজেও জানি না |

একবার নতুন মায়ের খুব শরীর খারাপ হ'ল | খবর দেওয়া হ'ল আমাকে, জানামাত্রই আমি হাসপাতালে গেলাম | আমার দুই ভাইও দূর দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছে | মা সবাইকে বাইরে বসতে বললেন | বললেন, 'আমি বকুলের সাথে একা কথা বলতে চাই |'

মা আমার হাত ধরে বললেন, 'আচ্ছা আম্মা, আপনার কখনো মনে হয় নাই যে আমি সৎ মা হয়েও আপনারে কী করে এত ভালবাসি?'

আমি এবারও মাথা নাড়িয়ে বললাম, 'মনে হয়েছে |'

মা বলতে শুরু করলেন, 'আপনার আব্বার সাথে বিয়ের আগে, আমি একজনকে ভালবেসেছিলাম | তার সাথেই আমার বিয়া হবার কথা | একদিন সকালে শুনলাম, সে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে | আমি তখন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা | পাগলের মতো অবস্থা আমার | বাড়ির মানুষ জানতে পেরে আমায় জোর করল বাচ্চাটাকে মেরে ফেলতে, আমি রাজী হই নাই | তাই আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, আমার মামার বাড়িতে | সেখানে হাসপাতাল তো দূরের কথা, একজন ডাক্তারও নাই | দুর্বল শরীর, অযত্ন অবহেলায় আট মাসেই হঠাৎ ব্লিডিং শুরু হইল, গ্রামের দাইকে খবর দেওয়া হইল | দাই অনেকবার হাসপাতাল নিয়া যাইতে কইল, কিন্তু আমার পরিবারের অনুমতি ছাড়া কেউ আমারে হাসপাতালে নিয়া গেল না | যমে আর মানুষে টানাটানি কইরা ফুলের মতো ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম, কিন্তু সে মৃত | প্রাণ নাই দেহে | কী যে সুন্দর সে কন্যা! আপনারে বুঝাতে পারব না | কিন্তু তার কপালের বাম পাশে একটা গোল মতন লাল দাগ | আম্মা আপনার, কপালের বাম পাশেও সে রকমই একটা লাল দাগ | আপনি নিশ্চয়ই জানেন | আপনার আব্বা আমার সব কথা জানতেন | সাতাইশ বছর উনার সাথে সংসার করেও কোনদিন উনার কথার অবাধ্য হই নাই | বলেছিলেন, 'তুমি তারে ভালবেসেছিলা, অন্যায় তো কিছু করো নাই | বাকিটা তোমার নিয়তি |' সেই জন্যই আমার ভাইয়েরা আপনার আব্বার সাথে আমার বিবাহ দিয়েছিলেন |'

আমার নতুন মা একটু দম নিয়ে বললেন, 'আম্মা আপনি একটু চা খেয়ে আসেন বাইরে থেকে | আমি একটু বিশ্রাম নিব |'

আমি হাসপাতালের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম | চোখদুটো ভেজা ভেজা | কিন্তু কোথাও যেন একটু গর্ব | এমন দুজন মানুষের সন্তান বলে অহংকার | আর আমার জন্মদাত্রী সে নিশ্চয়ই কোথাও বসে মুচকি হেসে বলছেন, 'কেমন খেলা দেখালাম রে মা!'

দীনেশের দুঃখ কষ্ট

দেবাশিস মজুমদার

১

সে কিছু চায় –
তাই হাত বাড়ায়|
তার সামনে আকাশ, জল, পাথর
পেছনে মাঠ| এই বিকেলবেলায়
তাকে সবাই বানায় দুঃখী, কাতর|
সে কেন হারে সকল খেলায়?

২

দীনেশকে এবার চলে যেতে হবে| দীনেশ আস্তে আস্তে দূরত্ব বাড়াতে লাগল পেছনের মাঠ আর স্কুলবাড়ির সঙ্গে| না দীনেশকে কেউ ফিরে ডাকবে না|
মাথার ওপরে সন্ধ্যের বিরাট আকাশ – নিচে গাছপালার মাঝখান দিয়ে দীনেশ দৌড়োচ্ছে|
দীনেশের সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই দীনেশকে চলে যেতে হচ্ছে|
"এই তোরা কেউ আয়|" "তুই আমাকে ছোঁ দেখি!" "রীনা, আচার খাবি?" "ঐ দেখ, চাঁদ উঠেছে|"
না, দীনেশকে কেউ ডাকবে না|
মৃদু হাওয়ার মতো দীনেশকে এখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যেতে হবে|

৩

স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে / দিবারাত্রি প্রেম ভিক্ষে / করে করে হন্যে হয়ে ফিরি
চতুর্দিকে কষ্ট বিষাদ / অসোয়াস্তি, দুঃখের স্বাদ / ছড়িয়ে রাখে তোমার মুখচ্ছিরি|"

দীনেশ নীনার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে ভাবল –
কী সুন্দর! কী সুন্দর! দীনেশের ইচ্ছে হতো খুব সুন্দর জলের ধারে কোথাও নীনার সঙ্গে অনেকদিন বেঁচে থাকে| কিন্তু নীনার সেরকম ইচ্ছে হতো না| তাই দুঃখী দীনেশ দূরে এক পাহাড়ের কাছে গেল মন ভাল করতে| কাঁকরের ওপর অলসভাবে হাঁটল পরিচিত, অপরিচিত কিছু মানুষের সঙ্গে|
তিরতিরে ঝর্ণার ধারে রোদ্দুর মেখে শুয়ে রইল| তবু এ বিষাদ কাঁটার মুকুট হয়ে দীনেশের সঙ্গে রয়ে গেল|
ফিরে এসে দীনেশ আমাকে বলল, "এ আমার এক দুঃখ রোগ বিষ্ণুদা| এই আমার নিয়তি|"

৪

দীনেশের কী কষ্ট? কেন কষ্ট? আঃ, তা যদি দীনেশ জানত! তোমরা ওর কাছে থাকো সবসময়|
ওকে বলো "যেও না|" ওর এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে দাও| তোমরা দীনেশকে মরে যেতে দিও না|

৫

ওর সঙ্গী শুধুই হাওয়া, পাথরের গায়ে জলের ঢেউ,
আকাশে মেঘের আঁকিবুকি – এই শুধু তার পাওয়া|
তার আর নেই কেউ|
তাকে কেউ নাও – সে খুব দুখী|
সে খুবই দুখী|

অকালবোধন

অর্চিষ্মান বাগচী

কবি,
তোমার শুদ্ধতম শব্দগুলি দাও,
দাও তোমার তূণীর থেকে।
অপ্রেমের দীর্ঘ এসময়,
মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মায়েদের
অসহায় দীর্ঘশ্বাস,
অমানবিক মানুষী আচার,
এইসব দৈত্য সংহারের
শুভলগ্ন যে আসন্ন!

(দেশজুড়ে একের পর এক তীব্র অত্যাচার
মেয়েদের প্রতি। আমরা কি মানুষ?)

•••৯০◆৩৫•••

মহামানবের গান

শেলী শাহাবুদ্দিন

করোনা যুদ্ধে ক্লান্ত-করুণ ধরা,
ছুঁড়ে ফেলে দাও অতীতেরে ভুলে ভরা।

যুদ্ধ-ক্লান্ত চলিছ পথিক একা,
সূর্যোদয়ের এখনও পাওনি দেখা।
অজস্র পথ আরো দিতে হবে পাড়ি,
সঙ্গীরা কবে এই পথ গেছে ছাড়ি।
সহযোদ্ধারা অজস্র আজ মৃত,
তবুও তোমার প্রতিজ্ঞা সংহত।

হয়তো তোমারও প্রাণ হয়ে যাবে ক্ষয়,
মানবের তরে তবু রেখে যাবে, মহামানবের জয়।

•••৯০◆৩৫•••

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

তুমি আমার গানের গুরুর
আসনটিতে আছ বসে।
দিনের শুরু তোমার সুরে,
দ্বিপ্রহরেও তোমার গানে
থাকে আমার হৃদয় ভরে,
তোমার বাণীর মুখর তানে
রোজই আমার সন্ধ্যা আসে।
যখন আমার মনের ভিতর
অশান্ত ভাব আকুল করে,
যখন আমার চেতনাময়
শ্রান্ত থাকে দুঃখ ভারে,
যখন আমার অন্তর প্রাণ
বঞ্চিত হয় সুধারসে –
তখন দেখি তুমি আমার
সেই আসনে আছ বসে।
যখন আমার হৃদয় নাচে
সুখের মাঝে প্রেমের দ্বারে,
যখন আমার মুক্ত চিত্তে
আনন্দগান বীণার তারে,
যখন এ মন খুশির নেশায়
রইতে না চায় নিজের বশে –
তখন দেখি তুমি আমার
সেই আসনে আছ বসে।
যখন এ মন ঘুরে বেড়ায়
ভেদাভেদহীন বিশ্বজুড়ে,
যখন এ মন এক হয়ে যায়
বিশ্ববাসীর মনের তীরে,
যখন এ মন নীরব থাকে
নিন্দা বা কোন সরব যশে –
তখন দেখি তুমি আমার
সেই আসনে আছ বসে।

•••৯০◆৩৫•••

অনুবাদ কবিতা

মূল রচনা:

শিন ইয়ু পাই (Shin Yu Pai): (সিয়াটল, ওয়াশিংটন)

অনুবাদ: উদ্দালক ভরদ্বাজ

কবি পরিচিতি:

কবি, প্রবন্ধকার, ফটোগ্রাফার, বই-অলঙ্করণ শিল্পী এবং চিত্রশালা তত্ত্বাবধায়ক শিন ইয়ু পাই শিকাগোর School of the Art Institute থেকে MFA এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে museology তে MA অর্জন করেন | Aux Arcs (২০১৩), Adamantine (২০১০), Works on Paper (২০০৮) এবং Sightings: Selected Works (২০০০–২০০৫) সহ, দশটি কবিতার বই ছাপা হয়েছে তাঁর | নিয়মিতভাবে লেখেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, তাইওয়ান, ইংল্যান্ড এবং ক্যানাডা থেকে প্রকাশিত একাধিক পত্রিকা, যেমন ট্রাইসাইকেল, ইয়েস, দা স্ট্রেঞ্জার, ইত্যাদিতে | বিভিন্ন কবিতা উৎসব, যেমন জেরাল্ডিন কবিতা উৎসব, মন্ট্রিয়ল জেন কবিতা উৎসবে নিয়মিত কবিতা পাঠ করার ডাক আসে তাঁর|

Macondo Writers' Workshop এবং Motherload Collective-এর সদস্য, পাই, Lawrence & Crane Publications প্রকাশনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক | দুবার Dallas Museum of Art তাঁর কবিতা আহ্বান করেছেন | সিয়াটল মিউজিয়ামের অধিবাসী কবি হিসেবে ছিলেন বেশ কিছুকাল | সাহিত্য-সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রযোজনার কাজ করেছেন Crow Collection of Asian Art, the Women's Museum of Dallas, এবং the Rubin Museum of Art-এর জন্যে | ২০১৪ তে Stranger Genius পুরস্কারের জন্যে চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত হন | রেডমণ্ড শহরের চতুর্থ পোয়েট লরিয়েটও সাব্যস্ত হন|

তাঁর কলাকৃতি, ম্যাকিনে এভিনিউ কনটেম্পোরারি, দা প্যাটারসন মিউজিয়াম, দ্য আমেরিকান জাজ মিউজিয়াম এবং শিকাগোর কলাম্বিয়া কলেজের দ্য সেন্টার ফর বুক অ্যান্ড পেপার আর্টসসহ নানা গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছে|

বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেন তিনি | তাঁর ভাষায় নানাভাবে দেখেন তিনি এই পৃথিবীকে, কখনো ক্যামেরার চোখ দিয়ে কখনো শব্দের চোখ দিয়ে, একে অপরের সম্পূরক হয়ে ওঠে দুই পথ | মিলিত প্রয়াসে তিনি সৃষ্টি রহস্যের আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারেন বলেই মনে করেন কবি|

অনূদিত কবিতাগুলি –

Sheep Piece (মূল কবিতা)

Borrow a herd of sheep,
One hundred in number or more
Spray paint their fleece
With your favorite words.
Watch from a distance as the sheep
Arrange themselves into poems.

ভেড়া কাব্য (অনুবাদ)

এক পাল ভেড়া ধার করো,
এই গোটা শয়েক|
স্প্রে-পেইন্ট করে তাদের গায়ে
লিখে দাও তোমার পছন্দের শব্দগুলো|
তারপর, দূরে গিয়ে দেখো,
পাহাড়ের ঢালে ঘুরে ঘুরে,
ওরা কেমন কবিতা বানায়|

অনূদিত কবিতাটি প্রসঙ্গে –

যে কোন ভাল কবিতার ব্যাখ্যার দুচারটি বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকে | Subject to interpretation, পালটে যায় কবিতার অর্থ| কিন্তু সেই হেঁয়ালি, অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে কবি সৃষ্টি করেন কথার বা শব্দের চয়নে | Sheep Piece কবিতায় এই সম্ভাবনা এসেছে একটি নিখুঁত চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে| তফাৎ এই, যে এই চিত্রকল্প সত্যিই সৃষ্ট হয়েছে; না, কোন দ্ব্যর্থ শব্দের প্রয়োগে নয়, বরং মনের গোচরে দৃশ্যমান একটি অনুমেয় ঘটিতব্যের (probable scenario) সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, শব্দ কিন্তু সোজাসাপ্টা|

Wash, Cut and Dry (মূল কবিতা)

Christina and Alec had a ritual of going to the barbershop together. In part this was for Alec's vanity that his lover should ever cut her long flowing hair more than a requisite few inches to remove the dead ends. On the day in which she'd made the appointment, the network crashed at his office, and Alec worked late into the night to repair the system.

Christina went alone to see Mario in his shop - the old man with his brown eyes and liverspotted hands, massaged her scalp with lemon-scented soap. She rested in his chair thinking if he asked her if she wanted to try to something new, she would answer, “yes”.

চুল ধোয়া (অনুবাদ)

একসঙ্গে চুল কাটতে যাওয়াটা ক্রিস্টিনা আর অ্যালেকের একটা অভ্যেসের মতো দাঁড়িয়ে গেছিল | প্রধানত অ্যালেকেরই জেদের কারণে | প্রেমিকার ঘন কালো চুল যেন প্রয়োজনের বেশী না কাটা হয়; তার আয়ত্ত সুষমার প্রতি তার কড়া নজর | অথচ ক্রিস্টিনার নেওয়া সেদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিনটাতে অ্যালেকের অফিসের নেটওয়ার্ক ফেল | ফলে গভীর রাত পর্যন্ত সেসব সারাতে অ্যালেক অফিসে আটকে | ক্রিস্টিনা একাই গেল সেদিন মারিওর দোকানে | বাদামি গভীর চোখ, বৃদ্ধ মানুষটি, তার মেচেতার দাগওয়ালা হাতে ক্রিস্টিনার মাথা ম্যাসাজ করতে শুরু করল | লেবুফুলের ভুরভুরে গন্ধমাখা শ্যাম্পু, একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতায় চেয়ারে এলিয়ে থাকতে থাকতে ক্রিস্টিনা ভাবছিল, “আজ যদি মারিও জিজ্ঞেস করে যে সে নতুন কিছু ট্রাই করতে চায় কিনা, ক্রিস্টিনা বলবে, “হ্যাঁ”|

অনূদিত কবিতাটি প্রসঙ্গে –

একটি পাঁচ লাইনের গদ্য কবিতায় একটি সম্পর্কের প্রায় সবটুকু প্রকাশ করে দেওয়ার মধ্যে যে মুনশিয়ানা কবি দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে খুবই বিরল | বাস্তব ও পরাবাস্তব মিলেমিশে এক ম্যাজিকাল পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে এই কবিতায় | মাত্র কয়েকটি শব্দের মধ্যে, একঘেয়ে সম্পর্ক, তার লুকনো হিংস্রতা এবং সর্বোপরি সেই সম্পর্কে আটকে-পড়া বন্দিত্বের সাথে একযোগে প্রকাশিত হতে দেখি, মুক্তির অনির্বচনীয় হাতছানিটুকুও |

****

References:

1. Shin Yu Pai official website: https://shinyupai.com/
2. Publications of Shin Yu Pai: https://shinyupai.com/publications/books/
3. Shin Yu Pai Poetry Foundation: https://www.poetryfoundation.org/poets/shin-yu-pai
4. Shin Yu Pai Poets.Org: https://poets.org/poems/shin-yu-pai

•••৯◆৫•••

রোজনামচা

মিশা চক্রবর্তী

হঠাৎ দেখার ব্যস্ত কিছু সময়,
প্রাচীনকালে আঙুল তুলে দাঁড়ায়!

মুঠোর মধ্যে ধরা মুহূর্তেরা –
চুপ দাঁড়িয়ে, চাইছে দিতে ধরা!

নাহয় সময় দূরের পথে ক্লান্ত,
সঠিক দিশায় দিক হারানো, জানত?

‘কেমন আছো’ ‘কেমন আছি’-র দ্বন্দ্বে,
জেতার চেষ্টা রোজের ভালমন্দে |

রাত পোহানোর পরের ফোটা আলো;
সবের ভিতর লুকিয়ে থাকা ভালো,

এইটুকু থাক আমায় তোমায় নিয়ে,
এটাই পাওয়া আর বাকিসব দিয়ে!

ফিরিয়ে দিয়ে জিতিয়ে দেওয়ার মাঝে,
রোজের চাওয়া যত্ন করে সাজে!

•••৯◆৫•••

মুহূর্ত

উদ্দালক ভরদ্বাজ

আসলে একটাই মুহূর্ত
ফিরে আসে বার বার
এখানে, হৃদয় বাগানে |
সেই বাঁচা, অনুপম, বার বার
এখানে, হৃদয় বাগানে |
যত খেলা, যত ঘ্রাণ, জীবনের পরিমল
আনন্দে, কিশলয়ে জাগে,
তাকে বুকে করে বেঁচে থাকে মন
এখানে হেমন্ত বাগানে |

•••৯◆৫•••

এবং আবার

সুমিতা বসু

এবং লোকে রইল অন্তর্লীন ঘরে
এবং পড়ল বই, শুনল কথা নীরবে
এবং নিল বিশ্রাম, করল ব্যায়াম, চলল শিল্পচর্চা
এবং চলল খেলা, শেখা হ'ল কত নতুন নতুন, খুলল কত দরজা
এবং শিখল নতুন করে বাঁচা, নতুন শান্ত স্থির
আরো আরো মন দিয়ে শোনা – নিভৃত ও গম্ভীর
এরই মাঝে কেউ ধ্যানস্থ, কেউ মগ্ন প্রার্থনায়
কেউ চপলমতি, কেউ ব্যস্ত নৃত্যকলায়
কেউ দাঁড়াল মুখোমুখি আপন প্রতিবিম্বের
কেউ আবার খুলে দিল নতুন ভাবনা দিগন্তের|
চার দেওয়ালের মধ্যে ছকা পৃথিবীর গাথা
অসাবধানের উত্তর শুধু কবর আর চিতা

এবং তারপর ···
একদিন মানুষ পরিত্রাণ পেল, সুদিন আসন্ন
তবু... স্বজনবিহনে মন যাদের ছিন্নভিন্ন
সেই নিকটজন, যারা ছিল লাগামছাড়া, বেপরোয়া আর হৃদয়হারা
কোথায় তারা তলিয়ে গেল, আঁধার-ঘেরা গভীর গুহা

তারপর আবার ধীরে ধীরে সেরে উঠতে থাকল ধরিত্রী
কচি সবুজ ঘাসের মলমল গালিচায় উঁকি মারে দিন ও রাত্রি|

যখন বিপদের কালো ভয়ানক ঝড় গেল কেটে
আবার মানুষজন জড়ো হ'ল ঘাটে-বাটে-মাঠে
শোকার্ত, অশ্রুসিক্ত ভারাক্রান্ত তারা
শোকের দুঃসহ ভার নিয়ে যারা স্বজনহারা
তবু নতুন স্বপ্ন, নতুন সম্ভাবনার ডালিতে সাজিয়ে পসরা
নতুন চিত্রকল্পে শুরু হ'ল আবার নতুন জীবনের মহড়া

আর পৃথিবী একটু একটু করে সেরে উঠল পুরোপুরি
আবার ধীরে ধীরে মানুষও প্রাণবন্ত, ভেঙে মহামারী|

কবিতা পড়া

দেবাঙ্গনা ব্যানার্জী

ভাসমান সুখ আর শূন্যতার কবিতা রেখেছ আমার হাতে
বিস্তীর্ণ মাঠ তাই ক্যাকটাসের ছোটো ছোটো
হলুদ ফুলে ভরে যাচ্ছে
দুটো কার্ডিনাল, মাউন্টেন লরেলের বেগুনী ফুলে সুখ খুঁজছে
সোহাগ করতে করতে ওদের ঠোঁট থেকে পড়ে গেছে কাঠকুটো
রঙে রঙে উড়ে বেড়াচ্ছে ওরা, আমাদেরই মতো, নিরাশ্রয়
আমি কাঠিগুলো কুড়িয়ে এনেছি –
সাজিয়ে সাজিয়ে তোমার নাম লিখব ব্র্যাঙ্কো নদীর ধারে
টেক্সাসের তারা জ্বলজ্বলে আকাশ
এসব দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়বে
তখন তুমি কাছে এসে, আমার হাত ধরে কবিতা পড়বে
কাঠিগুলো সব ভেসে যাবে লাল, হলুদ, সবুজ, বেগুনী আর নীলে

নিরাময়

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

এই যে সম্পর্কের গায়ে লিখে রাখছ অস্ত্রের উল্লাস
ক্রমশ তীক্ষ্ণ হচ্ছে সন্দেহজনক হাওয়া
মানচিত্রে দোল খায় হিংসা দ্বেষ অপ্রেমের গান
পূবের জানলা খুলে দূরে আর দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে না চোখ|

এও কি অসুখ নয়? এই তীব্র আবহবিকার
যেন এক বিষাদ রঙের খাম
যার গায়ে লেখা আছে আমাদের নির্বাসিত স্মৃতির উঠোন|

এ অসুখ সেরে উঠলে
আবার নতুন করে গান লিখবে কেউ
কবিতায় বেজে উঠবে নীরবতা
নদীর সিথানে জাগবে ভালবাসামগ্ন কোন ঢেউ...

উত্তরজাতক

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

এই সময় তোমাকে দিলাম, দিলাম অন্ধকার;
যাবতীয় ক্ষোভ!
কেই বা মনে রাখে লেখকের নাম,
স্মৃতিধার্য ততটুকু যতটা তোমায় পাঠালাম।
কবে সমকাল সংকটবিহীন ছিল,
আমরা অপদার্থের মতো ভালবেসেছি অতীত,
যেন আগে সব ঠিক ছিল,
ভরসা রেখেছি আগামীতে যেন সে বরাবর ভাল।
অক্ষর কবিকে দেয় অমোঘ সাহস যত দুর্বিপাকে,
অথচ দেখো ধমনীর শোণিত কলমে নেমে আসে,
অক্ষর সাহস যোগায়;
বাৎসল্যবিহীন নগরীতে কবি একা একা ফেরে –
পথিকের ক্রূর দৃষ্টি তাকে প্রাণিত করে,
নদীর অসামান্য জলে কবি খোঁজে গঙ্গা আগমনী –
সেই তো নতুন ভগীরথ।

একটুর জন্যে

উদ্দালক ভরদ্বাজ

একটুর জন্যে মিলিয়ে যায় সুখ
একটুর জন্যে থিতিয়ে থাকে ধাক্কা-খাওয়া জীবন
একটুর জন্যে ট্রেন মিস্ হয়ে যায়
ছেলেকে আদর করতে গিয়ে
আধোস্বরের কান্না জড়িয়ে ধরে অস্পষ্ট আঁচল
একটুর জন্যে ওর মাথায় চুমু খেতে খেতে মনে হয়
এ টুকুর জন্যে রাজ্যের বিষাদ বুকে ধরা যাবে
একটুর জন্যে ফিরে যায় বীতরাগ প্রেম
একটুর জন্যে ফসকে যায় ভালবাসা
মানুষীর নরম মুঠোর থেকে।

এক পশলা বৃষ্টি চাই...

নমিতা রায়চৌধুরী

ক'দিন ধরেই ভাবছি –
বাঁধনেও হব শেকলবিহীন পরিযায়ী।
স্বস্তির দাওয়ায় বসে পা দুলিয়ে,
ভাবতে ভাবতে ছুঁয়ে দেব...
নাহ্ থাক!
যা গেছে তা বুঝি গেছে চিরতরেই!

রোজকার দিনলিপিতে
কত যে কাটাছেঁড়া, গুন-বিয়োগ,
আজন্ম ভাগাভাগি!
দেখা হ'ল না আর শিমুলতলার হাট,
ঘাসজমির অব্যক্ত প্রেম 'মধুমতি'!
বুকে পকেটে আগলে রাখা
পদ্মাবতীর শেষ চিঠি!
যা আজও –
বানভাসি সুখে ভাসিয়ে দেয়,
তোমার বিনিদ্র রজনী!

আমি হেরে গেছি কবি!
আবারও, সময় নিয়েছে সবটুকুই,
ভাঙা অবয়বে স্বপ্নগুলো এখন,
ক্লান্ত, অবসন্ন –
বুকফাটা নীরব চিৎকারে!

এক পশলা বৃষ্টি চাই, অতনু,
কেবল এক পশলা বৃষ্টি...

কাঙ্গাল

রঙ্গনাথ

নেই বাড়িঘর, অলিগলি, গাছের তলে
বারান্দা বা দেয়ালের পাশে শিশুকাল হতে
দিন-রাত কাটাতে অভ্যস্ত; আমি যাযাবর
এই সভ্য সমাজে | চলাফেরা করি পথে পথে,
শহরে নগরে, গ্রাম বন্দরে | ভিক্ষা মাগি –
পেলে খাই; না পেলে ভাবি, 'রাতটা যাক
দিনে নিশ্চয় পাব' | 'এক দিন এক রাত
অনাহারে থাকা, কী আর এমন; থাক!'
এ আশাতে রাত কাটাই |
আমি একা নই
আমরা অসংখ্য! আচরণ-বৃত্তি-চিন্তা-ধ্যান
আমাদের এক – যেন এক-পরিবারভুক্ত |
ভাঙ্গাবাড়ি, সেতু বা গাছের নীচে বাসস্থান;
ধন-মান কিছু নেই; খাই যখন কিছু পাই |

কাঁচের আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখবার
সুযোগ মেলেনি, কারণ আমার আয়না নেই |
কোনও পুকুর কিংবা নদীর জলে বার বার
চেষ্টা করেছি; প্রতিবার আগত ঢেউয়ের তালে
ক্ষীণ শীর্ণ আবছা আবছা এক বিকট মূর্তিই
শুধু দেখেছি!
নানা উৎসব পার্বণ আসে –
চারিদিকে সাজ সাজ রব, মহা আনন্দ-ফুর্তি
হৈ হুল্লোড় পড়ে গেলে তা জানতে পারি |
দিন রাত যায় আসে সত্য; তবে তার সাথে
উৎসব-পার্বণ! কী যে এক অবাক কান্ড!
বারো মাস আমার জীবনের ছন্দ এক, তাতে
নেই উত্থান পতন | হয়তো বা মিলতে পারে
কিছু কিছু আনন্দের ছিটেফোঁটা, এ বিশ্বাসে
ছুটে যাই | থেমে যেতে হয় | আমি বেমানান!
তাই বুঝি আমায় দেখে উল্লসিত জনগন হাসে
অট্টহাসি; পাশে দেখলে দেয় নাকেতে রুমাল;
সরে যায় | কেহ বা লাঠি হাতে করে তাড়া –
'বিচ্ছিরি! দূর হ, দূর হ; বিরক্ত করিস না'!
তখন মনে হয় – আমার জন্য নয়, শুধু যারা
জীবনের মাঝে রাখে নানা রং, হাসিখুশী –
উৎসব তাদের জন্য |
খুদকুড়ো , উচ্ছিষ্ট খেয়ে
আমার বেঁচে থাকা | বর্ষা, গ্রীষ্ম, ঠান্ডা-শীতে
আমার অবস্থা জন্তুদের মতো | মানুষের চেয়ে
জীর্ণ বস্ত্রটুকু ফেলে দিলেই হতে পারি জন্তু!
তাদের মতো না কেটে চুলদাড়ি, হাতের নখর
মানুষদের বলতে পারি, "তাড়াতে এসো না,
নিয়েছি হিংস্র জন্তুর জাত | আমি ভয়ঙ্কর"!

মানুষের পাশে থাকা না থাকায় লাভ কিছু নেই!
সাদৃশ্য আছে সত্য, অসহ্য তাদের বিদ্রূপ-অপমান;
জন্তুরাও চায় না তাদের চত্বরে যাই, ঘুরঘুর করি;
এ দু'জাতের মাঝে আমি নাজেহাল, চাই পরিত্রাণ!

সাদা কালোর রং তুলি

সফিক আহমেদ

শাওন,
চলো আজ ফিরে যাই
সাদা কালোর রঙিন জগতে,
যেখানে জীবনকে রঙিন করতে
লাগত না কোনো রং তুলি।

কালো মেঘের কালো রং মেখে
একরাশ মনখারাপ নিয়ে এলেও
ঠিক ঠিক বুঝে ফেলতাম
এই মেঘে বর্ষা হবে কি না,
লাগত না আলিপুরের
আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস।

কালো চুলে কখনো দেখেছি
অমাবস্যার অন্ধকার,
এলোকেশীরূপে দেখেছি
মোহিনী আলোর ইঙ্গিতও,
কালো চোখে ডুব দিয়ে
দেখেছি আলোর জগৎ,
আবার চোখ ধাঁধানো আলোয়ও
চিনতে ভুল হয়নি
বিষাদের কালো ছায়া।
কালো আর সাদার মাঝের
ধূসর জগতের পরতে পরতে
ছিল কত কত রং,
সেই রং মেখে গ্রীষ্মের দাবদাহে
এসেছে অকাল বর্ষণ,
শীতের হিমেল হাওয়ায়ও
পেয়েছি কত উষ্ণতা,

শ্রাবণ সন্ধ্যার অঝোর ধারাতেও
ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি
থমকে যাওয়া মুহূর্তকে,
কালবৈশাখীর তান্ডবও
উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি
যুগলে দেখা রঙিন স্বপ্নকে।

কতই না রং ছিল সাদায় কালোয়,
আজও আনমনে খুঁজতে থাকি
সেই সাদাকালোর রঙিন জগৎ।

•••

ভালবেসেই তো

কৃষ্ণা গুহ রায়

ভালবেসেই তো তোমার পাঠানো নদীর ধারে
মেঠো পথে বিছানো সবুজ নকশিকাঁথায়
অনামী রঙিন ফুলের বাহার
আমাকে জানায় প্রভাতী শুভেচ্ছা।
ভালবেসেই তো প্রেমিক জাহাঙ্গীর স্বর্ণমুদ্রায়
নিজের প্রতিকৃতির পাশে খোদিত করেছিলেন
সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকেও।
ভালবেসেই তো যক্ষ মেঘকে দূত করে পাঠিয়েছিল
প্রিয়ার কাছে।
রচিত হয়েছিল শৃঙ্গার রসের কুমারসম্ভব।
ভালবেসেই তো অপমানিতা নিষ্প্রাণ সতীর দেহ শূন্যে তুলে
মহেশ্বরের উন্মত্ত নৃত্যের মুদ্রায় বিভঙ্গের মূর্ত প্রতীক নটরাজ।
ভালবেসেই তো তোমার মধুর সম্বোধনে আমি
আদরণীয়া মহীয়সী।
ভালবেসেই তো তুমি চাও আমার আটপৌরে জীবনে
নিয়মিত অভ্যাসে আমি হই তোমার কবিতা।

•••

শুশ্রূষা

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সাজানো গোছানো অপেক্ষাগৃহ
রঙিন সোফা, রিডার্স ডাইজেস্ট
অচেনা মানুষের নির্বিকার চোখ
তেলরঙে ঝরাপাতার বন, অস্পষ্ট নদীরেখা।

ছোট্ট ঘর। পাঁচ মিনিটে চিকিৎসক এলেন।
শান্ত চোখ। দীপ্তিময় হাসি।
বরফ গলে ঠুনকো আবহাওয়ার দু'চারটে কথায়।
যত্নে ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ দিলেন।
বাঁধন দিলেন সন্তর্পণে।
সুস্থ থাকার নানান কৌশলে স্নেহময় আবদার।

'এই ক্ষত কেমন যেন চেনা। কীভাবে পেলে?'
বললাম 'আমাদের দেশে একটা খেলা আছে, 'ক্রিকেট'।
'আরে জানব না কেন? কত খেলেছি। আমাদের দেশের
ক্যাপ্টেন ছিলেন 'ইমরান খান', চেনো?'
একটা নিস্তব্ধতা দানা বাঁধল না সেভাবে,
'আমি জানতাম... তোমার বাড়ি বাংলাদেশে না?'

শ্রাবণ মাস। পদ্মাপারে সন্ধ্যা নামছে
জাহাজঘাটিতে নিভছে কেরোসিনের কুপি, বিচ্ছিন্ন জনপদ।
মাঝনদীর বুক চঞ্চল। ডিঙায় লণ্ঠনের আলোয়
জ্বলে উঠে মৃত ইলিশের নিথর চোখ।
দূর থেকে ধাক্কা দেয় পাড় ভাঙ্গনের প্রতিধ্বনি...

দেওয়ালে টাঙানো মেটে রঙের মানচিত্র,
তার তৃষ্ণার্ত শিরায় উপশিরায় বইছে
শীতল টলটলে বর্ষার আঁশটে জলোচ্ছ্বাস,
পাড়ে পাড়ে আবহমান ভাঙাগড়ার আশ্চর্য অবয়ব...

আমার উত্তর দিতে ইচ্ছে করল 'হ্যাঁ'।

•••৯◆৫•••

রিক্ত

সুজয় দত্ত

আজ বোধহয় কিছু হারিয়েছে মন, হঠাৎ কিছু হারিয়েছে।
নইলে কেন শূন্য হাতে তোমার দ্বারে দাঁড়িয়েছে?
চায় না সে তো কিছুই কভু,
নিঃস্ব হয়েও বিলোয় তবু
ভালবাসার মাণিক রতন।
আজ কেন সে ফকির এমন?
কেনই বা তার কাঙালপনা সকল সীমা ছাড়িয়েছে?
হৃদয় দিয়ে উজাড় করে
চায় সে হৃদয় নিতে ভরে।
হয়তো তুমিও বোঝনি তা,
জ্বালিয়ে গেছ প্রেমের চিতা –
সেসব ভুলে আজ সে কেন ব্যাকুল দুহাত বাড়িয়েছে?
হিসেব-নিকেশ পাহাড় জমায়
জীবন খাতার পাতায় পাতায়।
উড়িয়ে হিসেব চাওয়া-পাওয়ার
উঠল যে ঝড় দমকা হাওয়ার –
দস্যু হয়ে সেই বুঝি তার যা ছিল সব কাড়িয়েছে।
তাই নিজেকে আজ হারিয়েছে মন, নতুন করে হারিয়েছে।

•••৯◆৫•••

জন্মছক

মানস সরকার

প্রকৃত শব্দের অভাবে আমার যাবতীয় অপ্রকাশিত
লেখাগুলির অসম্পূর্ণ রূপের কাছে শব্দেরা আর
ভিড় করে আসে না| প্রতিনিয়ত বাধ্যতামূলক
মগজ ধোলাই খেতে খেতে প্রিয় শব্দেরা হারিয়ে যাচ্ছে
স্বপ্নের স্মৃতি থেকে ক্রমাগত ধূসরতার দিকে
রূপান্তরিত হতে হতে এক সময় বদলে যাচ্ছে মানে
যতসব বিরক্তি-বোধক শব্দে ভরে যাচ্ছে খাতার পাতা
পাল্টে যাচ্ছে জীবন যাপন| ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে দূরত্ব
আমার থেকে স্বপ্নের, স্বপ্নের থেকে শব্দের, শব্দ থেকে
জীবনের, জীবন থেকে কবিতায়, হয়তো বা এমনিভাবেই
সবকিছু পাল্টে যায়| হয়তো বা এমনিভাবেই পাল্টাতে পাল্টাতে
একদিন নিরাকার রূপে প্রকাশিত হবে যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ|

•••৯০◆৩৪•••

প্রতীক্ষা

সফিক আহমেদ

প্রতীক্ষা তো আমিও করেছি শাওন,
কৈশরের বয়ঃসন্ধির কৌতূহলী স্পর্শ
যখন এনেছিল উন্মাদনা,
প্রতীক্ষা ছিল বীণার ঝংকারে
কখন সুর তুলবে তুমিও
সংযমের পরাকাষ্ঠা করেছিল প্রতীক্ষা,
প্রতীক্ষা করেছিল যৌবনের|

সন্ধ্যার ঝাঁপিয়ে আসা বৃষ্টির পর
রাতের হাস্নুহানার তীব্র, মিষ্টি সুবাস নিয়ে
যখন কণ্ঠলগ্না হয়ে আবেশে মদির হয়েছিলে
হারিয়ে যেতে পারিনি যৌবনে

•••৯০◆৩৪•••

অপ্রত্যাশিত

সুদিত শেখর মুখোপাধ্যায়

প্রতিদিন সকালে ফর্দ করে বাজারে যাই
আর প্রতিদিন কিছু না কিছু ফর্দ থেকে বাদ পড়ে যায়|
কিছুতেই ফর্দ মিলিয়ে সব কিছু আনা যায় না|
ঝারা ঝারা পোস্ত, গোটা গোটা মুগের ডাল,
কিম্বা শুদ্ধ গাওয়া ঘি –
নিদেনপক্ষে খুকুর মাথার ক্লিপ অথবা খোকার রঙিন পেন্সিল|
আসলে বাজারে যাওয়ার ফর্দ আর বাজার করে ফেরার ফর্দ
হুবহু মেলানো যায় না|
তারাপদবাবু বাজার থেকে কালজিরে আনতে ভুলে যেতেন –
সুনীল ভুলে যেতেন আলু, পটল, বেগুন, মূলো –
আর শক্তি তো বাজার করার ব্যাগটাই ভুলে যেতেন|
অথচ
ফর্দে না থাকলেও কিছু জিনিস বাজারের ব্যাগে চলে আসে|
কুঁচো চিংড়ি, কচুর লতি, কিম্বা কচি কচি লাউডগা...
কুঁচো চিংড়ির চপ, ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর লতি –
অথবা পোস্ত দিয়ে লাউডগা –
মন্দ লাগে না|
এ আনন্দ অপ্রত্যাশিত

•••৯০◆৩৪•••

শ্রাবণ-নয়ন

কমলপ্রিয়া রায়

নিভৃত নীল মেঘের মাঝারে কখন যে দিলে সাড়া
আমার চিত্ত তোমার নয়নে হ'ল যে আত্মহারা।
সজল তোমার নয়নদুটি ভাষায় যায় না বলা
ও দুটি নয়নে শ্রাবণ গগনে মেঘেরই শুধু খেলা।
আজ বসে আছি তোমারি নয়নে মিলাব নয়ন বলে
যে নয়ন আমি মিলিয়েছিলেম বহু যুগে বহু কালে।
সেই সে নয়ন জলভরা কোন নিবিড় মেঘের ছায়ে
সে নয়ন আনে মিলন বারতা স্নেহ-সুশীতল বায়ে।
জনমে জনমে বহুবার আমি হয়েছিলেম রাধা
চলিয়াছিলেম তব অভিসারে যুঝিয়া সকল বাধা।
শ্রাবণ তোমার অপরূপ রূপ হেরি আজি পলে পলে
তোমার নীলাভ নয়নের তলে আমার হৃদয় দোলে।
তুমি এসো আজ, পরো নীল সাজ, এসো রাজরথ নিয়ে
মেখে নেব তব বৃষ্টির রেণু নবীন সজল বায়ে।
জুড়াবে আমার সকল হৃদয় হারাবে আমার প্রাণ
তোমারি নয়নে আমার নয়ন করিবে আত্মদান।

নীলাঞ্জন

বৈশাখী চক্রোত্তি

নীলাঞ্জন,
আমার মারমুখী মনটার পিছনে একটা
পলাশের গোধূলিমাখা আলতো ছোঁয়া আছে
যা তুমি খুঁজেও পাওনি।
যেদিন তুমি দরজা থেকে ফিরিয়েছিলে,
আমার শুষ্ক দৃষ্টির পিছনে এক বৃষ্টিভেজা তুফানি রাত ছিল
যা তোমার বোধগম্য হয়নি।

জানতে ইচ্ছে করে কি কেমন আছি আমি?
সেই তুফানি রাতের পর থেকে এক দীর্ঘ অগস্ত্য যাত্রা
ঘটনার ঘনঘটা, কিন্তু কেউ আঁচও পায়নি।
সূর্যোদয় আর সায়াহ্ন মিলেমিশে একাকার
গ্রীষ্মের প্রখরতা শীতের শুষ্কতা বর্ষার ভীষণতা
সব এক, কেউ জানতেও পারেনি।

ইঁট বালি পাথুরে রাস্তায় নির্মম নির্দয় নিঃসঙ্গ পথচলা
পদে পদে ঠোক্কর আর বিপদের চুম্বনে ধর্ষিত স্বপ্ন
কারুকে টের পেতেও দিইনি।
দীর্ঘ অনন্ত বেদনার্ত রাত ঘন নীল আকাশে লাল প্রতিপদের চাঁদ
কলুষিত গরলেভরা পান করেছি অমৃতের স্বাদ
তীব্র দহনান্তের শূন্যতা কারুকে প্রকাশ করিনি।

আজ একাকী মন এক অনন্ত অমাবস্যার রাতে দীর্ঘ সফর
কখনও যেন এক পিছুটানের অনুভব, নিশ্চিন্ত থেকো
ওগো নীলাঞ্জন, গরলসুধা পানের দহন কখনও ব্যক্ত করিনি।

পরবাস

শ্রী সদ্যোজাত

দু'হাত বাড়ালেই তো আর দু'হাত ধরা দেয় না,
সে যে আমার কেউ নয়... কেউই নয়!
সেই দূর হতে দূর নীলিমায় সে যে উড়তে পারে মেলতে পারে ডানা ওই মূর্ত ত্রিযামায়,

তাকে আমার ঘাটে বেঁধে রাখি কেমন করে...?
সে যে একতারা হাতে জলের আরতি করে গো...
বড় নদীর ওপারেতে অন্য কোনো ঘাটে...

কথা দিয়েছিলাম তুমি আসলে শেষ বিকেলের বিভাবরী জলনিধি রাখব পঞ্চপল্লবে ভরিয়ে,
সেজে আছি পরবাসে ধূসর হৃদয়ে ভেঙে যাওয়া বনপলাশী আগলে,
সে তো মেহগিনী চাদরে পলাশের রোদবৃষ্টি ঢালে গো,

তাসের খেলাঘরে কালকেতুর জীবন সুমিষ্ট যাপন,
বিলুপ্ত অস্তিত্ব আবারও হবে না ভূমিষ্ঠ,
মরমী স্বজন করেছে দরদী মুখাগ্নির আয়োজন বেওয়ারিশ প্রান্তনে,

সপ্ত সিন্ধু জীবনের দর্পণ গোধূলি আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে কোনো না কোনো একদিন,
প্রিয় যামিনী তুমি কি জানো...?
মৃত্যুর পরে যাবতীয় পোড়া দাগ ঈশ্বর হয়ে যায়।

•••✿◆✿•••

বসন্ত প্রিয়া

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

বসন্ত তার ফুলকারি কাজ ওড়নাখানি
সবুজ ঘাসে বিছিয়ে দিল।
ফাগুন হাওয়ায় অমনি শুরু কানাকানি
এমন দিনে মন কে নিল!

পলাশ বৌয়ের কাজল চোখে ভ্রমর পাগল
বারে বারে যায় যে খুলে দোরের আগল
অশোক শাখে কোকিল ডাকে মনের সুখে
শিমুল কাঁটায় ব্যথা জাগে গোপন দুখে।

আকাশ পটে সূর্য আঁকে বসন্তরাগ
বাউল মন আজ ব্যাকুল করে,
দখিন থেকে খবর আনে প্রেয়সী ফাগ
ফুলের বনে আবীর ঝরে।

•••✿◆✿•••

যতটুকু

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

আছে কিছু গোপন যোগাযোগ,
প্রোথিত দলিল আছে মিনারের নিচে।
মাংসল শরীর পাক খায় নিরবধি, খসে পড়ে ভাঙ্গা হরফ,
ছায়াহীন অন্তিমে উচ্চারিত হয় জলধ্বনি।
মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দেখো, শোনো কী শব্দ আসে কানে।
নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ভেঙ্গে কে অশ্রাব্য হাসে!
কিছুই শোননি তুমি –
দেখো না কিছুই, সন্তর্পণে যাও আভূমি সমর্পণে – নতিতে।
দশদিক থেকে কী প্রবল হাওয়া আসে!
প্রণামের ছলে কী এক অভিমানী চোখ আমাকে দেখে!
ভেবো না কিছুই – আমি ততটুকুই
যতটুকু দেখো তুমি – যতটা রয়েছি কাছে।

•••✿◆✿•••

ভুলে গেলে

অমিতাভ মিত্র

ভুলে গেলে ঘৃণারা একা হয়ে যাবে,
তন্দ্রাচ্ছন্ন রাতে যখন
দগদগে ক্ষতয় মাখিয়ে দেবে অনুশোচনা
যখন
গোলাপজল হয়ে ঝরে পড়বে অসহায়তা
অনুভব করব ঘৃণাতেও লুকিয়ে থাকে মলাটহীন মুখ।

অযত্নে হেঁটে বেড়ানো স্বপ্নেরা পলকে পাল্টে ফেলবে
পালকের রং,
ঘুড়িরা রাখবে না ভোঁকাট্টার হিসেব,
ভুলে গেলে ভেজা ক্যানভাসে আঁকব কী করে
নির্ভেজাল আঁচড়,
বসন্ত হতে চাওয়া রক্তের ফোঁটা
কিম্বা
বাজদগ্ধ নিমগাছে খুনসুটিদের বসত,

মগজের ম্যাগাজিনে বুলেট ভরে দিয়েছে আক্ষেপ।

•••৯০◆৩৪•••

শক্ত মুঠো

বিষ্ণুপ্রিয়া

সব কি শক্ত মুঠোয় ধরা যায়?
একটা বোধই যথেষ্ট হয়তো।
চারিদিকে কত শব্দের প্লাবন,
তার মাঝের নৈঃশব্দ্য কি ছোঁওয়া যায়?
চারিদিকে কত রঙের ক্যানভাস,
চোখ বন্ধ করলেই,
বৈষম্য কি বোঝা যায়?
দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ছুটে চলে
নিশ্চিত লক্ষ্য হারিয়ে যায়
দুরন্ত পায়ের ধুলোর ঝড়ে।

তবুও তো আমরা বাঁচি,
নিঃশ্বাস নিই, যুদ্ধে নামি,
খুঁজি নির্জন রাতের নিশ্চিন্ত
ঘুমে মিশে যাওয়া ক্লান্ত শরীর
ও মনের অবশেষ সজীবতা।
পড়ি কবিতা, গানও গাই, শুনি
কত গজল, দাদরা, ঠুংরি,
একটা বোধ – প্রত্যয় বাসা বাঁধে,
শীর্ণ ভেলা চলে এঁকে বেঁকে
কত নদী কূল পেরিয়ে।

•••৯০◆৩৪•••

স্মৃতি

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি এলে, আমার কথা ভাব?
আনমনা এক টুকরো মেঘ ঘন হয়
মন কুঠুরির গোপন কোন কোণে!
ঝাপসা দৃশ্যপটে কী দেখো তুমি?
শিবতলীর ভেজা মাঠ, লাল ছাতা,
রেললাইন ধরে আঙুলে আঙুল
সমান্তরাল হেঁটে যায় আমাদের ছায়া!
স্মৃতির সাথে বসে আছি বহুকাল
আষাঢ় এলেই রিমঝিম বেজে ওঠে
পুরনো গির্জার কাঠের পিয়ানো,
ফাদার ডিসুজা আর আমাদের
আশ্রমের একান্নবর্তী পরিবার!
যেন কোন এক জীবনের ব্রাত্য মায়া!
শাওনের দিন সবটুকু নিয়ে ডুবে যায়
ফেলে আসা খেলাঘর ভেসে যায়
দুরন্ত এক প্লাবনে...

•••Ꮉ◆ଔ•••

ফেরে অতীত বর্তমানে

সুজাতা দাস

যখনই আগামীতে তাকাতে গেছি,
অতীত ছুঁয়ে গেছে নিরালা স্মৃতিকোণ –
কিছু অবাক করা গল্প, আর নিশীথের সহবাস নিয়ে
একাকার দুই কোণ –
ভাল নেই, অথবা আছি সবটাই বিতর্কিত –
হঠাৎ স্মৃতিরা আলোড়িত হয়, ভাসে সঙ্গোপনে –
ফেরে না কিছুই অথবা ফিরে আসে,
একের পরে এক...
না যায় ধরা অথবা ধরতে লাগে বারো মাস –
তুই-আমি, আমি-তুই যেখানে মুখ্য –
মিথ্যেরা আজ অনেক শক্তিশালী, সত্যরা আজ গৌণ –
কিছু পরাজয়, জয় আনে বার বার,
যেখানে অতীত, বর্তমানে হারিয়ে একাকার –
ভাল-লাগা হারানো দুঃখের রোজনামচায়,
যেখানে বর্তমান অতীতের সমান –

•••Ꮉ◆ଔ•••

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

মন্দ নিয়ে মন ভাবে না
ভালো মনেই থাকি,
দুঃখ সুখের উর্ধ্বে যেন
তোমায় কাছে রাখি|
জানিনে যা তাই নিয়ে মন
কক্ষনো না ভাবে,
জেনেছি আজ তোমায় যেটুক
মন সেটুকুই পাবে|
জানি তোমার জানব সবই
রইবে না তা বাকী|
দ্বিধায় যেন না থাকে মন,
সংশয়ে না ডোবে,
তুমি সবই, তোমার সবই,
তাই রয়েছি ভবে!
চিন্তা কেন করব আমি
দিলেম তোমায় দিয়ে,
রইব বেঁচে একইভাবে,
সঙ্গে তোমায় নিয়ে|
জানি তুমি করবে পরখ,
তবু – দেবে না কভু ফাঁকি|

জ্বর

নমিতা রায়চৌধুরী

হঠাৎ করেই কেমন
বদলে গেছে সব, একেবারে সবকিছুই!

তুমিও নেই সেই আগের মতো|
চেনা তবু, কত যে অপরিচিত!

শুঁয়োপোকারা টুকরো টুকরো করছে
মজ্জায় মিশে থাকা অতীত!

দিনের গা পুড়ছে প্রচন্ড তাপে,
পারদ গলানো জ্বর অহর্নিশি!

মনের পাটাতনে তবু হেলান দিয়ে,
রোজ বসে একজোড়া আলতা-রঙ মল!

দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ভালবাসা নিভৃতে
বুকের উষ্ণতায় খোঁজে নিষ্কলঙ্ক প্রেম!

আশা চোখে এখনও কাজল টানে,
সেঁজুতি আলোয় নিকোনো উঠোন সাজে!

বাঁশি রোদন ভুলে বেজে উঠে হঠাৎ,
অচেনা রাত ভুলে দাঁড়ায় আচম্বিতে!

আর মাত্র ক'টা দিন অতনু,
জ্বর সেরে গেলেই আবারও হাঁটব পথ!

তুমি-আমি মিলে হব আমরা,
ইচ্ছে হলেই ভাসব দোঁহে অপার নীলে!

বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা

সুদিত শেখর মুখোপাধ্যায়

সারাটা দিন ধরে বৃষ্টির কথা ভাবতে ভাবতে
দিনের শেষে
আমরা বৃষ্টির মতন টাপুর টুপুর শব্দে ঝরে পড়তে লাগলাম।
এখানে সেখানে মাঠে ময়দানে।
সে এক অদ্ভুত খেলা –
বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা।

কেউ বা পড়ল বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা –
রঙিন ছাতায় –
ছাতা থেকে মাথায় –
এক নিমেষে একরাশ বিনুনিকরা চুল ভিজিয়ে দিয়ে
নেমে এল রাস্তায়।
তারপর বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা –
এ গলি থেকে সে গলি –
অবশেষে মিশল গিয়ে
শেষের সেই বড় দীঘিটায়।

কেউ বা পড়ল
তিনতলা বাড়ীর কার্নিশে –
কার্নিশকে কুর্ণিশ করে
নেমে এল বাগানে।
এক নিমেষে ভিজিয়ে দিল
রজনীগন্ধা, গোলাপ আর হাস্নুহানাকে।
বাদ গেল না বাড়ির সাদা কুকুরটাও।
সেই বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা
এ গলি সে গলি হয়ে
মিশে গেল সেই দীঘিটায়।

কেউ বা পড়ল
ভাঙ্গা টালির চালে –
স্যাঁতসেঁতে ভেজা ঘরটাকে
আরও ভিজিয়ে দিয়ে
নেমে এল বড় রাস্তায় –
তারপর সেই বড় রাস্তা থেকে ছোট রাস্তা
এ গলি সে গলি হয়ে
মিশল গিয়ে
শেষের সেই বড় দীঘিতে।

কী অদ্ভুত কী মজার খেলা – বৃষ্টি বৃষ্টি খেলা।
যে যেখানেই পড়ো না কেন
শেষ বেলায় সেই একসঙ্গেই মেলা।

আর অপেক্ষা না করে

দেবাঙ্গনা ব্যানার্জী

আমি তাই আর অপেক্ষা না করে – এখন
পোকায় খাওয়া, জীর্ণ সেই শালপাতার টোকা
কাতরে ওঠা অবহেলায় জর্জরিত সেই সাইকেল
মরচে দাগে মলিন সেই সাদা খোলের কালো সুতোর শাড়ি
একত্রিত করেছি যাদের তুমি চিনতে – এখন
গ্রীষ্মের দুপুরের আস্ফালন, চোখরাঙানি –
একমনে আমি তোমার বাড়ি খুঁজছি
শুকনো পাতা চাকায় পিষে, ধুলোয় উড়ে যাচ্ছে
তোমার বাড়িটা আমার মনে পড়ছে না, আমি জানি –
তোমায় খুঁজতে হলে এমন দুপুরেই পুড়তে হবে আমায়
আমি তাই অপেক্ষা না করে, আর অপেক্ষা না করে
সব থেকে লাল রাস্তা বেছে নিয়েছি...

নক্ষত্রের দিনগুলি রাতগুলি

মানস সরকার

মানসিক অবসাদগ্রস্ত মানুষের কাছে যদি
আত্মহত্যাই মুক্তির শেষ উপায় বলে বিবেচিত হয়
তখন কি কিছু লিখে রেখে যাওয়া উচিত...!
মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহে – এমন বাক্য রচনার
অন্তর্নিহিত কারণগুলির মুখোশ যাবার আগে
খুলে রেখে যাওয়া উচিত? যদিও এখন
মুখ আর মুখোশ একাকার – আলাদা করে কাউকে
চেনার উপায় নেই, কার মুখোশ খুলবে তুমি!
দেশ কাল ভেদ করে নির্বোধের জ্ঞান নিয়ে তোমাকে
একা যেতে হবে বোধের অনেক গভীরে। যদিও সেখানে
চৈতন্যের উদ্ভাসে সদাজাগ্রত তোমার প্রিয় স্কিজোফ্রেনিক শব্দ
অপেক্ষায় জর্জরিত দু'চোখের বিষে হঠাৎ করে ঘুরে যাওয়া
হাওয়ায় পাল্টে যাচ্ছে রঙ ও অবস্থান, এই ছিল ভালো
মুহূর্তে তছনছ করে নিজেকে –
ভাঙচুর ঘর গেরস্থালি, ছেঁড়াখোঁড়া
তৈজসপত্রের মতো হৃদয় নিয়ে প্রতিদিনের জীবন যাপন
সকালে উঠে সংবাদপত্র খুলে যেমন অগোচরে ভেসে ওঠে
গত রাত্রের লেখা চিরকুটখানি থেকে –
দীর্ঘদিন মানসিক অবসাদে
ভুগে ভুগে নিছক আত্মহত্যার এমন অজস্র কাহিনী।

•••✿◆✿•••

ক্ষরণ

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

জানালায় কোন দৃশ্য ঝুলে আছে অকাল বর্ষায়?
পুরনো ছাদের ঘরে হাঁটুমুড়ে অলক্ষ্য দুয়ার
এখন কি ঢেউ জাগবে?
কেউ এসে সরিয়ে নেবে পর্দার আড়াল
মৃয়মাণ ওই আলো নিভে যাবে অকস্মাৎ

ট্রাঙ্কের ভেতরে থাক শ্রদ্ধাহীন লুকোচুরিটুকু
বানিয়ে বানিয়ে তোলা স্রোতের আকার
সমান্তরাল এক ছায়ার স্পর্ধায় কিছু কি তলিয়ে গেছে
কোনদিন এরকমই মেঘের ধাক্কায়?

সেই স্তব্ধ বাড়িটির ঘাসে
এখনও মেঘের গন্ধে দুপুরের পাশে সন্ধ্যা নামে
নির্জন গল্পের মধ্যে মায়াবী আগুন
ভিজে ভিজে বর্ষা হয় বসন্তের ঘামে।

•••✿◆✿•••

হুকুম তোমার

শেলী শাহাবুদ্দিন

সূর্যোদয়ের আলোর মতো আঁধার নাশি,
প্রথম যেদিন দেখি প্রিয়ার সুখের হাসি,
প্রিয়ার দেওয়া সেই তো ছিল অমৃত দান,
বিনিময়ে তুচ্ছ মানি দলিত প্রাণ।

প্রথম যেদিন শুনি প্রিয়ার আনন্দ গান,
জাগে আমার বিশ্ব ভুবন, জাগে পরাণ।
সেদিন থেকে কতই স্মৃতি, জীবন ভরে,
সঞ্জীবনী কখনো বা রক্ত ঝরে।

প্রথম যেদিন কাঁদল প্রিয়া বিশ্ব জগৎ
অন্ধকারে। অন্ধ আমি, হারিয়ে সব।
সেদিন থেকে এই জীবনের ধর্ম জানি,
'কেমন করে দুঃখ প্রিয়ার ছিনিয়ে আনি'।

দুখের পাখি সেই থেকে সব তারই পোষা,
উড়ে এসে আমার বুকে বাঁধে বাসা।
ধন্য আমি, দুঃখ-বণিক, ধন্য পরাণ,
ধন্য যখন শুনি প্রিয়ার আনন্দগান।

শুধুই শুনি, আর তো সবই নিষেধ জানি,
হুকুম তোমার শিরোধার্য, রাজেন্দ্রাণী।

•••ꕥ◆ꕥ•••

অপেক্ষা

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

খাতা খুলে বসে থাকা ভাল, যদি চিন্তা না আসে;
জীবজগৎ নিজ গতিতে চলে,
পাখিও কবিতা লেখে বাসা নির্মাণে।
দৃশ্যের কাছে নিজে যাওয়া ভাল, যদি অন্তরে দৃশ্যান্তর না আসে;
নির্মিত সত্যকে দেখা ভাল যদি নিজস্ব নির্মাণ না আসে।
প্রবাল প্রাচীর যেমন নজরে আসে অবগাহনে সমুদ্র অগভীরে,
সিক্ত গিরিখাতে ভয়াবহ অভিজ্ঞতারাও নিষ্ঠুর কাব্য লিখে চলে –
এ পৃথিবী বেদনাগভীর,
বন্ধু কিম্বা শত্রু হবে তুমি নির্ভর করে সীমানার কোন পারে আছ,
সীমারেখাগুলো মানুষই ঠিক করে।
বন্ধ্যা অনুভূতি পাক খায় সীমাবদ্ধ আকাশে,
কোন কিছু না লেখা ভাল,
ভাল চুপচাপ থাকা –
বিরুদ্ধ বাতাসে অবরুদ্ধ নিশ্বাসে জন্মাক প্রতিকূলতা –
নতুন কবিতার বার্তা বিলাসে।

•••ꕥ◆ꕥ•••

যতদূর চোখ যায়

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

থালাজুড়ে চাপ চাপ শোক কাঁকুরে ভাতের মতো
গলা দিয়ে সহজে নামে না
কী যেন আটকে আছে আড়ষ্ট নালির কাছে
উগরে দিতে ভয় হয়
খালি হাতে ফিরে আসে নিজস্ব ব্যর্থতা

বিনা নোটিশেই কেউ চলে যায় ধোঁয়ার আড়ালে

যতদূর চোখ যায় মেঘের যন্ত্রণা
ঝাপসা আর পরমার্থ স্মৃতি
দৌড়ে গিয়ে খুঁজে আনবার এক তোড়জোড়
আকুলিবিকুলি
দিগন্তসীমার বাইরে ঠেলে দেয় দৃষ্টির দক্ষতা

যতদূর চোখ যায় ততটুকু স্থির সত্য নয়
তার বাইরে আরও বেশি নক্ষত্রের ছায়।

মনসঙ্গীত ৩

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

কর্ম কিছুই নয়রে ছোট
যেমনি সে হোক তা,
কর্ম সবই নিখুঁত হলে
প্রসন্ন হন দেবতা –

কর্ম করেন রাষ্ট্রপ্রধান,
কর্ম করেন মুচি,
কর্মফলের চিন্তা ছেড়ে
মনকে করে শুচি।
তাঁর কাছে দুই কর্ম সমান –
তেমনি ভেবেই নিস্ তা –
বাহিরে কাজ করি যখন,
আর – যখন করি ঘরে,
একইভাবে থাকি যেন
কর্ম তাঁরই তরে!
কর্ম সেদিন পূর্ণ হবে,
যেদিন পুণ্য মনে –
শূন্য থেকে তাঁর আশিসে
বসব উচ্চাসনে!
ফল সকলি রইবে তাঁরই,
রাখব পায়ে চিন্তা!

দোলাচল

সফিক আহমেদ

সেদিনও ছিল পূর্ণিমা,
বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচলে
হারিয়ে ফেলেছিলাম বোধবুদ্ধি।
কফিনে পুঁতে দিয়েছিলাম
শেষ পেরেক।
কালো গাউন আর শুকনো চোখে,
তাকিয়ে দেখেছিলাম প্রেমের সমাধি।

আজ সময়ের সরণিতে পিছিয়ে গিয়ে
ফিরে গেলাম সেই
বুদ্ধ পূর্ণিমার মায়াবী জ্যোৎস্নায়
তালসারি সমুদ্রতটে
নানা শরীরী বিভঙ্গ তুলে
আছড়ে পড়ছিল ছোট ছোট ঢেউ
ফসফরাসের নৃত্য দেখতে দেখতে
ছুঁয়েছিলাম পেলব আঙুল
বাতাসে বয়ে আসছিল মেছো গন্ধ
নৈসর্গিক দৃশ্য আর শরীরী মোহ মিলেমিশে
সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে
ডুবে যেতে লাগলাম চোরাবালিতে
এক টুকরো মেঘ যেন এল
লজ্জা নিবারণ করতে
ঢেকে দিল চাঁদের মুখ
সময় জ্ঞান গেল হারিয়ে
মোহভঙ্গ হতে উপলব্ধি হ'ল
জলে জলময় দিগ্বিদিক
জেগে ছিল শুধু একটু চরা
আর সঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস।

আজ কেন জানি ভরা পূর্ণিমাতেও
ফিরে আসে অমাবস্যার দীর্ঘশ্বাস।

•••❀◆❀•••

মিশ্রমনে নিলাম অবসর

রঙ্গনাথ

কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দিলাম
সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিলাম
কর্মক্ষেত্র ছেড়ে সরে এলাম –
আমি মিশ্রমনে নিলাম অবসর।
নেই অফিস যাত্রা, নেই তড়িঘড়ি;
যদিও আসে না তত টাকাকড়ি
নিজের খুশীতে এটাসেটা করি –
আজ আমার কাছে সময় বিস্তর।

বন্ধুরা বলে, 'যদি কাজে থাকতে
প্রতিদিন কতকিছু করতে, দেখতে;
পারতে জীবনটাকে সতেজ রাখতে –
ব্যস্ততাতেই বাড়ে জীবনের মূল্য'।
তাদের বলি, 'এখন মুক্ত আমি!
সক্রিয় রব; কভু যাব না থামি;
পছন্দের কাজে দেখি না বদনামি –
চিন্তাহীন থেকে মন রাখব প্রফুল্ল'।

জীবন এখন মধুর, চিত্ত থাকে শান্ত
এখন অত সহজে হই না আমি ক্লান্ত।

•••❀◆❀•••

টনির ময়না

হুসনে জাহান

আমি কবে এ বাড়িতে এসেছিলাম মনে পড়ে না; ১২/১৩ বছর তো হবেই | আমি তখন খুবই ছোট্ট এক বাচ্চা পাখি, মাত্র কয়েক মাস হবে হয়তো আমার বয়স | আমার এখানে আসবার আগের ঘটনা এতই বীভৎস হয়েছিল যে সে কথা মনে করলে এখনো ভয়ে শরীর আঁতকে ওঠে | চোখ ফোটার পর আবছা মনে পড়ে জন্মদাত্রী মা কত আদরের সাথে ঠোঁটে করে খাবার এনে কিচির মিচির করা তার সদ্যজাত ক্ষুধার্ত ছানাগুলোর ঠোঁটের ফাঁকে ভরে দিত | এরকম সুখেই সে দিনগুলো কাটছিল | হঠাৎ একদিন কোথা থেকে আচমকা বিশাল এক জাল আমাদের ওপর পড়ে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে ঘিরে ফেলল | আমরা দম বন্ধ হয়ে ডানা ঝটপট্ করতে লাগলাম | কিন্তু কোনো ফল হ'ল না | সেই জালের ভিতর এক বিশ্রী মোটা হাত এসে একে একে আমাদের ধরে খাঁচায় বন্দি করে দিল | জঙ্গলের প্রকৃতির সাথে সেই থেকে আমাদের হয়ে গেল পুরোপুরি বিচ্ছেদ |

জঙ্গলের দৈত্যটা খাঁচাশুদ্ধ আমাকে নিয়ে গিয়ে রেখে এল শহরের এক বাসায় | সে বাসার সুন্দরী গৃহকর্ত্রী আমাকে আদর করে রেখে নিল | সে নিজে হাতে ছোলা, বুট, বাদাম আমার ঠোঁটের কাছে এনে খাওয়াত | আর তার তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে আমাকে পেয়ে যে কী খুশি, তা আর কী বলব! ভোরে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত আমার পাশ থেকে তারা নড়তেই চাইত না | কত কথা, হাসাহাসি আমার সাথে! মা এসে বকা দিয়ে তবে ওদের স্কুলে পাঠাত | তারপর স্কুল থেকে ফিরেই প্রথম আমার কাছে আসত | ভারি আনন্দে কিছুদিন কাটল সেখানে | আমার জঙ্গল ছাড়বার দুঃখ তারা প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছিল | বাচ্চারা বাসায় না থাকলে তাদের মা যখনই সময় পেত আমার কাছে এসে কথা বলত, আর আমার সব রকম পরিচর্যা সবই যত্ন করে নিজে হাতে করত |

পৃথিবীর কোনো সুখই বোধহয় চিরস্থায়ী হয় না | একদিন এই পরিবারের বিদেশে যাবার নির্দেশ এসে গেল | মহিলা আমাকে তার মায়ের কাছে রেখে এল | আমার মতামত তো কেউ জানবার প্রয়োজন মনে করে না; আমি যে তাদের কাছে এক খেলা করবার পাখি | তার মায়ের বয়স ছিল সত্তরের মতো | এক বিরাট তিনতলা বাড়িতে কোনো আত্মীয় স্বজন ছাড়া শুধু কাজের লোকজন নিয়েই সে থাকত | আমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে সে যেন ব্যস্ত থাকবার এক পথ পেয়ে গেল | দোতলায় যে কাজের মেয়ে তার কাজকর্ম করত, তার ওপর আমার পরিচর্যার ভার দেওয়া হ'ল! মহিলা আমার খাবার জন্য তার নিজস্ব গরুর তাজা দুধ ও কলা মেখে বুয়াকে ফ্রিজে রেখে দিতে বলত | মহিলার নির্দেশে বুয়া দুবেলা আমার খাঁচা পরিষ্কার করে, খাঁচার ভেতর ছোট ছোট বাটিতে সেই সুস্বাদু খাবার ভরে দেয়, মানুষের মতো শিস দিতে শেখায় | গরমের দিনে আমাকে দুবেলা পানি ঢেলে গোসল না করালে আমি অস্থির হয়ে পড়তাম | সন্ধ্যের পর এক বড় কাপড় দিয়ে মশা থেকে বাঁচাবার জন্য খাঁচাটা ঢেকে মহিলার শোবার ঘরে খাঁচাশুদ্ধ আমাকে নিয়ে গিয়ে ঘুমের ব্যবস্থা করা হতো | ওই গোসলের মতো আমার আরো কিছু বদভ্যেস ছিল | রাতে পুরোপুরি অন্ধকার ও নিঃঝুম না হলে আমার ঘুমের ব্যাঘাত হতো | তাই সবার আসা যাওয়া হৈচৈ শেষ হলে তবেই আমি ঘুমের দেশে যেতে পারতাম | তোমরা ভাবতে পারো আমি খুব স্বার্থপর | না, তা ঠিক নয় | আমি যে জঙ্গলের পাখি, সাঁঝের সূর্য ঢলে পড়লে পৃথিবী অন্ধকার হবার আগেই তো আমরা সব যে যার আস্তানায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি, আর ভোরের আলো ফোটার সাথে আমরা চোখ খুলে উড়ে বেড়াই | সত্যি করে বলো তো, আমার সে জাতিগত অভ্যেস কী করে ঝেড়ে ফেলি আমি?

মহিলার আদর ও যত্নে আগের সুন্দর মহিলা ও তার ছেলেমেয়েদের ছেড়ে আসবার দুঃখ ক্রমশ ভুলে গেলাম | এই বয়স্কা মহিলার সাথে আমার এক আত্মার সম্পর্ক হয়ে গেল | আহা, সে বেচারিও তো এই বিশাল বাড়িতে কত একা | কাজের বুয়ারা ছাড়া কেই বা তার সারাদিনের সাথী? দেখলাম কিছু শারীরিক সমস্যার জন্য সে মেঝেতে বসতে পারত না | যখন তখন সে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে, বা মোড়া নিয়ে বসে 'ময়না', 'হ্যালো ময়না' বলে গল্প জুড়ে দিত | আমি তারই স্বর অনুকরণ করে জোরে জোরে বিভিন্ন স্বরে ও সুরে তার কথাগুলো আওড়াতাম | কাজের মেয়েরা আর তার বড় বড় ছেলেমেয়েরা তাকে 'আম্মা' ডাকত, ছোট ছেলেমেয়েরা তাকে কেন যেন 'টনি' বলত | তাদের খিলখিল বা হা হা করে হাসতে শুনলে আমিও দারুণ আনন্দে তাদের মতো করে হেসে শোনাতাম | তারা সেই শুনে মজা পেয়ে আরো হাসত | টেলিফোনের ঘন্টা

বাজলে মহিলা টেলিফোনটা হাতে উঠিয়ে 'হ্যালো' বলে শুরু করত তাদের বকবকানি, তখন আমিও তাদের গল্পে যোগ দেবার জন্য টনিকে নকল করে বকবক করে যেতাম | আমাকে তো কেউ কষ্ট করে বই খুলে পড়া শেখায়নি যে তাদের মতো বুঝে শুনে কথা বলব! তাই আমি যেমন শুনতাম তেমনই ইচ্ছেমতো হাবিজাবি ইংরেজি আর বাংলা মিশিয়ে কতগুলো শব্দ করে তাদের সাথে কথায় যোগ দিতাম | আর তখন আমার কথা শুনে তারা সবাই খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি যেত | এরপর টেলিফোন বাজবার শব্দ শুনলেই আমি বিভিন্ন স্বরে 'হ্যালো, হ্যালো' বলেই চলতাম যতক্ষণ না মহিলা বা অন্য কেউ এসে টেলিফোন হাতে নিত|

এভাবেই আমার জঙ্গলের জীবনের স্বাধীনতা, নিয়ম কানুন, পুরনো কথাবার্তা সব পিছনে ফেলে আমি টনির সংসারে খাঁচায় বন্দী জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম | আমার মা, ভাইবোনদের তো আর কোনোদিন পাওয়া যাবে না, কাজেই যেখানে আদর যত্ন পাই সেখানেই সুখী হয়ে থাকবার প্রস্তুতি নিলাম | কথায় বলে না, "রোম শহরে রোমানদের মতো জীবন যাপন করতে পারলেই সুখে থাকা যায়|"

কেউ টনির সাথে দেখা করতে এলেই দারুণ উৎসাহ ও উত্তেজনায় আমার শেখা যত 'বাংলিশ' বুলি একাধারে আউড়িয়ে তাদের চমক লাগিয়ে দিতে আমি মোটেই দেরি করতাম না | সবাই পাখির মুখে মানুষের মতো কথা শুনে অবাক হয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আনন্দ পেত | আমিও উৎসাহিত হয়ে নেচে নেচে ওদের সাথে কথা বলার প্রতিযোগিতা শুরু করে আমার পুরো বিদ্যা জাহির না করা অবধি ক্ষান্ত হতাম না|

আমার সব চাইতে বেশি আনন্দ হতো যখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেড়াতে এসে আমার পাশ থেকে মোটেই সরতে চাইত না | খাঁচার চারপাশে ঘুরে ঘুরে আমার কথা শুনত আর অনুকরণ করত | আর শুনেছি তারা নাকি সবাই ময়না পাখির বাড়ি আসবার কথা শুনলে দারুণ খুশি হয়ে চলে আসত | তাদের বাবা-মাও 'চল, ময়নার বাসায় নিয়ে যাব' বলে বাচ্চাদের কান্নাকাটি বন্ধ করার চেষ্টা করত|

টনি রোজ ভোরে উঠে কাজের মেয়েদের ডেকে তুলে তাদের সাহায্যে মুখ হাত ধুয়ে নামাজ পড়তে বসত | আমার কাজের বুয়া দরজা খুলে মশারি সরিয়ে আমাকে বারান্দায় রেখে খাঁচার ময়লার ট্রে বার করে পরিষ্কার করে আনত | তারপর টনির তৈরী খাবার বাটিতে করে খাঁচার ভেতর রেখে দিত | আমি খাঁচার দাঁড় থেকে নেমে নেচে নেচে উপর-নিচে ওঠানামা করে করে খেতাম | ততক্ষণে টনি সামান্য কিছু নাস্তা করে বারান্দায় বেরিয়ে এক মোড়ার উপর ধর্মীয় বই নিয়ে বসত | কিছুক্ষণ পর বুয়া বালতি ভরে টনির গরুর দুধ এবং কয়েকটা ছোট ছোট ঘটি, বাটি এনে সিঁড়ির উপর রেখে দিত | টনি মোড়াতে বসে বালতি থেকে দুধ মেপে মেপে বিভিন্ন পাত্রে ঢেলে রাখত | তার থেকে গোটা দুয়েক ভান্ড দুধ দোয়াবার লোকের হাতে দিত | বাকি দুধভরা পাত্র বুয়া ফ্রিজে ভরে রাখত | আসলে নিজের পরিবারের সবাইকে খাঁটি দুধ খাওয়াবার ইচ্ছায় টনি চিরকাল বাসায় দু তিনটে গরু পালত | তার যে ছেলেমেয়েরা আশেপাশে থাকত তাদের রোজ দুধ পাঠিয়ে দিত | আর আত্মীয় ও প্রতিবেশী যারা ছেলেমেয়েদের খাঁটি দুধ খাওয়াবার ইচ্ছা জানাত, তাদের জন্য টনি দুধ মেপে ফ্রিজে রেখে দিত | গরু ও অন্যান্য গৃহপশু পালা টনির শখ ছিল | তারপর বুয়া ছোট বালতি ভরে পানি এনে মগ দিয়ে খাঁচার ভেতর আমার শরীরের ওপর একটু একটু করে ঢেলে দিত | আমি শিউরে উঠে খাঁচার এক দাঁড় থেকে অন্য দাঁড়ে লাফালাফি করতাম | গরমের দিনে এরকম পানির স্নান দুবেলা আমাকে করানো হতো | ভাবছ, দুবেলা স্নান? এত বড়মানুষী কেন? না, বড়মানুষী নয় | আমি যে জঙ্গলের প্রাণী | বৃষ্টির পানিতে ইচ্ছামতো ভেজার অভ্যাস তো আমার জন্ম থেকেই | আর দেখো না, টনিও তো সকালে একবার স্নান করে, আবার বিকেলে মুখ হাত পা ভাল করে ধুয়ে ধোপভাঙা শাড়ি পরে, ফিনফিনে চাদর গায়ে জড়িয়ে কেমন গাড়ি চড়ে হয় পার্কে নয়তো কোনো আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যেত রোজ! বুয়া আর আমাকেও সাথে করে নিয়ে যেত|

টনির গরুগুলো কিন্তু মোটেই দেশী গরু ছিল না | অস্ট্রেলিয়ার অথবা মূলতানের গরু, যাদের থেকে দুবেলা ৮ থেকে ১০ সের দুধ পাওয়া যেত | সবাইকে দুধ ভাগ করে দেবার পর টনি বাসার সবার জন্য নানা ধরনের মিষ্টি বানাত | নানা বেঁচে থাকতে তো ছানা, পুডিং, দই নিয়মিত বানানো হতো | গরুর দেখাশোনা করা কিন্তু আমার মতো পাখির দেখাশোনা করার থেকে আরো অনেক বেশী ঝামেলা | প্রথমে গরুর প্রতিদিনের খাবার জন্য ঘাস, খড়, ভুষি, খৈল, পানি, সব জোগাড় করা, তারপর গরুর সেবাযত্ন, লোক দিয়ে দুবেলা দুধ দোয়া, তারপর গরুর বাচ্চা জন্মকালে ডাক্তার ডেকে সারারাত জেগে

দেখাশোনা করা | আর সে সময় যদি কোনো অঘটন দেখা দেয়, তখন প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করা যে কত অসুবিধার কাজ ও সময়সাপেক্ষ, তা টনির কাছে থেকে আমার পুরো বোঝা হয়ে গেছে | এরপর টনির সারাদিনের রুটিনে বুয়া এসে ফ্রিজ থেকে কাঁচা মাছ, তরকারি ট্রেতে করে টনির সামনে এনে রান্না বুঝে নিত | একটু পরে টনি সবজি কাটাবাছা ও রান্না দেখিয়ে দেবার জন্য নিচে চলে যেত | আর আমি আপন মনে লাফালাফি করে রাস্তার ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি, রাস্তার ফেরিওয়ালার ডাক, রিক্সার ঘন্টা ও গাড়ির হর্ন বাজবার শব্দ নকল করে আমার উপস্থিতি জাহির করতাম | আমি মোটেই একা থাকা পছন্দ করতাম না | কাজেই যা শুনতাম, যতদূর থেকেই তা হোক না কেন, আমি অনুকরণ করে সবার কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতাম | নিচে রান্নাঘরের তদারকি শেষ করে টনি উপরে এসে টেলিফোনের সামনের চেয়ারে বসে ফোন করে অনেকক্ষণ কথা বলত | আমিও নাছোড়বান্দা | আমার যত শেখা কথা আউড়িয়ে খিলখিল করে হেসে টনির কথাবার্তায় অংশ নিতাম | তারপর গোসল করে টনি বড়ঘরে মাদুরপাতা চৌকির কাছে মোড়ায় বসে দুপুরের খাবার খেত | সে সময় টনির বড়ছেলে এসে তার খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আরেকটা মোড়ায় পাশে বসে থাকত | খাওয়া শেষ করে টনি টিভি খুলে সেই মাদুর পাতা চৌকির উপরই শুয়ে পড়ত | রাতের খাবারের পরও টনির সেই একই রুটিন ছিল | আর আমি আবার রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা লোকজনের সাথে বন্ধুত্ব করতে ব্যস্ত হতাম | রোজ সকাল সন্ধ্যায় একটা লোক এসে নল লাগানো এক যন্ত্র দিয়ে টনির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে, ছুঁচ ফুটিয়ে হাতে ওষুধ ঢোকাত | মাগো, দেখে আমার তো গা শিউরে উঠত, কিন্তু কী জান বাপু, টনি তো মুখ বুজে চুপ করেই তা মেনে নিত | মাঝে মাঝে টনির ছেলেমেয়ে ও তাদের পরিবার বিদেশ থেকে এলে তারা আমাকে নিয়ে অনেক আমোদ ফুর্তি করত | ওরা আমাকে দেখে, আমার কথা ও হাসি শুনে খুব আনন্দ পেত |

এভাবে একে অন্যের সাহচর্যে আমাদের দুজনের জীবন মোটামুটি ভালই চলছিল | আমি টনির গলার স্বরে কথা বলতে শিখে গেলাম | তাতে টনি খুশি হয়ে আমার কাছে বসে আরো অনেক কথাবার্তা বলত আর আমি লাফালাফি করে, উড়ে আবার সব কথা আওড়ে শোনাতাম | মানুষের কথা তো আমি বুঝতাম না, তবে হাবভাব দেখে আর কানে শুনে সুর করে চেঁচিয়ে তাই শুনিয়ে দিতাম |

একদিন বিকেলে টনি পার্কে গিয়ে হঠাৎ এক পা উঠাতে পারল না | টনির বড় মেয়ে তার ছেলের সাথে ঠিক সে সময়ই সেই পার্কে হাঁটতে গিয়ে টনির অবস্থা দেখে ধরে ধরে গাড়িতে বসিয়ে বাসায় নিয়ে আসে | ডাক্তার এল | কিন্তু তার কিছুদিন পর থেকে টনি এক পা বাঁকা করেই রেলিং ধরে আমার সামনে হাঁটাহাঁটি করত | আর বুয়াকে সাথে নিয়ে মোড়াসহ পার্কে গিয়ে বসে থাকত | তবে সকালে বুয়ার হাত ধরে রান্নাঘরে যাওয়া তখনও ছেড়ে দেয়নি |

এর পর আরেক দিন টনি হঠাৎ নিচে রান্নাঘরে যাবার সময় পা পিছলে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গেল | তার বড় ছেলে দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ির নিচে মেঝেতে পড়া তার রক্তাক্ত মাকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে ডাক্তার ডেকে হাসপাতালে নিয়ে গেল | বড় মেয়ে মায়ের খবর শুনে ছুটে এল | সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে কপালে কাটা অংশ সেলাই করে ও ইনজেকশন দেওয়ায় টনি বাসায় ফিরে আসতে পারল | বাবাঃ, সে যাত্রায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম | কত কিছুই তো হতে পারত! তারপর থেকে টনি উপরের বারান্দাতেই আমার খাঁচার পাশে রেলিং আর বুয়ার হাত ধরে আস্তে আস্তে পায়চারি করত | যতদিন পেরেছে, সেটা সে বাদ দেয়নি | তবে সকালে আর নিচে নেমে রান্নাবাড়া বোঝাতে যেত না | বুয়াই সব রান্নার সামগ্রী উপরে নিয়ে এলে টনি বসে বসে বুঝিয়ে দিত কীভাবে কী রাঁধতে হবে |

টনির শরীর ক্রমেই আরো দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল | হাঁটতেও তার কষ্ট হতো | রক্ত পরীক্ষার ফল খারাপ এল | বাসায় ডাক্তার ও আত্মীয়-বন্ধুরা সব আসা যাওয়া করতে লাগল | তার বড় মেয়ে, বড় ছেলে ও মেজ মেয়ে রোজ বারবার এসে বসে থাকত মায়ের কাছে | টনির ছোট ছেলেও তার স্ত্রী ও মেয়েসহ বিদেশ থেকে এসে পড়ল |

একদিন বহু সাধাসাধি করে হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে বাসায় ডাকা হলে সে খুব কড়া মেজাজে শমন জারি করে গেল যে টনির কিডনির অবস্থা শোচনীয় এবং হাসপাতালে ভর্তি না হলে নাকি চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না | ছেলেমেয়েরা তখন মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল | টনি তার মাকে হাসপাতালে রেখে এত কষ্ট পেতে দেখেছিল যে তার স্বামীকে সে নাকি পুরো দু'বছর অসুস্থ অবস্থায় বাসাতেই রেখে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করিয়েছিল | কিন্তু তখন ডাক্তাররা প্রয়োজনমতো বাড়িতে হাজির হয়ে যেত |

তখনই টনি ছেলেমেয়েদের বলে রেখেছিল তাকেও যেন হাসপাতালে ভর্তি করা না হয়। আরো বলেছিল যে কষ্ট দিয়ে কিডনির রক্ত পরিষ্কার করিয়ে যেন তাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টাও না করা হয়। টনির কোনো ছেলেমেয়ে ডাক্তারি পড়েনি। ডাক্তারের হাসপাতালে নিয়ে যাবার ধমক শুনে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। যদি হাসপাতালে না গেলে অবস্থা আরো খারাপ হয় তখন কী হবে? টনি তো কখনো ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে কোনো শারীরিক সেবাও নিতে চাইত না। এখন ছেলেমেয়েদের সমস্যা বুঝতে পেরে নিরুপায় হয়ে আর কোনো কথা না বলে তার বুয়াকে ডেকে হাসপাতালের স্যুটকেস গুছিয়ে দিতে বলল। তারপর তাকে চেয়ারে বসিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে প্রবেশ করাবার সময় বুয়াদের বলল, 'আমি এবার আর ফিরে আসব না।'

টনির ছেলে মেয়েরা ভাগাভাগি করে দিনে ও রাতে হাসপাতালে যাওয়া আসা করত। এক সকালে হাসপাতাল থেকে বড় মেয়ের ফোন পেয়ে সবাই চলে গেল সেখানে। দুদিন পর টনির ছোট মেয়ে আর তার দুই ছেলে যাদের বাসায় আমি প্রথম শহরে এসেছিলাম, আর টনির অন্য মেয়ে মাঝরাতে পৌঁছে সোজা হাসপাতালেই চলে গেল। শুনলাম টনি নাকি তাদের ডাকাডাকি শুনেও চোখ খোলেনি, কথাও বলেনি। সেই সকালেই আবার কিছুক্ষণ পর হাসপাতাল থেকে খবর এল সে আর নেই। টনিকে জীবিত অবস্থায় চোখেও দেখলাম না আর একবার।

হাসপাতাল থেকে এনে টনিকে নিচের ঘরে রেখে দিল ওরা। চেনা অচেনা অনেক লোকজন আসা যাওয়া করতে দেখা গেল। তারপর আমাকে বুয়ার তাঁবেদারিতে সিঁড়ির বারান্দায় রেখে দোতলার দরজা বন্ধ করে সবাই হাসপাতালের গাড়িতে টনিকে নিয়ে বাসা থেকে চলে গেল। পরদিন বিকেলে তারা ফিরে এল, কিন্তু আমার আদরের টনি তো ফিরে এল না, আমার সাথে আর হাসি-গল্পও করল না!

বিদেশ থেকে আসা টনির ছেলেমেয়েরা কিছুদিন বাসায় থাকল। ছোট মেয়ে আমার দেখাশোনা করছিল। মায়ের গলার স্বরে আমার কথা শুনে তারা মন খারাপ করত। তবে বিদেশের ছেলেমেয়ে সবাই তো ফিরে যাবে, আর কাজের মেয়েরাও সব চলে যাবে। তখন আমি কার কাছে থাকব সে কথা নিয়ে তারা চিন্তা করতে লাগল। ঢাকায় টনির দুই মেয়েই চাকরি, সংসার নিয়ে এত ব্যস্ত যে আমাকে টনির মতো আদর-যত্ন করে দেখাশোনা করবার সময় পাবে না। আমি যে এখন শহরের খাঁচার পাখি, আমাকে ছেড়ে দিলেও তো আমি আর স্বাধীন হয়ে থাকতে পারব না।

সম্পর্কে তাদের এক বোন, জিনার কাছে নাকি আগে আমার মতো একটা পাখি ছিল। সে রাজী হ'ল আমাকে নিয়ে যেতে। আমার সব কাজকর্ম তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল। খাঁচাশুদ্ধ সে আমাকে নিয়ে গেল। জিনার স্বামী মারা যাবার পর তার দুই ছেলেই বিদেশে পড়াশোনা করতে চলে যায়। সে এক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিল। সে কাজে চলে গেলে তার কাজের মেয়েই আমার দেখাশোনা করত। একবার সে কয়েক দিনের জন্য শহরের বাইরে গেলে কাজের মেয়েটি বাসার দারোয়ানের কাছে আমার দেখাশোনার ভার দিয়ে ছুটিতে চলে গেল। দারোয়ান ঠিকমতো আমার পরিচর্যা করেনি। জিনা ফিরে এসে আমাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। টনির ছেলেমেয়েরা তো সব অনেক আগেই যে যার দেশে ফিরে গেছে। তখন জিনা টনির বড় মেয়ের কাছে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে জানাল যে তার পক্ষে আমার দেখাশোনা করা সম্ভব হবে না।

টনি চলে যাবার পর সে আদর যত্ন কি আর কোথাও পাওয়া যাবে? আমাদের দুজনের মতন দুটি সাথীহারা জুটি পাওয়া সত্যিই বিরল। বড় মেয়ে আমাকে তার মায়ের স্মৃতিতে ঠিক তেমনই আদর যত্ন করতে কোনো ত্রুটি করেনি। তবে তার বুয়ার কাছেই আমার ভার দিয়ে সে কাজে চলে যেত। তারপর দুপুরে বাসায় ফিরে আগে আমার খাওয়া, নাওয়া সব শেষ করিয়ে তবে সে নিজে খাবার ও বিশ্রামের সময় পেত। আমার গলায় তার মায়ের গলার স্বর শুনে সে আমার সাথে তার মায়ের মতো করেই কথা বলত। কিন্তু তারও তো বেশ বাড়ন্ত বয়সই হয়েছিল, তাই স্বামীর সংসার, চাকরির পর আমাকে যেভাবে দেখাশোনা করতে চায়, তাতে যথেষ্ট হয়রানি হচ্ছিল। এমন সময় তাদের এক নিঃসন্তান বড়লোক আত্মীয়া, তন্বী একদিন বেড়াতে এসে আমাকে দেখে ও সমস্যার কথা শুনে আমাকে তার বাসায় নিয়ে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। তাকে আমার কাজকর্ম সব বিস্তারিত বুঝিয়ে মনখারাপ করে তার হাতেই আমাকে তুলে দিল টনির বড় মেয়ে।

তন্বীর বাসা ছিল বিশাল ও অনেক দামি দামি জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো। তার স্বামী ডাক্তার। তার চেম্বার ছিল বাসার

একতলায়। তার কাছে দুটো ছোট ছোট মেয়ে কাজ করত আর পড়াশোনাও করত। আমার দেখাশোনার ভার তাদের হাতেই ছেড়ে দিল তন্বী। তন্বীর কথামতো আমাকে সব ধরনের খাবারেই তারা অভ্যস্ত করাবার চেষ্টা করল। তন্বীরা যে অঞ্চলের লোক, সেখানে অনেক ঝাল মশলা দিয়ে খাবার রান্না হয়। কিন্তু আমি যে শুধু খাঁটি গরুর দুধ-ভাত-কলাই এতদিন খেয়েছি। এখন হঠাৎ কী করে আমার মতো অভিজাত পাখির পেটে এত মশলা, ঝাল সহ্য হতে পারে! আমি যে বনের ময়না পাখি সেকথা পুরোপুরি ভুলে আমাকে মানুষের মতো খাবার দিলে কি আমি খেতে পারি? খাবার একটু ঠোঁট দিয়ে নেড়েই আমি উড়ে গিয়ে খাঁচার উপরের দাঁড়ে বসে থাকতাম। কাজকর্ম, বন্ধুবান্ধব, লৌকিকতা, আর তার স্বামীর ডাক্তারখানার কাজে সাহায্য করা নিয়ে ব্যস্ত তন্বী। খিদের চোটে কখনো কখনো ওই মশলা খাবারই একটু মুখে দিতাম। এরপর একদিন শুরু হ'ল আমার পেটের যন্ত্রণা ও পাতলা পায়খানা। শরীরের লোম ঝরে পড়তে লাগল। তন্বী আমার অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল; অনেক কথা বলে আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করত। না খেয়ে আমি ক্রমশ দুর্বল হতে শুরু করলাম। কিছুদিন পর নাচানাচি লাফালাফি করবার শক্তিও হারিয়ে ফেললাম। তন্বী চিন্তিত হ'ল, ডাক্তার দেখাল; কিন্তু বুঝতে পারল না যে আমি দুধ-ভাত-কলা খাওয়া পাখি, তাদের ঝাল মশলার খাবার খেয়ে সহ্য করতে পারিনি। এক সকালের দিকে আমি আর মাথা সোজা করে উঠতে পারলাম না। তন্বী আমার অবস্থা দেখে হৈচৈ শুরু করল, আমাকে ওঠাতে চেষ্টা করল, লোকজন ডাকল। তারপর আমি আর কিছু জানি না।

আরে বাবা, কথাই তো আছে যে "বন্যেরা বনে সুন্দর আর শিশুরা মাতৃকোলে"!

প্রকৃতি বনাম মানব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ডলি ব্যানার্জী

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভালো?"
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে শুরু হয়েছে নিদারুণ আলোড়ন।
যন্ত্র দানবের নির্মমতায় আধুনিকতার পদতলে পিষ্ট পৃথিবী।
নিত্যনতুন আবিষ্কারে, ক্ষমতার দম্ভে মানুষ আজ অন্ধ।
আকাশচুম্বী অট্টালিকার আবির্ভাব হচ্ছে পুকুর, দীঘি ভরাট করে।
চারিদিকে তাই জলের জন্য হাহাকার। প্রকৃতির কোলে ছোটদের প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার খেলার মাঠটিও হারিয়ে যাচ্ছে।
প্রকৃতি যেদিন অক্সিজেন দেওয়া বন্ধ করবে মানুষ সেদিন শেষ।
গাছপালা নিধন করতে মানুষ আত্মহারা। আগুনের লেলিহান শিখায় আত্মাহুতি দিল সবুজ গাছগাছালি। শুরু হ'ল দাবানল।
অক্সিজেনের অভাবে মানুষ উদ্বিগ্ন।
বিদ্রোহীর রূপ নিয়ে সৃষ্টি হ'ল মারণঘাতী রোগ।
শতসহস্র মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে।
ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানুষ আজ বন্দী বিহঙ্গ।
মুখ খুলে নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা নেই।
এই মানুষই একদিন মুক্ত বিহঙ্গকে খাঁচাবন্দী করেছিল।
প্রকৃতির সোনার তরীতে মানুষের ঠাঁই নেই।
হিমবাহের গলিত দেহ আর নেই।
পাগলাঝোরায় লেগেছে যৌবনের ইশারা।
গৈরিকবসনা গঙ্গায় লেগেছে জোয়ারের স্পন্দন।
বিপাশাও অবগুণ্ঠিতা নেই, তাতেও লেগেছে প্রেমের জোয়ার।
দামোদরও প্রেয়সীর ডাকে সাড়া দিতে তৎপর।
দোয়েল কোয়েলের কলকাকলিতে মুখর ভোরের আকাশ।
আমলকি বন দুরু দুরু বুকে ভয়ে ভীত নয়।
বসন্ত এখন রোদনভরা নয়। কোকিলের কুহুতান শোনা যায় বসন্ত সমাগমে। হে প্রকৃতি –

"তোমার প্রকাশ হোক
কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন, সূর্যের মতন।"

ব্রজনাথবাবু

বীরেশ্বর মিত্র

রথীন্দ্র মোহন সেন আজ আঠান্ন পেরিয়ে ঊনষাট বছরে পা দিলেন | এটা ওঁর নতুন অফিস | মাত্র তিনমাস হ'ল একটি বেসরকারি কম্পানির একটু বড় গোছের কর্তার পদে উন্নীত হয়ে কলকাতা থেকে দিল্লিতে এসেছেন | এখানে তাঁর জন্মদিনের তারিখ কেউ জানে না | অথবা জানলেও কেয়ার করে না | রথীন্দ্র মোহনের তাতে কিছু আসে যায় না | বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট সুখ দুঃখের অনুভূতিগুলো একটু কমে এসেছে | ভাবনা চিন্তাগুলোও এখন একটু অন্তর্মুখী হয়ে এসেছে | মাঝে মাঝেই পুরনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে | সেই বহু পিছনে ফেলে আসা ছেলেবেলা, কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিগুলো মনের আনাচে কানাচে উঁকিঝুকি দেয় | রথীন্দ্র মোহন হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়েন |

আজ কেন জানি না সমরের কথা মনে পড়ল তাঁর | সমর দে – এককালে ওঁর প্রিয় বন্ধু ছিল | ওঁরা একসাথে পানাগড় হাইস্কুলে পড়তেন | সেই ক্লাস ফাইভ থেকে টানা স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত | সমর লেখাপড়া খুব একটা করত না | ওই যতটুকু না করলে নয়, সেই পর্যন্ত | বাকি সময়টা খেলার মাঠেই কাটত | সমরের বাবা ব্রজনাথ দে, সংক্ষেপে বি.এন.ডি. সেই একই স্কুলে সিনিয়র ক্লাসে অঙ্কের মাস্টার ছিলেন | ছোটখাট চেহারা | উচ্চতা পাঁচ ফুট, কাঁচা পাকা চুল | পরনে ধুতি আর লম্বা একরঙা ফুল-হাতা শার্ট | বুক পকেটে দুটো রাইটার পেন | পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো | চোখে বেশ ভারী ফ্রেমের চশমা | এমনিতে আর সব মাস্টারদের মতোই গম্ভীর, কিন্তু মাঝেমধ্যে একটু আধটু রসিকতারও অভাব ছিল না | খুব নস্যি নিতেন এবং চিরকাল একটু ঘড়ঘড়ে গলায় কথা বলতেন, কারণ সর্বদা তাঁর নাক বন্ধ থাকত | ছেলেরা আড়ালে আবডালে ওঁকে 'লাকবদ্ধ' বলে ডাকত | বি.এন.ডি. কোনরকম কূটকচালি, পরনিন্দা বা পরচর্চার মধ্যে থাকতেন না | ক্লাসে কোনদিন চেঁচাতেন না | কিন্তু আশ্চর্যের কথা ওঁর ক্লাসে কেউ কখনো বেয়াদপি বা বাঁদরামিও করত না | অঙ্কের মতো একটা নিরস বিষয়কে উনি বেশ সরস করে তুলতেন | ওঁর শিক্ষকতায় ক্লাসের সবার কাছে কে.সি. নাগের বইগুলো একদম সরল হয়ে গিয়েছিল | ওই যে বাঁদরটা তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে তিন ফুট উঠছে আর পিছলে দু'ফুট নেমে যাচ্ছে, চৌবাচ্চায় প্রতি মিনিটে পাঁচ লিটার জল ঢুকছে, আর দেড় লিটার চৌবাচ্চার ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এক'শ গজ বাই চল্লিশ গজ মাঠের চারিদিক দিয়ে দু'ফুট চওড়া রাস্তা বানাবার খরচা কত, এইসব কঠিন ব্যাপারগুলো বি.এন.ডি.'র পাল্লায় পড়ে বেশ জলভাত হয়ে গিয়েছিল | জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোনমিতি এবং বলবিদ্যা – সেগুলো পর্যন্ত সড়গড় করিয়ে দিলেন বি.এন.ডি. স্যার | সমরের অবশ্য ওইসব ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা ছিল না | বি.এন.ডি.'রও ছিল না | উনি সাফ বলতেন যে এ ছেলের দ্বারা কিস্যু হবে না | সমর নিজেও এ ব্যাপারে তার বাবার সঙ্গে একমত |

রথীন্দ্র মোহনবাবুর মনে পড়ল স্কুল ফাইনালের ঠিক দু'মাস আগে ক্লাসের প্রথম সারির সাতজন ছেলেকে বি.এন.ডি. তাঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন | সমর সে সময় ফুটবলের মাঠে | বি.এন.ডি. বললেন দেখো স্কুলের মান বাঁচানোর দায় তোমাদের ক'জনের হাতে | আমি চাই অন্তত তোমরা ক'জন বর্ধমান জেলায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পাও | তার জন্যে যত খাটতে হয় তোমরা খাটো | আমি বরং রোজ স্কুল ছুটির পর তোমাদের দু'ঘন্টা করে ফ্রীতে অঙ্ক শেখাব | কারণ অঙ্কতে একশোয় একশো তোমাদের সবাইকে পেতেই হবে | এটা আমার দাবি বলতে পারো |

বি.এন.ডি.'র কথার ভেতরে কিছু একটা জাদু ছিল | পরীক্ষার ফল বেরতে দেখা গেল সেই সাতজন ছেলেই লেটার মার্কস্ নিয়ে পাস করেছে | তার মধ্যে তিনজন অঙ্কে একশো তে একশো | বাকি ক'জন পঁচানব্বই থেকে নিরানব্বইয়ের মধ্যে |

আর রথীন্দ্র মোহনের স্থান হয়েছে সব বিষয় মিলিয়ে জেলায় প্রথম | আর বাকিরা প্রথম দশজনের মধ্যেই আছে, ঠিক যেমনটি স্যার চেয়েছিলেন | সারা স্কুলে হৈ হৈ পড়ে গেল | যথাকালে রথীন্দ্র মোহন শিবপুর বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হলেন এবং সসম্মানে ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে একটি নামী সংস্থায় যোগ দিলেন | বাকি বন্ধুরা সব যে যার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল |

ইতিমধ্যে তাঁর বাবা অবসর নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেছেন | কাজেই পানাগড় ফিরে যাওয়ার কোনো কারণ আর রইল না | সমরের সঙ্গে অবশ্য হালকা ধরনের একটা যোগাযোগ থেকেই গেল | বছরে দু'তিনটে চিঠি | কখনো বা একটা বিজয়ার কার্ড | বি.এন.ডি.কে বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম জানাতে

অবশ্য কোনদিন ভোলেননি | কর্মসূত্রে রথীন্দ্র মোহন ভারতের বহু জায়গায় ঘুরলেন | কিন্তু সময় করে পানাগড় যাওয়া আর হয়ে উঠল না | কিছু বছর চাকরি করার পরে বিয়ে, সংসার, সন্তান, পদোন্নতির প্রচেষ্টা – এসব নিয়ে জীবনের গতি প্রকৃতি প্রায় পুরোটাই পাল্টে গেল | পানাগড় হাইস্কুলের স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে আবছা হতে শুরু করল |

চাকরিতে ঢোকার প্রায় বছর দশেক পরে সমরের কাছ থেকে একটা চিঠি এল – 'বাবার পেটে ক্যান্সার ধরা পড়েছে | অনেক দূর এগিয়ে গেছে | তোর নাম করছিল | পারলে একবার আসিস |'

সমর তখন পানাগড় স্টেট ব্যাংকের ক্লার্ক | খুবই জুনিয়র | বিয়ে করেছে অনেকদিন | বছর চারেকের একটি মেয়েও আছে | পৈতৃক ভিটেতে থাকে তাই বাড়িভাড়া লাগে না | মনে হয় খুবই সাধারণ জীবন |

রথীন্দ্র মোহন তখন হায়দ্রাবাদে | ঘাড়ে অনেক দায় দায়িত্ব | হুট বললেই ছুটি পাওয়া যায় না | কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাশ কাটাতে হ'ল | সমরকে একটু ভালরকম টাকা পাঠালেন | 'দেখিস যেন চিকিৎসার কোনও ত্রুটি না হয় | প্রয়োজনে আরো পাঠাব |' রথীন্দ্র মোহন জানতেন ক্যান্সারের চিকিৎসা যথেষ্ট খরচা সাপেক্ষ | সমরের মাইনে এবং স্যারের পেনশন থেকে সে খরচা কোনক্রমেই কুলোবে না | তাই এবার তিনি ইস্কুলের প্রায় হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন | তাদের মধ্যে অনেকেই তখন বিদেশে | ডলারে মাইনে পায় | অর্থ সংগ্রহে অসুবিধে হ'ল না | সকলেই স্যারকে অসম্ভব রকম ভালবাসে | অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর টাকা এসে গেল | সেইসঙ্গে পুরোদমে চিকিৎসাও শুরু হয়ে গেল | রথীন্দ্র মোহনের মনে দোষী ভাবটা একটু কমল |

ইতিমধ্যে হঠাৎই তাঁর বদলি হ'ল নাসিকে | নতুন জায়গা | সবই অচেনা | অজানা ভাষা | নতুন বাড়ি খোঁজা | মেয়েকে নতুন স্কুলে ভর্তি করা | সর্বোপরি চাকুরিস্থলে নিজেকে নতুন করে মানিয়ে গুছিয়ে প্রতিষ্ঠা করা | ছ'টা মাস কোথা দিয়ে যে কেটে গেল রথীন্দ্র মোহন বুঝতেই পারলেন না | এরই মধ্যে মাসে মাসে স্যারের জন্য কিছু টাকা পাঠাতে কিন্তু ভোলেননি | সেদিন সকালে অফিসে ঢুকেই দেখেন টেবিলের ওপর রাখা একটা সাদা খাম | ওপরে এক কোনায় লেখা ৺গঙ্গা | খুলে দেখলেন সমরের পাঠানো | এক সপ্তাহ আগে বি.এন.ডি. সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন | মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল | চোখের কোনায় হয়তো একটু আর্দ্রতার আভাসও দেখা গেল | সেদিন আর অফিসে কোনো কাজে মন বসল না | পানাগড় যেতে খুবই ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তা কিছুতেই আর হয়ে উঠল না | শ্রাদ্ধের খরচা বাবদ কিছু টাকা পাঠিয়ে কর্তব্য সারতে বাধ্য হলেন |

এই ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পরে রথীন্দ্র মোহন কলকাতায় বদলি হলেন | সাদার্ন অ্যাভিনিউতে একটা বড় ফ্ল্যাট নিলেন | ঠিকমতো থিতু হতে আরো ক'মাস সময় লাগল | তারপর এক রোববার ভোরে 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস' ধরে পানাগড় পৌঁছালেন | স্টেশন থেকে একটা অটো ধরে সমরের বাড়ি | ছোটবেলার চেনা জায়গা তাই এত বছর পরেও খুঁজে পেতে অসুবিধে হ'ল না | বহুদিন বাদে দুই বন্ধুর দেখা | পরস্পরের মধ্যে অনেক না বলা কথা, অনেক অব্যক্ত বেদনা, চার-পাঁচ ঘন্টা যেন নিমেষে কেটে গেল | সমরের বউ সুমিতা | সুন্দর ছোটখাট চেহারা | খুবই সাবলীল সুন্দর ব্যবহার | পানাগড় হাইস্কুলে কেমিস্ট্রি পড়ায় | দারুন রাঁধে | শুধুমাত্র ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত খাইয়ে রথীন্দ্র মোহনের মন জয় করে নিল | একটা খুব দামি শাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন ওর জন্য | চোখ দেখেই বুঝলেন বেশ পছন্দ হয়েছে | সমরের মেয়ে মল্লিকা, ক্লাস ফাইভে পড়ে | বয়সের তুলনায় বেশ সপ্রতিভ | অনেক প্রশ্ন তার মাথায় | রথীন্দ্র মোহন তার জন্যে কিছু ভাল বই আর চকলেট নিয়ে গিয়েছিলেন, সেসব পেয়ে তার হাসি আর ধরে না |

এবার ঘরে ফেরার পালা | ডাউন ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসের টিকিট আগে থেকেই কাটা আছে | রথীন্দ্র মোহন সকলের কাছে বিদায় চাইলেন | ওরা সবাই নাছোড়বান্দা | একটা রাত অন্তত থেকে যেতেই হবে | অনেক কষ্টে ছাড় পাওয়া গেল |

সমর বলল, 'চল পুরনো স্কুলটা এক ঝলক দেখে আসবি | তারপর নাহয় আমি তোকে স্টেশনে ছেড়ে দেব |'

সমর বাইকে করে স্কুলে নিয়ে গেল | এই কুড়ি বাইশ বছরে সেই এক কালের খ্যাতনামা স্কুল আজ যেন অতীতের স্মৃতিমাত্র | বহুদিন রং করা হয়নি | এককালের সুন্দর খেলার মাঠে আজ আগাছার রাজত্ব | সব মিলিয়ে একটা হতশ্রী দশা | ভগ্নমনে রথীন্দ্র মোহন আবার বাইকে চড়লেন | স্টেশনের পথে যেতে যেতে সমর বলল, 'হাতে যথেষ্ট সময় আছে, তোকে আর একটা জিনিস না দেখালেই নয় |' বাইকটা এগলি সেগলি ঘুরে একটা

ফুটবল মাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল | মাঠের দক্ষিণদিকে একটা চার পাঁচকাঠা জমির ওপরে প্রায় তিন হাজার স্কোয়ার ফুটের একতলা বাড়ি | ওপরে একটা সাইন বোর্ডে লেখা "ব্রজনাথ ইনস্টিটিউশন"|

রথীন্দ্র মোহন হতবাক হয়ে সমরের দিকে তাকালেন | 'এটা কী ব্যাপার?'

সমর বলল, 'আগে ভেতরে চল |' ভেতরে গিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখাল | দুটো বড় হলঘর | প্রথম হলঘরের দেওয়ালে বি.এন.ডি. স্যারের বড় একটা বাঁধানো ছবি | তাতে তাজা ফুলের মালা ঝুলছে | একটা করিডোর | সেখানে দুটো স্টীলের আলমারি | করিডরের একপাশে ছোটখাট অফিস ঘর | অন্যপাশে বাথরুম |

একটা হলঘরে সারি সারি বেঞ্চি ও টেবিল | সামনে ব্ল্যাকবোর্ড | উঁকি দিয়ে বুঝলেন অঙ্কের ক্লাস চলছে | অন্য হলঘরে গোটা দশেক টেবিল, চেয়ার | প্রতিটি টেবিলে একটা করে কম্পিউটার | ছেলেমেয়েরা নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে |

সমর বলল, 'বাবার চিকিৎসার খরচা বাবদ সব বন্ধুরা মিলে প্রায় তেরো লাখ টাকা পাঠিয়েছিল | বাবা হুট করে আমাদের ছেড়ে যাওয়াতে সেই টাকার একটা মোটা অংশই বেঁচে যায় | সস্তায় এই জমিটা পেয়ে গেলাম | তারই ওপর এই বাড়ি | আমার ব্যাংকের পুরনো বাতিল করা, কিন্ত চালু কম্পিউটারগুলো নিলামে জলের দরে বিক্রি হচ্ছিল | সেখান থেকে দশটা কম্পিউটার কিনে নিলাম | চেয়ার টেবিলগুলো পর্যন্ত নিলামে কেনা | এখানে আমরা ক্লাস ইলেভেনের গরিব কিন্তু মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের বিনা পয়সায় অঙ্ক আর কম্পিউটার চালানো শেখাই | মাস্টাররা সবাই উঁচুদরের শিক্ষক | কিন্তু কেউ এখানে কোন মাইনে নেন না | গত পাঁচ বছরে আমাদের পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী হায়ার সেকেন্ডারিতে অঙ্কে একশোয় একশো পেয়েছে | তার মধ্যে সাঁইত্রিস জন আই.আই.টি, যাদবপুর বা শিবপুরে ঢুকেছে | বাদ বাকিরাও মোটামুটি ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হচ্ছে | ওদের নিয়ে আমরা সবাই খুবই গর্বিত | বাবা চিরকাল বলতেন তোর দ্বারা কিস্যু হবে না | কিন্তু উনি মেধাবী ছাত্রদের খুব স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন | বলতেন এরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ | আমিও আজ সেটা বিশ্বাস করি | বাবার অসমাপ্ত কাজকে যেন চিরকাল চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি সেই প্রার্থনা কর |'

রথীন্দ্র মোহন একাধারে আপ্লুত ও বাক্যহারা | সমরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন | বললেন, 'আমরা সবাই কেবল চাকরি করছি | কিন্তু তুই একটা সত্যি কাজের কাজ করছিস |'

সমরের অনুরোধে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে দুকথা বললেন | বি.এন.ডি. স্যারের সেই পুরনো গল্পটা শোনালেন |

তারপর ধীর গতিতে বেরিয়ে সমরের বাইকে চড়লেন | ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে |

ফিরে পাওয়া

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যে ঘটনার কথা লিখতে যাচ্ছি, তা যেমন আশ্চর্যের তেমনই অবাস্তব | গত বছর আমি সস্ত্রীক কলকাতায় কয়েক মাসের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম | আমরা প্রায়ই এরকম দেশে বেড়াতে যাই | সেখানে সবকিছু বড় ভাল লাগে | শৈশব আর যৌবনের দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে | ওখানে গেলে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কের কাজে বেরোতে হয় | বেশিরভাগ সময়ই ওই ফরেন কারেন্সি এক্সচেঞ্জের জন্য |

এমনই একদিন ব্যাঙ্কের মধ্যে বসে আছি আমার ডাক আসার অপেক্ষায় | হঠাৎ মনে হ'ল আমার পাশে যিনি বসে আছেন, তাঁকে হয়তো আমি চিনি | আমাদের পাড়ার একজন বন্ধু, যার সঙ্গে বহু বছর দেখা হয়নি | অবশ্যই বয়সের ভারে চেহারাটা ভেঙে গেছে | কিন্তু তার সেই বিখ্যাত মোটা ফ্রেমের চশমা এখনও টিকে আছে | ওর নামটা মনে পড়তে কয়েক মিনিট সময় লাগল কিন্তু মনে এসে গেল | আমি ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে লাল্টু, চিনতে পারছিস?" লাল্টু প্রথমে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত; তারপরে বলে উঠল, "আরে, দিলীপ যে! কেমন আছিস? সব খবর ভাল তো?" তারপর হঠাৎ বলল যে আমার চেহারায় নাকি খুব একটা পরিবর্তন হয়নি | ভাবতে ভালই লাগল, এই দীর্ঘ এতগুলো বছর পরেও আমি কিনা বিশেষ বদলাইনি! এতদিন পর লাল্টুর দেখা পেয়ে ওকে ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না | তাই জিজ্ঞেস করলাম, "যাবি নাকি একটা কফি কর্নারে? সেখানে বসে কিছু পুরনো কথা মনে করে নেওয়া যাবে |" আমরা গেলাম কফি কর্নারে | ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে অনেক স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম | একথা সেকথার পরে হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমাদের পাড়ার বিখ্যাত প্রেমিক, সুব্রতর কথা | সে আমাদেরই পাড়ার এক খুব সুন্দরী মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেত | যতদূর মনে পড়ে মেয়েটির নাম পর্ণা | লাল্টুকে জিজ্ঞেস করলাম, "হ্যাঁরে, সেই বিখ্যাত প্রেমিক প্রেমিকার কোনও খবর রাখিস?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে সে বলল, "সে এক নাটক নভেলের ঘটনা | সেসব বলতে গেলে সময় লাগবে |" আমি বললাম, "বেশ তো, ভাবিস না, আমি গিন্নিকে ফোন করে বলে দিচ্ছি যে আমার ফিরতে দেরি হবে | তুই শুরু কর সেই অদ্ভুত কাহিনী |" আর এক প্রস্থ কফিও অর্ডার করলাম |

লাল্টুর কাছে যা শুনলাম, সে এক আশ্চর্য ঘটনা | সুব্রত কলেজ থেকে বিএসসি পাস করে একটা কম্পানির সেলসে কাজ পেল, সঙ্গে ভাল মাইনে | তবে ওকে ট্রেনিং-এ কয়েক মাসের জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হবে | সুব্রত পর্ণাকে জানাল তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা | পর্ণার বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলে মৌন সম্মতিও পেল | যাইহোক, যথা সময়ে সুব্রত কলকাতা ও পর্ণাকে ছেড়ে রওনা দিল বম্বের উদ্দেশ্যে | প্রথমদিকে মাঝে মাঝে সুব্রত দু'একটা চিঠি পেত পর্ণার কাছ থেকে, তবে ও নিজে মাসে চার-পাঁচটা চিঠি লিখত তাকে | সেসব চিঠিতে শুধুই লেখা থাকত যে তার কিছুই ভাল লাগছে না, দিন কাটতে চাইছে না | কেবল অপেক্ষা করে আছে সেই দিনের জন্য, যখন সে ট্রেনিং সেরে কলকাতায় ফিরবে | আর তার কিছুদিনের মধ্যেই পর্ণাকে বিয়ে করে চিরজীবনের মতো তাকে আপন করে পাবে |

অবশেষে দীর্ঘ চার মাস পরে সুব্রত কলকাতায় ফিরে এল | ভেবেছিল ওর আসার অপেক্ষায় পর্ণা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে | ওরা দুটো বাড়ি অন্তর থাকত | কিন্তু পর্ণাকে কোথাও দেখতে পেল না সে | সুব্রত ভাবল হয়তো বাড়িতে গেলে দেখা পাবে, কেননা পর্ণা মাঝে মাঝেই ওদের বাড়িতে যেত | বাড়ির সামনে যখন ট্যাক্সি থেকে নামল, দেখল বাবা-মা ভাইরা সব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওকে স্বাগত জানাতে | কিন্তু সেখানেও পর্ণাকে দেখা গেল না | সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মাকে একা পেয়ে সে পর্ণার কথা জিজ্ঞেস করল | মা'র কাছে জানতে পারল যে পর্ণার প্রায় দু'মাস আগে বিয়ে হয়ে গেছে একজন খুব ভাল ছেলের সঙ্গে | প্রচুর রোজগার করে | দার্জিলিংয়ের কাছে একটা চা বাগানের ম্যানেজার | নিজস্ব বিরাট কোয়ার্টার, চাকর, মালী – আরো কত কী!

সুব্রত মাকে জিজ্ঞেস করল, "পর্ণা দার্জিলিংয়ে যাবার পর আর একবারও কি কলকাতায় আসেনি?" সুব্রতর মা জানালেন – এসেছিল, একমাথা সিঁদুর, লাল বেনারসী আর গয়নাগাঁটি পরে | প্রণাম করে বলেছিল, "মাসিমা, আমি আর পারলাম না | বাবা-মা যেভাবে দিব্বি দিয়েছেন যে আমাকে বাধ্য হয়ে রাজি হতে হ'ল | আপনি আমার হয়ে সুব্রতকে বলবেন | আমি সারা জীবনের মতো অপরাধী হয়ে রইলাম ওর কাছে |"

ঘটনার এই অবধি যা শুনলাম – সেরকম অনেক সময়ই জীবনে

ঘটে, যার প্রতিফলন আমরা সিনেমা, গান বা কবিতায় দেখেছি। গল্পের সবটা শোনা হয়ে গেছে ভেবে আমি যখন উঠতে যাব, তখন লাল্টু বলল, "এর পরে যা ঘটেছিল সেটাই আসল গল্প। অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য ঘটনা! এর কয়েক বছর পর সুব্রত একটা Cargo Ship-এ কাজ নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। দীর্ঘদিন সেখানে চাকরি করার পর কাজে অবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে। ডোভার লেনে বিরাট একটা ফ্ল্যাট কিনে অকৃতদার হয়ে একলাই থাকে। নিজের জীবনে সুব্রত পর্ণা ছাড়া আর কাউকে স্ত্রীর স্থান দেবার কথা ভাবতেই পারেনি।

বছর কয়েক আগে সুব্রত দার্জিলিংয়ে যাচ্ছিল। জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থামলে সে ট্রেন থেকে নেমে এক চা-ওয়ালার কাছ থেকে চা নিয়ে খেতে খেতে দেখল কাছেই একটা বইয়ের স্টলে সেদিনের খবরের কাগজ রয়েছে। চা শেষ করে সুব্রত এগিয়ে গেল সেদিকে কাগজ কিনতে। দাম দিতে গিয়ে দেখল একজন ভদ্রমহিলা টাকাটা নিলেন। দেখে মনে হ'ল তাঁর শরীর খুব দুর্বল, চুলে যেন সাদা কাশফুল ফুটেছে। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখে এমন চমকে উঠল যে কাগজটা তার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। এ যে পর্ণা! মাথায় সিঁদুর নেই, হাত খালি, চোখের কোল বসে গেছে, মুখে ম্লান হাসি। শুধু বলল, "পারো তো আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি তোমায় ভুলিনি সুব্রত। তুমি সুখে আছ তো?"

সুব্রতর দুচোখে জল ভরে এল, পর্ণারও চোখ বেয়ে নেমে এল ধারা। সুব্রত ওর হাতদুটো ধরে বলল, "না গো, আজও আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। ভেবেছিলাম দেখা হলে জিজ্ঞেস করব কেন তুমি আমার জন্য আর একটু অপেক্ষা করলে না। তবে আজ এই মুহূর্তে আর কিছু শুনতে চাই না। শুধু বলো, তোমার কী করে এই অবস্থা হ'ল।"

পর্ণা উত্তরে বলেছিল যে তার স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধি, ক্যান্সারের চিকিৎসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তার মৃত্যুর পর নিজের সামান্য কিছু গয়না বিক্রি করে সে এই দোকানটা কেনে, আর সেখান থেকে যতটুকু রোজগার হয় তাই দিয়েই তার দিন চলে। সব শুনে সুব্রত বলল, "এই মুহূর্তে তুমি চলো আমার সঙ্গে।"

পর্ণা বলে, "সে কী করে হবে? আমার এই দোকানের কী হবে? আর আমি যাবই বা কেন তোমার সঙ্গে?"

সুব্রত বলে, "সেকি, তোমার ঘর যে অপেক্ষা করে আছে কবে তুমি আসবে বলে! আমি এক্ষুণি ওই চা-ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করছি, সে এই দোকানটা বিনা পয়সায় নিতে চায় কিনা।"

আচমকা এরকম একটা প্রস্তাবে চা-ওয়ালা যারপরনাই অবাক হলেও সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আর সেদিনেরই সন্ধ্যার ট্রেনে সুব্রত ও পর্ণা কলকাতায় ফিরে এল।

কলকাতায় সুব্রতর ফ্ল্যাট বাড়িতে ফিরে পর্ণা দেখল সারা বাড়ির দেওয়াল জুড়ে তার ছবি সাজানো আছে। আলমারিতে থরে থরে নতুন শাড়ি রাখা, আলমারির ভিতর লকার বাক্সে তার জন্য নানারকম গয়নাও রয়েছে। পর্ণা বলল, "তুমি সেই একই রকম পাগল রয়ে গেছ, একটুও বদলাওনি।"

সুব্রত পর্ণাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, "বদলাব কী করে বলো, তাহলে তুমি আমায় চিনতে কী করে?"

সেই রাতের পূর্ণিমার চাঁদ মনে হচ্ছিল যেন খুব বেশি উজ্জ্বল।

আমাদের গল্প ফুরোল। ইতিমধ্যে লাল্টুর আর আমার আরো কয়েক কাপ কফি খাওয়া হয়ে গেছে।

জন্মদিন

অশোক বড়াল

তেলটা গরম হয়েছে দেখে শর্মিলা যেই মাছটা ছাড়ল, ঠিক তখনই ফোনটা বেজে উঠল | উল্টোদিকে সুমিতার গলা, "শর্মিলাদি, আজ আমার জ্যাঠতুতো দাদা এসেছেন ডালাস থেকে | তা কাল তো রিনির জন্মদিনের পার্টি |"

- আরে ভাল তো, এসেছেন যখন নিয়ে আয় তোদের সঙ্গে | খুব আনন্দ হবে |

- না, মানে তোমাদের অসুবিধে হবে না তো?

- দূর পাগলি, তোর দাদা-বৌদিকে নিয়ে আয়, দুজনের জন্যে কোনো অসুবিধে হয় নাকি?

- না, দাদা একাই, বিয়ে করেননি | দেশ থেকে এসেছেন অফিসের কাজে | আমার এখানে দুদিন থেকে সোমবারই দেশে ফিরে যাবেন |

- তুই তোর দাদাকে নিয়ে আয়, কোনো অসুবিধে হবে না | বরং একটু দেশের গল্প শোনা যাবে |

শর্মিলা আর সুব্রতর একমাত্র মেয়ে রিনি | তারই আঠারো বছরের জন্মদিন আগামীকাল, মানে শনিবার | রিনি শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা পৌঁছাবে | আবার সোমবার সন্ধ্যেবেলার ফ্লাইটে পিটসবার্গ ফিরে যাবে | মনে হচ্ছে রিনি যেন কতদিন পরে বাড়ি আসছে | সেই আগস্টের শেষে শর্মিলা আর সুব্রত রিনিকে কলেজে রেখে এসেছিল | তারপর রিনির এই প্রথম বাড়িতে আসা | অধীর আগ্রহে শর্মিলা আর সুব্রত এই জন্মদিনের জন্যে অপেক্ষা করে ছিল | যাক, আজ রিনি আসবে |

সন্ধ্যেবেলা সুব্রত রিনিকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল | তাকে দেখে শর্মিলার কী আনন্দ! মনে হ'ল কতদিন দেখেনি মেয়েকে | ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল | তারপর ওর হাত টিপে বলল, "তুই দুদিনে কত রোগা হয়ে গেছিস |"

তখন রিনি একটু রেগেই উঠল, "মা, কী যে বলো, দুদিনে কেউ রোগা হয়?"

যাইহোক, সারা বাড়িতে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল | তার ওপর আবার কাজেরও শেষ নেই | কাল রিনির জন্মদিন বলে ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করেছে শর্মিলা | একা হাতেই সব রান্না করছে | খালি কেকটা সুব্রত এক সময়ে গিয়ে নিয়ে আসবে |

শনিবার যখন একটু একটু অন্ধকার হতে আরম্ভ করেছে, তখন সকলে একে একে আসতে শুরু করলেন | প্রথমেই এলেন অজিতদা, তাঁর স্ত্রী প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে | অজিতদা বরাবরই খুব punctual, সব সময়ে ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে আসবেন | তারপর এলেন বিমলবাবু ওঁর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে | ওঁদের মেয়ে রিনির চেয়ে এক বছরের ছোট, কিন্তু খুব বন্ধু ওরা | এলেন নির্মল সরকার, তাঁর স্ত্রী আর বারো বছরের ছেলে | সবার শেষে এল সুমিতা, ওর স্বামী কমল আর জ্যাঠতুতো দাদাকে নিয়ে |

এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে | সুমিতাই ওর দাদাকে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, "এই হচ্ছে আমার জ্যাঠতুতো দাদা, প্রণব দত্ত | অফিসের কাজে ডালাসে এসেছিলেন | আমার এখানে উইকএন্ডটা কাটিয়ে সোমবার দেশে ফিরে যাবেন |"

সুব্রত সাদর অভ্যর্থনা করল, "আরে, আসুন,আসুন | সুমিতা আমাদের ছোট বোনের মতো, আমরা খুব খুশি হয়েছি যে আপনি এসেছেন |"

শর্মিলা তখন রান্নাঘরে, লাউচিংড়িটা রেফ্রিজারেটর থেকে বার করে ওভেনে রাখতে যাচ্ছিল | প্রণব দত্ত নামটা শুনে একটু চমকে উঠল | তাড়াতাড়ি হাতটা মুছে বাইরের ঘরে এসে দেখে সবাই "নাইস টু মিট ইউ" বলে হ্যান্ডশেক করছেন | সুব্রতই আলাপ করিয়ে দিল, "শমি, এই দেখো, ইনি প্রণব দত্ত, সুমিতার দাদা |"

- নমস্কার –

- নমস্কার |

দুজনে দুজনকে অভ্যর্থনা জানালেন | শর্মিলাই সুব্রতকে তাড়া দিল, "তুমি সকলকে ড্রিঙ্কস অফার করেছ?" .

- আরে হ্যাঁ, তাই তো, একদম ভুলেই গেছি | কে কী নেবেন বলুন, আমার কাছে মোটামুটি সবই আছে |

প্রত্যেকেই নিজের নিজের পছন্দের ড্রিংকস জানালেন | কেউ স্কচ ভালবাসেন, আবার কেউ বা চান রেড ওয়াইন |

প্রণববাবু বললেন, "আমাকে একটু ডায়েট কোক দিন |"

- আরে, সেকি! দেশে তো সবাই স্কচ পছন্দ করে | দিই একটু সোডা কিংবা বরফ দিয়ে? সুব্রত বোধহয় একটু জোর করারই চেষ্টা করল |

প্রণববাবু আবার বললেন, "না, আমি এখন ড্রিংক করি না | আপনি

আমাকে কোক বা পেপসি – যেটা আছে দিন।"

- ঠিক আছে, কোকই দিচ্ছি। সুব্রত ব্যস্ত হয়ে সকলকে ড্রিঙ্কস দিতে লাগল।

তারপর যা হয়, বাঙালির আড্ডা জমে উঠল। পলিটিক্স, স্পোর্টস, সিনেমা, কিছুই বাদ যায় না। পলিটিক্স নিয়ে একটু তর্কও লেগে গেল। সবাই উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করছেন, প্রণববাবু শুধু বসে চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন। একবার ওঁকে আলোচনায় যোগ দেওয়ানোর চেষ্টা করা হ'ল, কিন্তু বোঝা গেল আমেরিকার পলিটিক্স, স্পোর্টস এসব ব্যাপারে ওঁর খুব একটা উৎসাহ নেই।

তারপর যখন সোমবার রিনির কলেজে ফিরে যাবার প্রসঙ্গ উঠল, সুব্রত বলল যে ওকে সোমবার সকালেই অফিসের কাজে শিকাগোয় যেতে হবে। শর্মিলাই রিনিকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।

তখন সুমিতা বলল, "শর্মিলাদি, যদি আমার একটু উপকার করো, দাদাকেও সোমবার নিউয়ার্কে পৌঁছে দিতে হবে পাঁচটার সময়। আমার সেইদিনই তিনটের সময় ডেন্টিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তার অফিস আবার এখান থেকে চল্লিশ মিনিটের রাস্তা। কী যে করি! এই ডেন্টিস্ট এত ব্যস্ত, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে এক-দেড় মাস বসে থাকতে হয়।"

সুব্রতই বলে উঠল, "না, না, তুমি কোনো চিন্তা করো না। শমি যখন রিনিকে নিয়ে যাবে, তোমার দাদাকেও এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে।"

সেই রকমই ঠিক হ'ল, সুমিতা ডেন্টিস্টের অফিস যাবার পথে প্রণবকে শর্মিলার বাড়ি পৌঁছে দেবে।

সোমবার এসে গেল। যেমন কথা হয়েছিল, সুমিতা প্রণবকে শর্মিলার বাড়ি পৌঁছে দিতে এল।

- রিনি কোথায়?

- রিনি ওর স্কুলের বন্ধু এমিলির বাড়ি গেছে। ও Rutgers-এ পড়ে, রিনির সঙ্গে দেখা করবে বলে সেও বাড়ি এসেছে। একটু পরেই রিনি চলে আসবে।

একটু বসে সুমিতা বেরিয়ে পড়ল।

শর্মিলা প্রণবকে বলল, "চলো, ডেকে গিয়ে বসি।"

শরতের শেষ, হেমন্তের শুরু, আকাশে হালকা মেঘ। দুটো চেয়ার টেনে শর্মিলা আর সুব্রত বসল। অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর প্রণবই প্রথম মুখ খুলল, "এভাবে কখনো দেখা হবে ভাবিনি।"

শর্মিলা চুপ করে রইল। প্রণব আবার কিছু একটা বলতে হবে ভেবে বলল, "কেমন আছ?"

- ভালই, দেখতেই তো পাচ্ছ। তুমি কেমন আছ?

- ভাল।

- তুমি কবে থেকে পুনায়?

- অনেকদিন। তুমি আমেরিকা চলে গেলে। কলকাতাতে আর কিছুতেই মন বসাতে পারছিলাম না। অফিসে বলে একটা ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেলাম কলকাতার থেকে অনেক দূরে, হাজারীবাগে। ওখানে আমাদের একটা কেমিক্যাল প্ল্যান্ট আছে, সেখানে কিছুদিন ছিলাম। তারপর কলকাতাতে ফিরে এসে আবার মন বসল না। চাকরি পাল্টে নতুন চাকরি নিয়ে পুনাতে চলে গেলাম। তারপর থেকে ওখানেই আছি। ভালই আছি, চলে যাচ্ছে।

- ভাল, খুব ভাল।

- তোমাদের রিনি খুব ভাল মেয়ে।

- হ্যাঁ, এতদিন ওকে নিয়েই সারাটা দিন কেটে যেত আমার, এখন ও কলেজে, সারাদিন বড় ফাঁকা লাগে। সুব্রত তো দিনরাত কাজ নিয়েই ব্যস্ত। আমার চাকরি বাকরি করতে ভাল লাগে না। সারাদিন এটা ওটা নিয়ে কেটে যায়।

প্রণব কি বলবে না ভেবে পেয়ে একই কথা আবার বলল, "তুমি আর সুব্রত খুব সুন্দর মেয়ে পেয়েছ; কী ভালভাবে মানুষ করছ!"

শর্মিলা চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ কেটে গেল, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে প্রণবের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ও সুব্রতর মেয়ে নয়।"

প্রণব একদম হকচকিয়ে গেল। কী বলবে বুঝতে পারল না, শুধু বলল, "তার মানে?"

শর্মিলা মাথাটা নিচু করে আঁচলের প্রান্ত আঙুলে পেচাঁতে পেচাঁতে বলল, "মানে, মানে রিনি সুব্রতর মেয়ে নয়। কারণ... কারণ সুব্রত বাবা হতে পারবে না।"

প্রণব পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে পারল না। খানিকক্ষণ পরে বলল, "তাহলে ও কার মেয়ে?"

- জানি না, আমরা ওকে কলকাতা থেকে adopt করে এনেছি।

প্রণব এতদিন পরে দেখা হয়ে যে এইরকম একটা অকল্পনীয় পরিস্থিতিতে পড়বে তা ভাবতেও পারেনি। খালি বলল, "কবে adopt করেছ?"

- তখন ওর আটদিন বয়স।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "মাদার টেরেসার মিশনারি থেকে।"

- সেকি? ওর বাবা-মা'র কোনো পরিচয় জানো?

- খুব একটা নয়, ওর মা এক আদিবাসী মেয়ে, নাম বোধহয় মুন্না।

- মুন্না?

- হ্যাঁ, আমরা রিনিকে নিয়ে আসার পরদিন থেকে তার কোনো খোঁজ কেউ পায়নি, কোথায় যে চলে গেল কেউ জানে না। আমরা রিনিকে নিয়ে চলে এলাম। তারপর মিশনারিতে যতবার খোঁজ করেছি, কেউ বলতে পারেনি কিছুই।

- আর ওর বাবা?

- মিশনারিতে কেউ জানে না। শুধু এইটুকু জানতে পেরেছে যে সে ভদ্রঘরের ছেলে।

প্রণব হঠাৎ কিসের যেন হিসেব করে নিল, "কাল ছিল ওর জন্মদিন?"

- হ্যাঁ, দশই অক্টোবর।

- ওর জন্ম দশই অক্টোবর?

- হ্যাঁ, উনিশ'শ আটাত্তর সালে।

- দশই অক্টোবর, উনিশ'শ আটাত্তর। প্রণব আরো বলতে থাকল, "মুন্না, আদিবাসী মেয়ে?" তারপর আর একটু থেমে বলল, "আমি ওদের মাদার টেরেসার মিশনারিতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।"

- তার মানে?

- শর্মিলা, শর্মিলা – ও আমার মেয়ে।

- এ তুমি কী বলছ?

প্রণব চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেলিংয়ের ধারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শর্মিলা কিছুই না বুঝে চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ বাদে প্রণব মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি অনেক পাপ করেছি, শর্মিলা। কিন্তু তার ফল যে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে এ আমি ভাবতেই পারছি না।"

- কী বলছ তুমি? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রণব চেয়ারে ফিরে এসে বসল। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, "কী বলব শর্মিলা, এ আমার অন্যায়, এ মহাপাপ কাউকে বলার নয়।"

- তুমি কী বলতে চাইছ, আমি কিছুই বুখতে পারছি না।

- শর্মিলা, আমি পারছিলাম না, আমি আর পারছিলাম না। আমি ব্রাহ্মণ নই বলে তোমার বাড়ি থেকে জোর করে তোমার বিয়ে দিয়ে আমেরিকাতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যে পারছিলাম না, শর্মিলা, আমি পারছিলাম না।

শর্মিলা মাথা নিচু করে বসে রইল। একটু পরে প্রণব আবার বলল, "অফিসে বলে হাজারীবাগে ট্র্যান্সফার নিয়ে চলে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে, সভ্যতার বিশেষ কোনো বালাই নেই। সঙ্গী বলতে কেবল মদের বোতল। সারাদিন কাজ, আর সন্ধ্যেবেলা সব ভুলে যাবার জন্যে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতাম। একটি আদিবাসী মেয়ে ছিল, সেই রান্না করে দিয়ে রাত্রে চলে যেত।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, "একদিন রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। ওর বাড়ি যাবার উপায় নেই। বললাম পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে। মাঝরাতে উঠে দেখি..."

প্রণব আর বলতে পারল না। চুপ করে রইল। শর্মিলাও চুপ।

খানিকক্ষণ পরে প্রণব আবার বলল, "আমি জানতাম না শর্মিলা, আমার মধ্যেও এরকম একটা জানোয়ার আছে, নেশাগ্রস্ত শরীর, আমি যে কী করছি তার কোনো জ্ঞানই নেই।"

আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "জানলাম কয়েকদিন বাদে, মুন্না যখন এসে বলল যে ও অন্তঃসত্ত্বা। আমার মাথায় বজ্রাঘাত, কী করেছি আমি ইতরের মতো!"

তারপর আবার একটু থেমে বলল, "ওকে কলকাতায় নিয়ে এলাম, চেনা বন্ধু ছিল, ডেলিভারি করালাম। ওর তো যাবার কোনো জায়গা নেই। তাই মাদার টেরেসার মিশনারিতে নিয়ে গেলাম। অন্তত কয়েক দিনের ব্যবস্থা হবে। দু'দিন পর পর গিয়ে খোঁজ নিতাম; ওরা চাইত না আমি যাই। তারপর একদিন গিয়ে শুনি যে আমার মেয়েকে কেউ যেন adopt করে আমেরিকা নিয়ে চলে গেছে। আর মুন্নারও কোনো খবর নেই। ও কোথায় গেছে কেউ জানে না, বেঁচে আছে কিনা তাও জানে না।"

ওর জীবনটাও আমি নষ্ট করলাম। ও যদি মরে গিয়ে থাকে, সে মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। কী শয়তান লোক আমি! আমি যে কতগুলো জীবন নষ্ট করেছি!"

দুজনেই অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। তারপর প্রণবই আবার বলল, "শর্মিলা, তোমাদের জন্যে ওই ফুটফুটে মেয়েটার জীবন বেঁচে গেছে। তোমরা ওকে সব দিয়েছ, ওকে মানুষ করে তুলেছ। যে পাপ আমি করেছি সে পাপের সৎকার তুমি আর সুব্রত করছ।"

এতগুলো কথা বলার পর প্রণব রুমালটা মুখে চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

শর্মিলা পাথরের মতো বসে সব শুনছিল, কিছুই যেন বিশ্বাস

করতে পারছিল না | ওর প্রণব, যার সঙ্গে একদিন সংসার করার অনেক স্বপ্ন দেখেছিল, সে এভাবে নিজের জীবন আর অন্যের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে! কিন্তু ওর রিনিকে শর্মিলা পেয়েছে | রিনিকে অন্ধকার থেকে তুলে এনে শর্মিলা আর সুব্রত জীবনে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিয়েছে | সে রিনি এখন শর্মিলা আর সুব্রতর | প্রণব আর মুন্নার সঙ্গে ওর জীবন যে দুঃস্বপ্নের মতো, সে কথা রিনি জানে না | কোনোদিনও জানবে না | রিনির সামনে উজ্জ্বল ভবিষৎ, সেটাই হবে ওর পরিচয় |

খনিকক্ষণ পর শর্মিলা বলল, "রিনিকে আমরা নিজের মেয়ের মতো করেই মানুষ করেছি | ও যদি আমার গর্ভে আসত তাহলে যেমন আদর আর ভালবাসা পেত, যেরকম আশা, আকাঙ্ক্ষা পেত তার থেকে এতটুকুও অন্যরকম রিনির ক্ষেত্রে হয়নি | ও আমার মেয়ে, আরো দশটা মায়ের মেয়ের মতোই ও আমার মেয়ে |"

প্রণব চুপ করে রইল | এটা ভেবে ভাল লাগছিল যে, যে মেয়েটা এভাবে পৃথিবীতে এল, শর্মিলা আর সুব্রতর উদারতায় তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়নি |

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শর্মিলা বলল, "প্রণব, ওর জন্ম হয়েছিল লালসায় না ভালবাসায় সে আমি ভাবতেও চাই না | আমাদের জীবনে সে অনাহুত নয় | আমি আর সুব্রত মনে-প্রাণে সন্তান চেয়েছিলাম | ঠাকুর আমার গর্ভে সন্তান দেননি, কিন্তু রিনিকে দিয়েছেন | প্রণব, ওকে পেয়ে আমাদের জীবন কী ভীষণ আনন্দে ভরে উঠেছে, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না | আঠারো বছরের প্রতিটা দিন এক একটা আনন্দের সম্ভার | ওকে নিয়ে আমাদের কত স্বপ্ন! কত আশা! প্রণব, রিনি আমাদের জীবনে কী পরিবর্তন এনেছে তা বলে বোঝানোর নয়, তবে জেনে রাখো ও আমাদের জীবনে নতুন মানে এনে দিয়েছে |"

আধো কান্নার মধ্যে এতগুলো কথা বলে শর্মিলা আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দিল | একটু থেমে আবার বলল, "প্রণব, একদিন তোমার সঙ্গে সংসার করার কত স্বপ্ন দেখতাম, একসাথে ছেলেমেয়ে মানুষ করব, সেকথাও ভেবেছি | কিন্তু অদৃষ্টের কী পরিহাস দেখো যে সুব্রত অক্ষম, আর তোমার বায়োলজিক্যাল মেয়েই এখন আমাদের মেয়ে, তাকেই আমরা মানুষ করছি | জানি না বিধাতার এ কী খেলা! রিনি একদিন অনেক বড় হবে, সব অন্যায় অবিচারের অনেক উর্ধ্বে ও উঠবে; আর আমার রক্ত না হলেও তোমার রক্ত ওর মধ্যে থাকবে |"

"মা, আমি এসে গেছি |" দরজার কাছে রিনির গলা | রিনি পেছনের ডেকে এসে প্রণবকে দেখে বলল, "কাকু, তুমিও এসে গেছ?"

প্রণব বলল, "হ্যাঁ, এসে গেছি | তুমি কেমন আছ রিনি? কলেজে যাবার জন্যে রেডি?"

- হ্যাঁ, রেডি, গিয়ে আবার পড়ার চাপ | দুদিন পরেই একটা টেস্ট আছে |

- কলেজ কেমন লাগছে তোমার?

- ভাল, খুবই ভাল, তবে বেশ প্রেশার আছে |

শর্মিলা বলল, "তোমরা বোসো, আমি একটু কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুরদম বানিয়েছি, নিয়ে আসছি |"

- কড়াইশুঁটির কচুরি আমার খুব প্রিয় – রিনি বলল |

প্রণব বলতে যাচ্ছিল, আমারও – তারপর কী ভেবে থেমে গেল, কিন্তু তারপর বলেই ফেলল |

শর্মিলা ভেতরে চলে গেল | প্রণব ভাবতেই পারছে না – যে মেয়েকে সে আঠারো বছর আগে পরিত্যাগ করেছে, আজ আঠারো বছর পরে আমেরিকাতে বসে তার সঙ্গে গল্প করছে | তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করছে | ঈশ্বর ওর পাপের শাস্তি যথেষ্টই দিয়েছেন; নিজের অপরাধ বোধ ওকে দিনের পর দিন কুরে কুরে খেয়েছে | ওর সেই অন্যায়ের কোনো প্রায়শ্চিত্ত নেই | কিন্তু শর্মিলা আর সুব্রতর কাছে প্রণব অপরিমেয় কৃতজ্ঞ | প্রণব কী বলবে জানে না | শুধু এইটুকু জানে, যে সত্য পৃথিবীর চোখের আড়ালে থেকে গেছে, সে আড়ালেই থাকবে চিরকাল | শুধু প্রণব আর শর্মিলা ছাড়া কেউ জানবে না রিনির জন্মের খবর |

রিনি একেবারে কথার ফুলঝুরি, "কাকু, তোমার আমেরিকা কেমন লাগল?"

- খুব ভাল |

- যেমন আশা করেছিলে, সেইরকমই?

- না, না, আমার আশার চেয়ে অনেক বেশি ভাল |

রিনি অনেক বিস্তারিতভাবে কলেজের কথা, হাই স্কুলের কথা – সব বলে গেল, আর প্রণব মুগ্ধচোখে তাকিয়ে শুনে গেল |

তারপর যখন কচুরি-আলুরদম আর চা শেষ হ'ল, রিনি বলল, "কাকু, তুমি বোসো, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে দশ মিনিট লাগবে, তারপর আমরা বেরোব |"

নিউয়ার্ক এয়ারপোর্ট শর্মিলার বাড়ির থেকে আধ ঘন্টার রাস্তা |

গাড়ি চালাতে চালাতে শর্মিলা শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করল, "Thanksgiving -এ আসার টিকিট কেটেছিস?"

- গিয়েই কাটব।

রিনি পুরো রাস্তাটাই শর্মিলার পাশে বসে অনর্গল কথা বলে গেল। আর প্রণব পিছনের সিটে বসে প্রতিটা কথা যেন অমূল্য সম্পদের মতো যত্ন করে নিজের মনের খাতায় জমিয়ে রাখল।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে রিনি আর প্রণব যখন একসাথে সিকিউরিটি পার হয়ে গেল, শর্মিলা ওদের দিকে তাকিয়ে আর নিজের চোখের জল আটকে রাখতে পারল না। কিন্তু রিনি আর প্রণব তখন এগিয়ে গেছে, দেখতে পায়নি ওকে।

সিকিউরিটির পরেও রিনি অনেক কথা বলে যাচ্ছে, আর প্রণব সব মন দিয়ে শুনছে। তারপর যেখানে ওদের দুজনের গেটে যাবার রাস্তা আলাদা হয়ে গেছে, সেখানে রিনি বলল, "এবার যেতে হবে, কাকু।" তারপর 'বাই' বলে হঠাৎ থেমে প্রণবের গালে আলতো করে একটা চুম্বনের দাগ এঁকে দিল। প্রণবের সারা গায়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। ভীষণ ইচ্ছে হ'ল, একবার, শুধু একবারের জন্য নিজের মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমু খায়। কিন্তু রিনি তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়ে হাত নাড়ছে। যতক্ষণ রিনিকে দেখা যায়, ততক্ষণ পাথরের স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে প্রণব তার নিজের মেয়েকে দেখতে লাগল। তারপর রিনি হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

প্রণব হয়তো আরো বহুক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু হঠাৎ ইন্টারকমে ভেসে আসা আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেল – "United flight 829 to Mumbai is ready for boarding, please proceed to the gate C110." ...

অভিনব বৃদ্ধাবাস

জয়শ্রী বাগচী

পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে যাওয়া সরকারি চাকুরিরতা নিবেদিতা রায় দিল্লির এক অভিজাত আবাসনের বাসিন্দা। অবিবাহিতা। বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। কিছু বছর আগে তার বাবা যখন খুব অসুস্থ হলেন, আগুপিছু কিছু না ভেবেই সে দুম করে ভি আর এস (ভলান্টিয়ার রিটায়ারমেন্ট স্কীম) নিয়ে নিল বাবার দেখভাল করার জন্য। আসলে দাদা-বৌদির সংসারে বাবা একটু অবহেলিতই ছিলেন। এখন বাবা মারা যাওয়ার পর সে খানিক একাকীত্বে ভুগছে। সময় যেন আর কাটে না। আশ্রম-মন্দির, লাইব্রেরি সব কিছু করেও মনটা যেন অন্য আরও কিছু করার আকাঙ্ক্ষায় সারাদিন হাপিত্যেশ করে বসে থাকে। ঠিক এই রকম সময়েই অতি সাধারণ একটা ঘটনা ঘটল –

নিবেদিতার উপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মণি রায় – স্বামী স্ত্রী দুজনে থাকেন। মণি রায়ের বয়স সপ্তদশের কোঠায় আর স্বামী অশীতিপর বৃদ্ধ। ওঁদের ছেলে, মেয়ে নিজ নিজ পরিবার নিয়ে ব্যাঙ্গালুরু আর ভূপালে বাস করে। মণি রায় ও তাঁর স্বামী যথেষ্ট সুখী দম্পতি, কিন্তু কাজের তিনটি লোক নিয়ে সবসময় বিব্রত। সকাল থেকেই মণি রায়ের কাজ হ'ল ফোন করে করে খবর নেওয়া কে ক'টায় আসবে। রান্নার মহিলাটি প্রায়ই ছুটি নিয়ে বসে থাকে, এলে খুব দেরিতে আসে। রান্নাটুকু সেরে নিজেই আগে খেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। তারপর ওঁরা স্বাভাবিকভাবেই বেশ দেরিতে খেতে বসেন।

সেদিন নিবেদিতা বাজার সেরে ফিরছিল, লিফ্টে ওই রান্নার মহিলাকে দেখে বেশ অবাক হ'ল। ঘড়ি দেখল একটা বেজে গেছে। ভাবল এখন রান্না শুরু করলে ওঁরা খাবেন কখন। নিজের ফ্লোরে পৌঁছে লিফ্ট থেকে বেরনোমাত্র ফোনটা বেজে উঠল। ফোনে কথা বলতে বলতেই দেখল মহিলাটি তড়িৎ গতিতে আবার নেমে যাচ্ছে। নিবেদিতা নিজের মতো করে ভেবে নিল – তাহলে কোনও দরকারে এসেছিল, আজকের রান্না হয়তো করাই আছে। কেন জানি না, এইরকম ভেবে একটু আশ্বস্তও হ'ল সে।

দিন তিনেক পরেই নিবেদিতা খবর পেল যে মণি রায় পা পিছলে পড়তে পড়তে সামনের ক্রকারি কেসটি ধরে

কোনমতে নিজেকে বাঁচিয়েছেন, কিন্তু কোমরে হ্যাঁচকা – স্লিপ ডিস্ক, বেড রেস্ট ইত্যাদি চলছে | সেই শুনে নিবেদিতা ছুটল তাঁকে দেখতে | জানতে পারল রান্নার লোকটির ক্রমাগত এত অনিয়মের জন্য বিরক্ত হয়ে ওঁরা তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন তিনদিন আগে | তাই মণিমাসি রান্না করতে যাচ্ছিলেন; অসাবধানে পা পিছলে যাওয়াতে এই বিপত্তি | অসহায় মেসো নড়বড় করতে করতে রান্নাঘর সামলাচ্ছেন | নিবেদিতা এখন বুঝতে পারল সেদিনে মহিলার ওই বাড়িতে ঢুকেই আবার বেরিয়ে যাওয়ার কারণ ছিল তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল|
যাইহোক, সেদিন থেকেই নিবেদিতা ওদের রান্না করে দিতে শুরু করেছিল কিছুটা জোর করেই | তাঁদের কোন অজুহাতই ধোপে টেকেনি | অগত্যা মেসো নিজের ফ্রিজে রাখা মাছ, সবজি সবই নিবেদিতাকে দিয়ে এসেছিলেন | কদিন চলবে হিসেব করে আবারও কিনে দিয়ে এসেছিলেন সবরকম বাজার | এইভাবেই পরস্পরের হৃদ্যতা বাড়তে বাড়তে সম্পর্কটা পারিবারিক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল | আচমকা এই বৃদ্ধ-দম্পতিকে সাহায্য করতে পেরে নিবেদিতা মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠছিল|

একদিন হঠাৎই মেসো সকাল সকাল একগাদা বাজার ও মাছ এনে বললেন সেদিন পাঁচজনের রান্না হবে | নিবেদিতা ভাবল হয়তো কোন আত্মীয় স্বজন দেখা করতে এসেছে | পরে অবশ্য জানতে পারল ওসব অন্য আর এক দম্পতির জন্য, তাঁরাও ওর রান্নার নিত্য ভাগিদার হতে চলেছেন | এইভাবে আরো কয়েকজনের রান্নার ভার নিবেদিতার ওপর এসে গেল | নিবেদিতার আপত্তি করার উপায় ছিল না | তবে ওর খুব ভাল লাগছিল ওঁদের সবাইকে একটু সাহায্য করতে পেরে | সময়ও কেটে যাচ্ছিল সুন্দরভাবে | মেসো একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "আমাদের মতো এখানে আরও অনেক বৃদ্ধ পরিবার আছে যারা রেডিমেড রান্না পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারে| আর তুমি তো এইভাবেই একটা বিজনেস শুরু করতে পারো|"
নিবেদিতা হেসেছিল, মণিমাসিও |

কথার কথা হলেও এই প্রস্তাব নিবেদিতার মনে ধরেছিল, সাতপাঁচ ভাবছিলও এই নিয়ে | বিজনেস নয়, কিন্তু কথাটা আবাসনের অন্যান্য বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় পরিবারকে জানালে কেমন হয়! এটুকু সাহায্য তো ও করে দিতেই পারে| কিন্তু সবাই তো একরকম নয়, কেউ যদি আবার স্বার্থের গন্ধ খুঁজে পায়? আর অগ্রসর হতে সাহস পায়নি ও |

এর কিছুদিনের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল কয়েকটি ঘটনা – মিসেস চাকলাদার ভুগতে ভুগতে গত হলেন | তাঁর স্বামী বেশ অসুবিধায় পড়লেন রান্না-খাওয়ার ব্যাপারে | বৃদ্ধ বোস দম্পতি বহুদিন আমেরিকায় ছেলের কাছে কাটিয়ে নিজের দেশে ফিরে এলেন | কিন্তু মিসেস অসুস্থ হয়ে পড়ায় ভদ্রলোক বেশ অসহায় বোধ করতে লাগলেন | নানারকম লোকজন রেখেও অসুবিধার সুরাহা হ'ল না | একে একে এঁরা সকলেই নিবেদিতার রান্নার ভাগিদার হতে চাইলেন | নিবেদিতা বুঝতে পারছিল এসবের পেছনে রায়-মেসোর ইন্ধন কতখানি কাজ করছে | সে একটু সমস্যায় পড়ে গেল | ভাবছিল সবাই যদি আলাদা আলাদা খাদ্য সামগ্রী দিয়ে যায়, তাহলে সময়মতো সব রান্না কি সে করে উঠতে পারবে? আর প্রতি বাড়িতে কীভাবেই বা সেসব খাবার ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে! তাই এই চুক্তি মেনে নেবার আগে একটু সময় চেয়ে নিল|

রায়-মেসোই সব সমস্যার সমাধান করলেন | সকলকে নিজের বাড়িতে জড়ো করে একটা মিটিং করলেন | আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "নিবেদিতা, তোমার খাবার ঘর আর টেবিলটা আমরা ব্যবহার করলে আপত্তি নেই তো? তুমিই একটা সময় ঠিক করে দাও, আমরা সবাই পৌঁছে যাব তোমার কিচেনে|"
এত সহজ সমাধানে সকলেই একবাক্যে রাজি | শুধু লাঞ্চ নয়, ডিনারের আয়োজনও অনুমোদিত হয়েছিল | ফাণ্ড তৈরি হয়েছিল | মেন্যু ঠিক করা হয়েছিল | সপ্তাহের চাল, ডাল, তেল, নুন, সবজি, মাছ, মশলাপাতি সবকিছু কতটা লাগবে হিসেব কষে হোম ডেলিভারি নেওয়া হয়েছিল | খাতায় জমা খরচের হিসেবও লেখা হয়েছিল | আরো টুকিটাকি যা যা দরকার সব আয়োজন সম্পূর্ণ|

প্রথম দিন বেলা সোয়া একটায় নিবেদিতার ফ্ল্যাটে সবাই উপস্থিত | কাঁচের খাবার-টেবিলে একটি ছোট্ট ফুলদানিতে একটি মাত্র আধফোটা লাল গোলাপ গাঢ় সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে | সেতারের মৃদু ঝঙ্কারে পরিবেশ আরো মোহনীয় হয়ে উঠেছে | ইতিমধ্যে নিবেদিতা একগোছা লাল মেলামাইনের ডিনার প্লেট ও বাটি টেবিলে সাজিয়ে ফেলেছে | ডাল-ভাত-আলুভাজা, একটা পাঁচমিশালি তরকারি, আর মাছের ঝোল সহযোগে নিবেদিতার রান্নাঘর মেতে উঠেছিল পরম পরিতৃপ্তিতে হাসি ঠাট্টা গল্প-কথায় | নিবেদিতার চোখ দিয়ে সেদিন টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়েছিল; হয়তো আনন্দে, এই

ভেবে যে পিতৃ-মাতৃসম কয়েকজন মানুষের স্নেহ-ভালবাসা ও আশীর্বাদ এভাবে তার উপরে বর্ষিত হবে এ তার ধারণারও অতীত ছিল | এটাই তো জীবনের পরম পাওয়া, যা মা-বাবা ছাড়া আর কারো কাছে পায়নি | নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস নিজের অজান্তে সেদিন গোপন করেছিল সে |

রান্নার কাজ অবশ্য তাকে একলা করতে হচ্ছিল না; পালা করে দু'একজন এসে সাহায্য করেছিল | এসব প্রচার হতে বেশি সময় লাগেনি | এই কর্মকাণ্ডে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন | মিসেস পোদ্দার মর্নিংওয়াক-এর পর একদিন সবাইকে আমন্ত্রণ জানালেন মন্দিরসহ ওঁর বিরাট হলটিতে প্রাণায়াম, যোগ ব্যায়াম, ধ্যান ইত্যাদি করার জন্য | সবাই রাজিও হয়ে গেল | মিসেস সেনের বাড়িতে নাতনির দেওয়া বাহান্ন ইঞ্চির বিরাট টিভি, তিনিও সবার জন্য বিনোদনের দরজা খুলে দিলেন | রায়-মেসোর বাড়ির হল-জোড়া আলমারিতে ইংরেজি ও বাংলা নভেল, নাটক, ছোটগল্প, আর কত যে পত্র-পত্রিকার ছড়াছড়ি – নিবেদিতাই একদিন সবাইকে নিয়ে হাজির হয়েছিল সেখানে |

হাসি-আনন্দ-গান-মন্ত্রপাঠ-প্রাণায়াম বই পড়া সবকিছুর মেলবন্ধনে সকলের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল | কিন্তু এত নিশ্চিন্তে জীবনের কোন পর্যায়ই শুরু করা যায় না | আবাসনেরই কিছু মানুষ বিরোধিতা করায় কর্ত্রীপক্ষ নিবেদিতাকে সাবধানবাণী শুনিয়েছিল এভাবে বিনা অনুমতিতে ব্যবসা করার জন্য | সেদিন নিবেদিতা সত্যিই চমকে উঠেছিল | বিনা পারিশ্রমিকে শুধু কিছু পিতৃ-মাতৃতুল্য মানুষকে সহযোগিতা করার জন্যও এত আপত্তি! আত্মাভিমানী নিবেদিতা সেদিন কোন প্রত্যুত্তর না দিয়েই চলে এসেছিল, কারণ সে জানত মিথ্যা প্রচার কোনদিনই টিকতে পারে না | সত্যিই তাই হয়েছিল | জীবনের প্রায় তিনভাগ অতিক্রান্ত এই পৌঢ় ও বৃদ্ধদের নানা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ কর্মকাণ্ডে একটি নতুন পরিবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং কোনদিন এক লহমার জন্যও তা ব্যহত হয়নি | বরঞ্চ আবাসন প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছিল বসন্ত উৎসব, পঁচিশে বৈশাখ, নববর্ষ বরণ, বাইশে শ্রাবণ | ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বৈতালিকে সুরের গুঞ্জরণ, পূর্ণিমার সাঁঝে একসাথে বসে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠা – "ও আমার চাঁদের আলো..."

এ এক অন্য উপলব্ধি, অন্য ভাললাগা, অন্য আনন্দ! হয়তো এইভাবেই ব্যস্ত-ত্রস্ত প্রজন্মতে জীবনের এই মূল্যবোধটুকু সঞ্চার করে দেবার অদম্য প্রয়াস ছিল নিবেদিতার |

আজ নিবেদিতা আর নেই | দূরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়ে চলে যেতে হয়েছিল তাকে | তবু রয়ে গেছে "নিবেদিতার কিচেন"| নিজের জীবনের চরম পরিণতির আভাস পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্ল্যাটটি দান করে গেছে এই আবাসনের কর্তৃপক্ষকে | শর্ত শুধু একটাই ছিল – যা কিছু এই ফ্ল্যাটে হবে সব বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সাহায্যের জন্যই হতে হবে |

হয়তো এভাবেই নিবেদিতা সেদিনের সেই কয়েকজন রূঢ় মানুষের মিথ্যে অভিযোগের উত্তর দিতে চেয়েছিল!

কামরে মে বনধ্

শুভা আঢ্য

গত মার্চ মাস থেকে ঘরে বন্ধ! এক্কেবারে... "চাবি খো গ্যায়া!" এখন "ঘর মে শুধু উনি আর আমি"... "হাম-তুম!"... "তুমি আমি দুজনাতে"...! বুঝুন কান্ড! উঠতি বয়সে, যখন দেখার ছিল, তখন 'ববি' ছবি দেখার অনুমতি পাইনি | সেজকাকা দেখে বাড়িতে এসে বলেছিলেন, "ছ্যা ছ্যা, ওসব কেউ দেখে? ওই দুটো ছেলে মেয়ে, এই বয়সে কোথায় লেখাপড়া করবি, তা না ঘরে বন্ধ হয়ে নেচেগেয়ে একসা! রামো রামো!" আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, "সামনে পরীক্ষা, ওসব বাজে কথা না ভেবে পড়াশোনাতে মন দাও গে |" ক্লাসের ভাগ্যবতী বন্ধুদের কাছে ঋষি কাপুরের নাচের বর্ণনা শুনে জিভে জল এসেছিল | আর সিনেমা বাদ দিয়ে পড়াশোনা করেও, ফল তেমন কার্যকরী না হওয়ার বিড়ম্বনা তো ছিলই | ছবিটা না দেখলেও, গানগুলো তো বিনাকা গীতমালার কল্যাণে কানে এসেছিল | তখন, ওই সেই কোনও এক আদ্যিকালে, হয়তো মনে মনে ঋষি কাপুরের মতোই কারো সঙ্গে ঘরে বন্ধ হওয়া, দারুণ রোমান্টিক এক দখিন-হাওয়া জাগানো সিচুয়েশন অনুমান করে রোমাঞ্চিতও হয়েছিলাম | তবে এখন, এই এনার সঙ্গে উনপঞ্চাশ বছরের পর "হাম – হামারা, তুম – তুমহারা ব্যাপার"! কোথায় দখিন-হাওয়া? এখন বন্দীগৃহের আবহাওয়া দারুণ অগ্নিবাণের পরশনে হামেশাই গরম হয়ে উঠছে | আসামীরা কেউ কাউকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারছে না | তবে যাবেই বা কোথায়? বন্ধুবান্ধব তো তাদেরই মতো গৃহবন্দী, তারপর গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো একদল পেয়াদা, সারাক্ষণ খবরদারী করছে | ছেলে মেয়ে তো আছেই, তাদের খুদে পল্টনরাও, যাঁদের বয়স কুল্লে তিন থেকে ছয়, কিছু কম যান না তারাও | কচি কচি গলায় থেকে থেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, সুযোগ পেলেই ভয় দেখাচ্ছে, "দাদু, দিদা, There is a 'Big Bad' virus outside, with big large green eyes! Don't go out, it will bite you!"

সে আর বলতে? 'Bad virus' আমরা সসম্মানে এড়িয়ে চলার সব রকম চেষ্টা করছি | কিন্তু সংসার তো থেমে থাকছে না | পেটপুজো, বাজার-হাট আছে তো? সে সবের ব্যবস্থা অবশ্য মুখের কথা ফেলতে না ফেলতে হয়ে যাচ্ছে | আমাদের দোরগোড়াতেই বাজার এসে যাবে; শুধু সময়মতো দোকানে অর্ডার করলেই হ'ল | তবে, কি জানেন? ব্যাপারটা শুনতে যত সহজ আসলে তার ফ্যাকড়াও আছে প্রচুর! নিজে দেখে শুনে, স্বচক্ষে, স্বহস্তে পরখ করে, টিপে টুপে, তার ওজন, গন্ধ ইত্যাদি বিচার করে, কলাটা মূলোটা, থলিতে ঢোকানো আর যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা, কোন সাহেব, মেমের হাতে আমার বাজারের তালিকা ধরিয়ে দেওয়া, কি এক হল? আমার কাছে এ এক রকমের মানসিক torture | না না, complicated কিছু নয়, এই গেরস্ত ঘরের আলু, বেগুন, টাইপের সহজ বাজারের লিস্ট করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে | পাতার পর পাতা ছবি আছে, তার মধ্যে থেকে আমাদের পছন্দের জিনিসটিকে খুঁজে পাওয়া রবিবারের কাগজে পাত্র-পাত্রীর লিস্ট দেখে ঠিক বর বা কনেটিকে খুঁজে পাওয়ার মতোই চ্যালেঞ্জিং | এর মধ্যে আবার কর্তাবাবু নাক গলাবেন | এইটা ভাল, ওটা নয়,... এ দিয়ে কি করবে? ওটা তো গতবার কিনে, পচিয়ে ফেলে দিলে – ইত্যাদি নানান গা-জ্বালানো মন্তব্য, কথা কাটাকাটি, খিটিমিটির পর অর্ডার দেওয়া হ'ল | অনভ্যাস ও অজ্ঞতার দরুণ, জিনিসের সংখ্যা বা ওজনটা দিতে একটু আধটু ভুল হয়েছিল | বাজার এল | আলুর বস্তা ১০ পাউন্ড, রাজস্থানের মেয়েদের মাথার কলসীর সাইজের দিশি কুমড়োর সাহেব ভাই, পেল্লাই একটি butter nut squash, দু বাক্স ডিম, টমেটো ১টি, party size-এর আলু ভাজার প্যাকেট, যাতে আমার পাড়ার সব্বাইকে খাইয়েও বাকি থাকবে! (এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি... শেষেরটি আমার অগোচরে লিস্টিতে জুড়ে দেওয়া, কার কীর্তি সে আপনারাই ভেবে নিন!)

যাকগে, এ তো গেল সাহেবী বাজার | দেশী বাজারের আর এক গপ্পো | আমাদের পাড়ায় দেশ থেকে সদ্য আগত দক্ষিণী মিষ্টি বৌটি দয়াপরবশ হয়ে ইন্ডিয়ান বাজার এনে দিল | বলেছিলাম সবচেয়ে ছোট প্যাকেটের চাল, সাদা ময়দা আর একটুখানি আদার টুকরো | এল বাসমতি চাল ২৫ পাউন্ড, ময়দা ২৫ পাউন্ড, আড়ে বহরে একটা চাটুর সমান সাইজ আদা! সত্যিই ভয়াবহ! বিশেষ করে আমার হেঁসেলে | দেখেশুনে বাড়ির অন্য সদস্যটি পরামর্শ দিল, "রেঁধে ফেললে আর থাকবে না!"... জানি, ঘরে বন্ধ থাকার অবসরে সব্বাই বাহারী নামের রকমারী রান্নার প্রদর্শনী করছেন ফেস বুক-এ | কত তার নামের বাহার! আসরমাত চিংড়ী, বাগানসাজ পাঁচমিশেলি, তাজমহল চিকেন, পদ্মাবতী ইলিশ

থেকে তোয়ালে রুটি, চিঁড়ের মনোহরণ মিষ্টি ছেঁচকি ইত্যাদি, ইত্যাদি | সে যারা করছে তাদেরকে আমার সেলাম | বিধাতা আমাকে রন্ধন সম্বন্ধীয় গুণটি দিতে প্রচুর কার্পণ্য করেছেন| আমি রান্নার সঙ্গে কান্না আর রন্ধনের সঙ্গে বন্ধনের বিশেষ যোগাযোগ দেখি এবং সেই কারণে যতদূর সম্ভব ওদের থেকে দূরত্ব রেখে চলি | সেই অতি নির্গুণ আমার পক্ষে ২৫ পাউন্ড চাল, ময়দার সদগতি করার চেয়ে জহর ব্রত করা সহজ | আদা মাটিতে পুঁতে দিলে কী হতে পারে, চিন্তা করছি|

বাজার তো এল, এবার তাদের পরিচর্যা করার পালা | ঘরে তোলার আগে তাদের দোরের বাইরেই গঙ্গাজল থুড়ি disinfectant ছিটিয়ে বিশুদ্ধ করে নিতে হবে | তারপর তেনাদের নাইয়ে ধুইয়ে, শুদ্ধু কাপড়ে মুছে তবে ফ্রিজ এ শোয়াতে হবে| কাজলের টিপ পরানো আর শাঁখ বাজানোটাই যা বাদ! ভেবে দেখছিলাম ছেলেপিলেগুলো যখন ছোট ছিল তাদের কোনোদিন এত যত্ন করে চান করিয়েছি কিনা? মনে পড়ল না, নিজেকে একটু guilty লাগছে | এর মধ্যে কর্তাবাবু বাড়িতে থেকে bore হয়ে কি করবেন ভেবে না পেয়ে বাইরে যাবার বায়না ধরছেন যখন তখন | "না" বললে মেজাজ খাপ্পা | গেলে, আমার আরেক শিরঃপীড়া! পই পই করে হাত ধোয়ার কথা মনে করাও রে, জুতো বাইরে রাখাও রে, জামাকাপড় মেশিনে ফেলাও রে, স্নান করতে পাঠাও রে, ইত্যাদি ইত্যাদি | বকে ঝকে করালে এনার মেজাজ তুঙ্গে; না করালে পেয়াদাদের জবাবদিহি করো! খবর পেলে তারা বাবাকে তো আগাগোড়া নতুন করে করোনার বাধা বিপত্তির পাঠ পড়াবেই তারপর আমাকে দায়ী করবে ক্রাইম অ্যাসোসিয়েট বলে | জ্বালাতন, পোড়াতন হয়ে গেছি একেবারে | কিন্তু নালিশ করব কার কাছে? এমন কি তিন বছরের ছোট্ট নাতিটা পর্যন্ত বলে কিনা, "তেকনিকালি, দিদা, ইউ হ্যাভ তু স্তে ইনসাইড অল দ্য তাইম!" 'ট' বলতে পারে না, এখনো মুখের আড় কাটেনি, বুঝুন ব্যাপার!

কী করি, কী করি, ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হচ্ছে | বন্ধুবিহীন জীবন বড়ই শুষ্ক | দেখা সাক্ষাৎ নেই, "কী খবর" জিজ্ঞেস করার কোনো মানে নেই | আমার যা খবর আর দশজনেরও তাই | গতকাল যা করেছি, আজও তাই করব, আগামী কালও | তবে যাদের করার তারা করছে! সুজিপিসিকে আপনারা জানেন তো? ওই যিনি গোল গোল চশমা পরে, করোনার নানা অভিজ্ঞতা WhatsApp-এর মাধ্যমে বলে থাকেন? তাঁরই ভাষায় বলি, সবার কী প্রতিভা! নাচছে! যে যেখানে পারছে | "হাটে নাচছে, ঘাটে নাচছে, খাটে নাচছে | গাইছে! কচি থেকে বুড়ো সব্বাই গাইছে | রবীন্দ্রসংগীত থেকে কাওয়ালি গাইছে, খেয়াল থেকে বাউল গাইছে, কবিগান থেকে রক গাইছে | তারপর, লিখছে! লোকে ঝুড়ি ঝুড়ি বই লিখে ফেলছে | প্রেমের গল্প, ভূতের গল্প, ফালতু গল্প... কী নেই?" আর – আমি? সুজিপিসি যেমন বলেছেন –"আমার? কোনো গুণ নেই | আমি বেগুন, আমি ঢ্যাঁড়স!" – রাঁধতে পারি না, নাচতেও পারি না, Facebook-এ প্রচার করার মতো কিছুই নেই | তাতে আমার কোনও দুঃখও নেই, শুধু দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি, ২৫ পাউন্ড ময়দা নিয়ে কি করব? বাড়িতে বসে বসে শেকড় গজিয়ে যাচ্ছে| প্রথমদিকে ফোনাফুনি বেশ হচ্ছিল এখন তাতেও ভাঁটা পড়েছে | আর বলারই বা কি আছে? ঘরের লোকটি সারাক্ষণ কম্পিউটারের কবলে, নতুন বৌয়ের মুখ দেখার মতো পলকহীন তাকিয়ে আছে | সারাদিন কী যে রাজকার্য হচ্ছে খোদায় মালুম | আমি ভাবছি, একটা "করোনা মায়ের পাঁচালী" লিখলে কেমন হয়? Bollywood-এর কোন এক অখ্যাত প্রযোজকের কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি করা, "সন্তোষী মা" নামে এক দেবী যদি লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মহিলার আরাধ্যা দেবী হতে পারেন, "করোনা মা" হবেন না কেন? করোনা দেবীর গোল মাথায় কাঁটা কাঁটা মুকুট, গোল গোল দুটি রক্তবর্ণ চোখ, পরনে, চীনের পতাকার মতো হলুদ তারা-ছাপ লাল শাড়ী | দেবীর দুটি হাতের, একটিতে মাস্ক, অন্যটিতে সাবান | তিনি বাদুড় বাহনা, পায়ের নিচে ডানা ছড়ানো বাদুড়! চীনেরা অর্ডার পেলে, দু'দিনে বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দেবে | তারপর মন্দিরে মন্দিরে পুজো হবে | লোকে হ্যান্ড sanitizer-এ হাত ধুয়ে, ছ'ফুট দূরত্ব রেখে অঞ্জলি দেবে, bleach-এর চরণামৃত মুখে, বুকে মাথায় ছোঁয়াবে| সন্তোষী মায়ের দিন হ'ল শুক্রবার | তাহলে ভেবেচিন্তে একটা দিন ধরে নিতে হবে করোনা মায়ের দিন হিসাবে| আমার বুধবার পছন্দ, – আপনাদের? সেদিন নিরামিষ ভোজন? নৈব নৈব চ! সারাদিন শুদ্ধমনে, উত্তরমুখী হয়ে শুধু চাইনিজ | নিজে না রাঁধলেও চলবে, take out হলেই হবে| বুধবার কেন? উত্তরমুখী কেন? এই তো, মুশকিলে ফেললেন | তা মশাই, আমাদের পাঁজিতে যে অমুক দিনে অলাবু ভক্ষণ নিষিদ্ধ টিসিদ্ধ লেখা থাকে সে নিয়ে কি প্রশ্ন করে কেউ? এটাও সেরকমই মেনে নিতে হবে আরকি!

"করোনা মায়ের কথা অমৃত সমান
গুণীজন নাম গায়, শুনে পুন্যবান।"

মানসিক রোগ একাকীত্বে বৃদ্ধি পায়। ভাবছি, করোনা আপদ বিদেয় হলে যখন সবার সঙ্গে আবার দেখা হবে, তারা আমাকে চিনতে পারবে কি? চিনতে চাইবে তো?

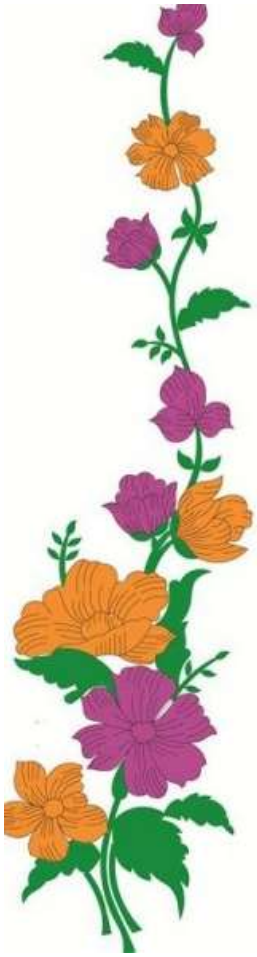

নৈঃশব্দ্যের শব্দময়তা

সোমা ঘোষ

কালী মন্দিরের খোলা চাতালে শুয়ে আকাশটা দেখতে বেশ লাগে। নীলচে ধূসর জমিতে লক্ষ হীরের কুচি ছিটানো সামিয়ানা। একটু দূরে একটা চিতা দাউ দাউ জ্বলছে।

বেশ ঘি ঢেলেছে বডিতে। মালদার লোক যে তা আত্মীয়-স্বজনের পোশাক দেখেই মালুম হচ্ছিল। নিশুত রাতে মাঝ গঙ্গার বুকের ছমছমে সোহাগী হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছে থেকে থেকে লেলিহান শিখা, তাতে আবার জোরদার হয়ে উঠছে তার তেজ ভুর ভুর করে ঘিমাখা চামড়া-পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে।

আঃ! খারাপ লাগে না তো আমার এই ঘ্রাণ! কলু ডোমের থুতুভেজা লাল শালুমোড়া গাঁজার কল্কে থেকে কয়েক টান দিয়ে শরীরটা দারুণ হালকা লাগছে। না দুঃখ, না আনন্দ, না দুশ্চিন্তা, না খিদে, না তৃষ্ণা। কেবল হালকা ভেসে থাকার এক অনুভূতি। চিল্কা যদি জানত যে আমি শালা ডোমের এঁটো খেয়েছি! আজ তবে বাড়িতে ঢুকতে দিত না।

হেঁ হেঁ এঁটো কে কার খেল তা নিয়ে কে বসে আছে? আমি আছি? এ্যাঁ? এই যে তোমাকে ওই থলথলে জলহস্তীটা এঁটো করে দিয়েছে সেই কবে, তা নিয়ে আমি কিছু বলেছি তোমায়? বলো চিল্কা। তোমার উন্নতি, তোমার দেরীতে আসা আধুনিকতা, তোমার নাইলনের ব্রা-প্যান্টি, বিদেশী পারফিউম আমি কি পারি এতসব! কিন্তু তোমার মতো বর্ন মডেল আমার মতো এঁদো পচা মানুষের সাথে জীবন কাটাবে, গোবর চোনা গন্ধময় জীবন... যাঃ, আমি কি এমনই অবুঝ? যদিও এই জীবনেই প্রথম চার বছর সুখী সুখী আদুরি আদুরি তুমি আমার সাথে কী আভিনয়টাই না করলে, দেখলে হিন্দি ছবির রেখা অবধি তাজ্জব বনত।

কত সময় কেটে যাচ্ছে কে জানে। বাড়ী যাবার তাড়া কিসের? আচ্ছা, ছেলেটা কোথায় আমার? ম্যানার্স-হীন, আনসিভিলাইজড্ বাপের ধাঁচ সে পায়নি। আগাগোড়া সাহেবি কেতায় মুড়ে নিয়েছে মা ওকে। ও কি একা আজ? না না, চিল্কা তেমন আবুঝ মা নাকি? কোথাও রাত কাটালে ছেলেকে ঠিক মায়ের বাড়ী পাচার করে। এই ভবঘুরে বাপের কাছে রাখতে ভরসা করে না। অনিয়ম করলে চিল্কা আমায় বড্ড বকে। তবু কি শোধরাতে পারল? রয়ে গেলাম একই রকম।

হাহা, আমার আজ নো তাড়া।

মনের মধ্যে কবিতা গুড়গুড় করছে...
হাতে কাগজ থাকলে লিখে ফেলা যেত লাইনগুলো|
অনেকগুলো টুকরো মিলে একটা গোটা আমি| প্রতিটা টুকরোর বাস তোমাদের মনের কুয়াশাঘেরা উপত্যকায়| একটা স্থবির গাছ যেভাবে বীজ ফেলে ফেলে তার নতুন চারায় চারায় বিস্তার পায়, এগিয়ে চলে, তেমনি আমার প্রতিটা সত্তা চারিয়ে যায় তোমাদের মনে| নতুন নতুন সত্তার এই অজস্র জন্মলাভ একমুখী| আমি নিজেকে মেলে দিয়েছি মাত্র, গুটিয়ে নেবার পথ আমি জানি না, ইচ্ছামৃত্যুর কোনও ভূমিকা নেই এ খেলায়| ছুটে যাওয়া তীরের মতো আর ফিরে আসা নেই| সাধ হয়, হলুদ বসন্ত পাখির ডানায় ভর করে দেখে আসি তোমরা আমাকে কোথায় রেখেছ, কেমন রেখেছ| তোমাদের মনের আগাগোড়া জমাট কুয়াশা আমার দৃষ্টি রোধ করছে| তবু চোখে পড়ে কিছু চোখ, যেখানে ভরসার ছবি আঁকা রয়েছে পাকা রঙে|
সেখানে আমি দুদন্ড বসে পাত পেড়ে দু'মুঠো খাই যখন তখন| বিশ্রাম পাই, চোখও রাঙাই ইচ্ছে হলে | আর সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে সংশয়ী, দ্বিধাময় চাউনি | এরা দলে ভারি | তবু এখানেও বসি মাঝে মাঝে, স্বস্তি না পেলেও সুখ পাই বটে|
বাকি গুটিকয় মন, যারা ভালবাসে, কাছে টানে তারপর
বিষাক্ত কাটাকুটি খেলে|
নৈঃশব্দ্যের শব্দময়তায়
নিয়ত বিবর্তন|
দৃশ্যে অদৃশ্যে
চেতনে অচেতনে
সীমায় অসীমে
ভিতরে বাইরে
বদলে যাওয়া অনুক্ষণ|
এই চলমান বিবর্তনের
তুমি শরিক মাত্র|
উফ, কী মহান আত্মা মাইরি! আমার মতো লোকের স্ট্যাচু ফ্যাচু বনে যাওয়া উচিত| ব্যর্থ কবি, ব্যর্থ পতি, লেজি বাম, অ্যাবসোলিউটলি পাতি একটা মানুষ|
লালজলে এমন মহান মহান বোধ আসে না| কোনো কোনো দিন মাল টেনে ঘরে ঢুকতে গিয়ে জলহস্তীকে বেরুতে দেখলে মনে হয় ওর কপালে পয়েন্ট টু কোল্টের নলটা ঠেকাই, এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে প্রমাণ করি আমি পুরুষ|
তারপর বাথরুমে ঢুকে বমি করি, চিল্কা মৃদু ধমক দেয়, "এত খাও কেন, সহ্য না হয় তো?" তারপর নরম শরীরের পেলব ঢেউ তুলে ওর এঁটো গা আমার গায়ে ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ে| আর আমি চিল্কার রেশমী রাত্রিবাস থেকে আসা আঁশটে ঝাঁঝালো পাঁক গন্ধ নিতে নিতে... আমি ক্লীব পুরুষ ভাবতে থাকি... কী করে,
কী করে জলহস্তীটাকে... কী করে,
কী করে আমার বউটা...কবুতরি বুকের মাঝে মৃদু ঘামের গন্ধমাখা বউটা...কবে কার্তুজপোড়া গন্ধ মেখে নিল...
আর মসৃণ শরীর জুড়ে পাঁক... ছি ছি!
চিল্কা... তুমি কেন এখনও আমার পাশে? তবু তো পাঁকের গন্ধ নিতে নিতেই ঘুমিয়ে যাই| স্বপ্নে দেখি আমাদের জোড়াখাটে কালো কাপড়ে মোড়া কফিন|
ঘুমের ঘোরে আমার চোখ বেয়ে জল নামে...
ঐ আমাদের মৃত প্রেম...
কিন্তু আজ মনে কোনো রাগ নেই| উদার মনে ছেড়ে দিয়েছি চিল্কাকে জলহস্তীর সাথে|
ওরা বাড়ি চলে যাচ্ছে চিতায় জল ঢেলে| ভোরের আলো ফোটার আগে একটু ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি|
কোনো মানে হয়, দরজা খোলা! সেকি, চিল্কা ফিরে এসেছে! পেঁপেগাছের পাতা পিছলে সকালের নরম রোদ একটা হলুদ খরগোশের মতো গুটিসুটি ওর ঘুমন্ত মুখের পাশে বসেছে সবে| আজ আমার কপালে আছে| রাত'ভর বেপাত্তা থাকা হাড়ে হাড়ে মালুম দেবে! কালো কফিনটাকে বুকে জড়িয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে চিল্কা| নাইটি উঠে ফরসা পায়ের গোছ অনেকটা দেখা যাচ্ছে| কোনো মানে হয়, পর্দা উড়ছে,
পাশের বাড়ির কে কোথায় দেখে!
নেশাটা নেই মনে হয় আর| মাথাটা এখনো ভারহীন|
চিল্কার পাছে ঘুম ভাঙে, কোনোমতে কফিনটাকে পেরিয়ে জোড়াখাটের কোল ঘেঁষে শুলাম, দেওয়ালের দিকে মুখ|
জানলার পর্দাটা জোর হাওয়ায় উড়ে গেল|
বাসি মালা সমেত দেওয়ালে ঝুলন্ত আমার হাসিমুখখানাও মর মর আওয়াজে নড়ে উঠল|

বাংলা বই প্রকাশ ও পড়ার সুবর্ণ সুযোগ

মৃণাল চৌধুরী

আজকের যুগে ইন্টারনেটের দৌলতে আমাদের জীবনের অনেক পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে | আর এই পদ্ধতি চলমান | আজকেরটা আগামীকাল অচল, ব্যয়সাপেক্ষ, মানে অতীত, তার মানে আরও তাড়াতাড়ি এগুতে হবে | তা নাহলে টিকে থাকতে পারবে না | বই প্রকাশ করা এবং তার সঙ্গে বই পড়ার পদ্ধতিও এই দ্রুত পরিবর্তনের থেকে বাদ পড়ে না | বিশেষকরে আজকের অনলাইনের যুগে | গতানুগতিক ছাপাখানা উঠে যাচ্ছে | চালু হয়েছে কম্পিউটার আর প্রিন্টার | কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে পাড়ার বইয়ের দোকানগুলোর কথা আলাদা; আমেরিকার Barns and Noble-এর মতো বিখ্যাত বইয়ের দোকানের অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে | আগের মতো জমজমাট অবস্থা আর নেই | কেননা চালু হয়েছে অ্যামাজন প্রাইম-এ অন-লাইন বই কেনা | শুধু বই কেনা কেন? চালু হয়েছে অন-লাইনে বই পড়াও|

পৃথিবীর প্রায় ৭.৮ বিলিয়ান লোকের মধ্যে ৪.৬ বিলিয়ান লোকের কোন না কোনভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করার অবস্থা আছে, যা আমাদের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন এনেছে | দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে বই প্রকাশ করার পদ্ধতি, আর সেই সঙ্গে পাল্টাচ্ছে বই পড়ার পদ্ধতি | শুরু হয়েছে ই-বুক, অ্যামাজন প্রাইমের kindle Unlimited-এর অল্প খরচে এবং কিছু বই বিনা খরচেও পড়া সম্ভব | এমনকি অ্যামাজন প্রকাশনের মাধ্যমে বিনা খরচে বা অতি অল্প খরচে বই প্রকাশ করাও সম্ভব | তবে এসবই সম্ভব মূলতঃ ইংরেজি প্রকাশনায় | হয়তো চাইনিজ, জাপানিস বা ইউরোপিয়ান ভাষায়ও সম্ভব; কিন্তু বাংলা ভাষায় এর বিশেষ অগ্রগতি হয়নি এখনও | পুরনো প্রকাশিত বই অন-লাইনে অনেক আছে, অন-লাইনে পড়াও সম্ভব | তবে অনেক ক্ষেত্রে আইনগত বাধা-বিপত্তির প্রশ্ন থাকে |

মূল কথা, ইংরেজি বইয়ের মতো অভিনব উপায়ে অল্প খরচে নতুন বাংলা বই প্রকাশ করা এবং অল্প খরচে পড়ার সুযোগ – দুটোই হতে চলেছে | সেই বিষয়ে কিছু আলোচনাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য |

Scroll.in, যা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন পত্রিকা এবং সংবাদ পরিবেশক | Scroll.in সম্প্রতি বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বই ছাপানো এবং বই পড়ার এক অভিনব এবং অতি ফলপ্রসূ উপায় চালু করেছে, যার নাম ScrollStack | এর মাধ্যমে বই ছাপালে পাঠকরা অতি অল্প খরচে সম্পূর্ণ বইটা পড়তে পারবে | এমনকি বইয়ের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় পড়তে কোনো খরচ লাগবে না | পড়তে ভাল লাগলে অল্প খরচে পাঠক সেই বই পড়া শেষ করতে পারবে | এই বইগুলো ডাউনলোড বা কপি করা যাবে না | সেসব লেখকের কপি রাইট এবং পাবলিশারের অনুমতির অন্তর্ভূত | তাই ScrollStack-এর মাধ্যমে বই ছাপালে বাংলা বই পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে পাঠকদের কাছে সহজেই পৌঁছে যাবে|

ScrollStack-এর মাধ্যমে প্রথম বাংলা উপন্যাস কুনাল বসুর "তেজস্বীনি ও শবনম"| প্রকাশক কলকাতার দে'জ পাবলিশিং | ডঃ কুনাল বসু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক | বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই সমান দক্ষতা এবং দুই ভাষাতেই বই লেখেন | ইংরেজি উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেশী | তার মধ্যে 'দ্য জাপানিস ওয়াইফ' – অপর্ণা সেনের পরিচালনায় সিনেমা হয়েছে | অতি প্রশংসাও পেয়েছে |

বাংলা উপন্যাস 'রবি-শংকর', 'বাইরের দরজা' আর সদ্য প্রকাশিত 'তেজস্বীনি ও শবনম'|

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রসিদ্ধ জয়পুর সাহিত্য সভায় যোগদান করতে গিয়ে কুনাল বসুর সাক্ষাৎ হয় বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক শ্রী অরুণাভ সিংহ-র সাথে | ওঁর অনুপ্রেরণায় দে'জ পাবলিশিং থেকে "তেজস্বীনি ও শবনম" বইটি ScrollStack-এর মাধ্যমে ২০২০ সালের জুলাই মাসে ই-বুক হিসাবে প্রকাশিত হয় | বইটি অন-লাইনে পড়তে হলে ক্লিক করুন –

https://tejo.scrollstack.com

ScrollStack ই-বই প্রকাশনায় এক নতুন প্রয়াস | এর আবিষ্কার-কর্তা রীতেশ মেহেতা | বেশ কিছু বছর Google এবং Facebook-এর সাথে কাজ করার পর ইংরেজির পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় ই-বুক প্রকাশ করার প্রয়াসে এই নতুন প্লাটফর্মটি চালু করেছেন তিনি |

আশা রাখি যাঁরা বই পড়তে আগ্রহী তাঁরা এই নতুন পন্থাটি ব্যবহার করে খুশি হবেন |

বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন দেশে পা রাখার অভিজ্ঞতা

হেনা দাস

অতিমারীর দাপটে কলকাতায় গৃহবন্দী হয়ে আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপছি আর বিপত্তারিণী মায়ের নাম দু'বেলা স্মরণ করছি। এমনই একদিন সকালে অভাবিত ধূমকেতুর মতো বিদেশ থেকে চলভাষে মেয়ের সুললিত কণ্ঠের রাগিণী বেজে উঠল। হাতের কাজ ফেলে ছুটতে ছুটতে চলভাষ কানে নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই এক নিঃশ্বাসে মেয়ে বলতে লাগল, "মা, টিকিট পাঠাচ্ছি, কাল সকালেই ফ্লাইট – গোছাবার জন্য ১২ ঘন্টা সময় দিলাম – আসছ তো?" আমি হতবাক বিস্ময়ে বিমূঢ়, তোতলাতে লাগলাম – বলছিস কী? এই পরিস্থিতি? বিশ্বজুড়ে করোনার আতঙ্ক – এর মধ্যে? মেয়ের উত্তর, মা তোমার প্রিয়জন ছেলেমেয়ে নাতিরা এখানে, অসুস্থ হলে কে দেখবে তোমাদের? বরং ঠাকুরের নাম নিয়ে চড়ে বসো প্লেনে। এরপর আমরা দেখছি। কয়েক মুহূর্ত আমি আর আমার পতিদেব নির্বাক হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম, তারপর তাক থেকে নামালাম স্যুটকেস। হাতে মাত্র ১২ঘন্টা। সময় তো নেই – কী নেব, কী রাখব! একবার স্যুটকেসে কিছু বন্দি করি তো তারপর আবার তা বের করি। এত কাজ কী করে সামলাব – প্রথমেই শুরু হ'ল অত্যধিক প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে ফেলার প্রস্তুতি। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কোমর বেঁধে শুরু করলাম ছোটাছুটি। ভাবারও সময় নেই, কাউকে এ বিষয়ে বলতে গেলেই সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করবেন। তারপর তো আছেই প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণ। মানুষের কৌতূহল যে অসীম। তবু কাউকে কাউকে তো বলতেই হ'ল। সত্যি কথাটা বললেও তাদের তাকানোর বহর দেখে বোঝা গেল তারা মোটেই আমার কথা বিশ্বাস করেননি। আমার পতিদেব অবশ্য এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা সফর ব্যাপারটা বিশেষ ভাল মনে নিলেন না। কিন্তু আমার গলার জোরের কাছে পারবেন কেন? মেয়ের নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে মা বাবার উপস্থিতি যে মেয়ের মনে কতটা খুশির তুফান তুলবে সে কথা বলতেই বাজিমাত। তাকে দ্বিতীয়বার ভাবার সুযোগই দিলাম না। ভয়ডর বরাবরই আমার কম। তাই করোনার আতঙ্ক আমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারল না। কোনোরকমে একটা স্যুটকেস ভর্তি করে আর বাড়িঘরদোর ঠাকুরের ভরসায় রেখে পরের দিন সকাল ন'টায় বেরিয়ে পড়লাম দমদম বিমান বন্দরের দিকে। অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছিলাম – শুধু গুছিয়ে নিলাম প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, পাসপোর্ট, চিকিৎসা বীমা সংক্রান্ত নথিপত্র আর কিছু ডলার।

এরপর সবটাই ইতিহাস। কত রকমের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা যে হ'ল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরাসরি ফ্লাইট না থাকায় আমাদের আসতে হ'ল কলকাতা থেকে দিল্লী ভায়া আগরতলা, এবার দিল্লী থেকে নিউইয়র্ক আবার নিউইয়র্ক থেকে লস এঞ্জেলস। প্রতিবার বিমানে ওঠার আগে আমাদের পরতে হয়েছিল পি পি অর্থাৎ পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা এক সংক্রমণ নিরোধক পোশাক। যথেষ্ট অস্বস্তিকর অথচ পরাটা বাধ্যতামূলক। বিমানে উঠে প্রথমে অবাক হয়েছিলাম – একটা আসনও খালি নেই। কে বলবে করোনা সংক্রমণ এড়াতে দূরত্ব বজায় রেখে বসা আবশ্যক। যাইহোক, নিউ ইয়র্ক-এ আসার পর আমাদের আলাদা ঘরে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। আমরা আমাদের নির্ধারিত পরবর্তী বিমান মিস্ করলাম। একবার মনে হ'ল আমাদের বোধহয় এই মার্কিন মুলুকে প্রবেশের অধিকারই দেবে না, বুকটা আশঙ্কায় বারবার কেঁপে উঠছিল। শেষে কি তীরে এসে তরী ডুবল? এতবার করে আমাদের পাসপোর্ট আর আইডি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করল যে মনে হচ্ছিল এবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে। মনে মনে ইষ্টনাম জপ করতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আমরা ছাড়া পেলাম। ইমিগ্রেশন দপ্তর থেকে ছাড়া পেয়েই উঠে বসলাম লস এঞ্জলেসের বিমানে। কথায় বলে না "রাখে হরি মারে কে", আমাদেরও সেই কথাই মনে হ'ল। সারা বিশ্বজুড়ে করোনা আতঙ্ক, এর মধ্যে আমরা দুজন প্রবীণ নাগরিক সুস্থ অবস্থায় এই দেশের মাটিতে পা রাখলাম – এটা তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নয়। নিয়মকানুনের সমস্ত হ্যাপা সামলে লাউঞ্জের বাইরে উঁকি মারতেই দেখি মেয়ের হাসিমুখ। একগাল হেসে বলল "মা, ইউ আর ব্রেভ"! সত্যি, মনে হ'ল এক বিরাট যুদ্ধ জয় করে এলাম। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের দেশ ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে এসে সুস্থ শরীরে বিমান থেকে অবতরণ করা – এ তো একটা যুদ্ধই। নিজেকে মনে হচ্ছিল একজন বীরাঙ্গনা। ভয়কে জয় করে আপনজনকে কাছে পাবার আনন্দই আলাদা। প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসে এমন অভিজ্ঞতা লাভ, সত্যি ভাবিনি কোনোদিন। জীবনে যে কতকিছু শিখতে হয় তা

ভাবলে অবাক লাগে | আসলে ঈশ্বর এক বাজিকর, তিনি তাঁর জাদুর ছড়ি ঘুরিয়ে আমাদের দিয়ে সবকিছু করিয়ে নেন | আমরা তাঁর হাতের ক্রীড়নক মাত্র | শুধু রাখতে হয় মনের জোর আর পরম করুণাময়ের প্রতি গভীর আস্থা |

মা ও মেয়ে

সৌমি জানা

সেই ছোট্টবেলা থেকেই মায়ের মতো বড় হওয়ার সখ মেয়েটির | মা কী ভাল ভাল শাড়ী পরে! মায়ের শাড়ীর মতো সুন্দর একটি জামাও তার নেই | শাড়ীর কত রং, কত রকম আঁকিবুকি তার জমিতে, পাড়ে | কই এত রং আর ছবি তো তার কোনো জামাতে নেই! তার জামাগুলি ছোট হয়ে যায়, কয়েকদিন পরেই কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগে, কিন্তু মা'র শাড়ীগুলো কিছুতেই পুরনো হয় না | কী সুন্দর পাটপাট করে আলনায় কিংবা থাকে থাকে আলমারিটিতে শোভা পায় বছরের পর বছর |

ছোট্ট মেয়েটির মনে সেদিন কী ভীষণ আনন্দই না হয়েছিল যেদিন মা তার সবথেকে রঙিন, সবথেকে বর্ণময় শাড়ীটি নিজের হাতে অনেকক্ষণ ধরে, অনেক কৌশলে তাকে পরিয়ে দিয়েছিল | শুধু কি তাই, তার সাথে তার নাতিদীর্ঘ চুলগুলি দিয়ে বহু কায়দায় বানানো খোঁপা, খোঁপায় ঢেউ খেলানো ক্লিপ দিয়ে আঁটা বেলিফুলের মালা, চোখের কোণে কাজল রেখা, কপালে লাল টিপ, পাউডার, রুজ আরো কত কী! নিপুণ হাতে নিখুঁত করে সাজিয়েছিল মা | সাজবার সময় একটু নড়লেই বকুনি দিচ্ছিল যদিও, তবে সে বকুনিতে ভয় নয়, বরং অনেকটা প্রশ্রয় ছিল | ছোট্ট ডানপিটে মেয়েটা কী যেন একটা আবেশে চুপটি করে বসেছিল, মায়ের মতো শাড়ী পরে সাজতে পেয়ে | সাজানোর শেষে তার পান পাতার মতো মুখটির দিকে চেয়ে মায়ের মুখের অদ্ভুত প্রশান্তির হাসিটা আজও চোখের সামনে ভাসে সেদিনের ছোট্ট মেয়েটির | সেদিন পরীর মতো সেজে যেন মেঘেদের ভেলায় ভাসতে ভাসতে আর মুখে সূর্যমুখীর হাসিটি ধরে কচি পায়ে নেচেছিল সেই ছোট্ট মেয়ে "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে"| সেই পরীর মতো মেয়েটি সেদিন বুঝতেই পারেনি তাকে ঘিরে তার মায়ের চোখে কত স্বপ্ন, বুকে কত ইচ্ছের ভীড় জমা ছিল |

নেচে-গেয়ে-হেসে-খেলে-পাঠ্যে-পুস্তকে বড় হতে থাকে ছোট্ট মেয়েটি | বড় হওয়ার সাথে সাথে তার নিজের চোখেও দানা বাঁধতে শুরু করে অনেক স্বপ্ন | মায়ের জগতের বাইরে নিজের একটা পৃথিবী তৈরি হতে থাকে মেয়ের | মা মাঝে

মধ্যে তার এক একটি শাড়ী এনে পরাতে চায় মেয়েকে | কখনো সে রাজি হয়, কখনো হয় না | বড় হওয়ার সাথে সাথে ব্যস্ত হয়ে যায় মেয়ে | মায়ের মতো শাড়ী পরার সখটি এখন আর তত ভাবায় না তাকে | এখন অনেক কাজ তার, সে তো আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই, সারা বিশ্বের অসংখ্য সম্ভাবনা প্রতিনিয়ত হাতছানি দেয় কিশোরী মেয়ের উৎসুক হৃদয়ে | মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা'ও যেন অনেককিছু নতুন করে শেখে | মেয়ের জানার উৎসাহে আর উদ্দীপনায় নতুন করে জাগে মায়ের মন; সন্তানকে ঘিরে স্বপ্নের জাল আরো শাখা প্রশাখা বিস্তার করে | বেশভূষায় তখন আর তত খেয়াল থাকে না মায়েরও | সন্তানের লক্ষ্য পূরণে সাহায্য হয়ে দাঁড়ানো এখন মায়ের জীবনের মূলমন্ত্র | মায়ের শাড়ীগুলি প্রায় নতুন হয়েই জমতে থাকে আলমারিতে | বড় হয়ে ঠিক পরবে মেয়ে, একদিন যখন সে সত্যি সময় পাবে মায়ের জিনিসগুলি নেড়েচেড়ে দেখার |

মেয়ে বড় হয় – কৈশোর অতিক্রম করে আসে যৌবন | স্বপ্নগুলো আরো রঙিন আর স্বাধীন হয় মেয়েটির | একদিন ঘর ছেড়ে পাড়ি দেয় সে বাইরের বিশ্বে নিজের স্বপ্ন আর সম্ভাবনাগুলোকে ছুঁয়ে দেখতে | মা আশীর্বাদ করে তাকে | তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে মেয়েটি যে বাইরের পৃথিবীটা খুব কঠিন | মা সাহস জুগিয়ে চলে প্রতিনিয়ত দূর থেকে | মেয়েও অনুভব করে মায়ের শেখানো জীবনের পাঠগুলিই সবথেকে প্রয়োজনীয়, চলার পথে সবথেকে মূল্যবান |

ইতিমধ্যে জীবনসঙ্গীর খোঁজ পেয়েছে মেয়ে | সেই শুনে মায়ের মন খুশিতে উদ্বেল হয়, আর একলাটি পথ পেরোতে হবে না আদরের কন্যাটিকে | হাত ধরে পাশে চলার জন্য রাজপুত্র যে এসেছে দুয়ারে | বহুমূল্য শাড়ীতে প্রাণভরে সাজায় মা তার রাজকন্যাটিকে | আরো দূরে যাবে মেয়ে, মায়ের চোখদুটো ছলছল করে ওঠে, গাল বেয়ে নামে জলের ধারা | মা বলে এটি তার আনন্দাশ্রু; এতদিনে যে সাধ মিটতে চলেছে তার!

নিজের জগৎ আর সংসার নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে যায় মেয়েটি তারপর | সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটি নিজে মা হয় একদিন | একটি নতুন প্রাণকে পৃথিবীতে এনে যেন জীবনটাই বদলে যায় মেয়েটির | নিজের মনের ইচ্ছেগুলো সব পেছনের সারিতে চলে যায়, সামনে আসে দায়িত্ব, মমতা আর দুর্দমনীয় এক স্নেহ | এমন তো আগে কখনো কারোর জন্য অনুভব করেনি! অবাক হয় মেয়েটি নিজেকে দেখে | তার মা কিন্তু মনে মনে হাসে | এতদিনে মায়ের অন্তরের সব চিন্তা আর না-বলা কথাগুলো সে অনুভব করছে প্রতিনিয়ত, সে নিজেও যে এখন মা! আর কী আশ্চর্য, আজকাল মাঝে মধ্যেই শাড়ী পরে সাজে মেয়ে! বারো-হাত শাড়ী আর ভারী মনে হয় না মেয়েটির | প্রিয়জনের চাহিদার ভার সামলাতে অভ্যস্ত সে এখন | শাড়ীর ভার আজ আর কিছুই নয় তার কাছে | বরং শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে জমা হয় অনেক অভিজ্ঞতা | মেয়ের কাছে শাড়ীর গুরুত্ব বাড়ছে দেখে মা বোঝে এতদিনে মেয়েটি হয়তো চারপাশের ঝড় ঝাপটা সামলে পরিণত হয়ে উঠেছে | শাড়ী পরা মানে তো শুধু বড় হওয়া নয়, সেইসঙ্গে পরিণত হওয়াও বটে | নিজের আলমারিতে বহু বছর ধরে যত্নে রক্ষিত শাড়ীগুলি এক একটি করে মেয়েকে দেয় মা, তার সঙ্গে আরো অনেক নতুন বারো-হাত যোগ হয় – নতুন নতুন ডিজাইন, হাল ফ্যাশন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে |

মেয়ে একদিন বড় হয়ে মা'র মতো হতে চেয়েছিল | কিন্তু যখন বড় হ'ল তখন বুঝল মা তার চেয়ে আরো অনেকখানি এগিয়ে গেছে | মেয়েটি চেয়েছিল বড় হয়ে একদিন মায়ের অপূর্ণ সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করবে, ঠিক যেমন মা তার করেছে ছোট্টবেলাটিতে | অবশেষে যখন সেই সময় এল তখন মেয়ে বুঝল মায়ের আর নতুন কোনো সাধ নেই | জীবন সায়াহ্নে মায়ের কোনো প্রত্যাশা নেই, মা তৃপ্ত সন্তানের জীবনের পূর্ণতা দেখে | সন্তান সুখে থাক, এটুকুই তার পরম প্রাপ্তি | মা এখন আর নিজের শাড়ীগুলির দিকে ফিরেও তাকায় না, রং বৈচিত্র এখন স্পর্শ করে না তাকে | মা খোঁজে একটু শান্তি, একটু অবলম্বন | অদ্ভুতভাবে আজও মায়ের মধ্যেই মেয়ে দেখতে পায় নিজের ভবিষ্যৎ | মায়ের খুব কাছে চলে আসে মেয়ে | একদিন শুধু মেয়ের মধ্যেই বেঁচে থাকবে মা | যুগ অতিক্রান্ত হয়, মা-মেয়ের কাহিনী এভাবেই এগিয়ে চলে |

এক বিখ্যাত শ্রোতার সাক্ষাৎকার

সংগ্রামী লাহিড়ী

"নমস্কার দাদা-দিদিরা, কাকু-কাকিমারা, জ্যেঠু-জেঠিমারা | আশাকরি এতক্ষণে টিভির গোড়ায় বসবার মতো একটু ফুরসৎ মিলেছে? দিনের অফিস, রাতের রান্না, বাচ্চার হোমওয়ার্ক – কাজ কি কম? সব সামলে এক্কেরে হা-ক্লান্ত, তাই না? এবার তা'লে টিভির পর্দায় চোখ রাখুন | ঘন্টাখানেক সঙ্গে থাকুন | আর আজকে আছে... কী বলুন তো? একজন শ্রোতার ইন্টারভিউ |

না না, চমকে যাবেন না, চমকে যাবেন না, ইনি যে সে শ্রোতা নন, একজন বিখ্যাত শ্রোতা | খুব কদর এঁর, দেশবিদেশ থেকে ডাক পান গান শোনার জন্যে | কী বললেন? এমনটি কখনো শোনেননি? আহা, সেকথা শোনাবার জন্যেই তো আজ এখানে, মানে টিভির এই আসরে শ্রোতাবাবুর আগমন | গান শোনার গপ্পো বলতে |"

ক্যামেরা ঘুরে গিয়ে অনুষ্ঠানের অতিথির মুখে ফোকাস করে |

"এই যে আসুন আসুন শ্রোতাবাবু, ভাল আছেন তো?"

"খারাপ কী? দিব্যি আছি | তা বলুন আপনাদের কোন সেবায় লাগতে পারি |"

"আপনার একটা ইন্টারভিউ – মানে আপনি স্বনামেই ধন্য কিনা? একজন বিখ্যাত শ্রোতা হিসেবে দশজনে চেনে, জানে, মান্য করে | তা আপনার জীবনকথা অল্পস্বল্প যদি বলেন | তাছাড়া আমাদের দর্শকরাও তো লাইন দিয়ে আছেন, ফোনে প্রশ্ন শুধোবেন বলে | এই যে, এই দেখুন না, ফোন হাতের কাছেই আছে |"

"ওরে বাবা, একে ইন্টারভিউ, তার ওপর আবার ফোনে প্রশ্ন? না দাদা, আমায় ছেড়ে দিন, ছাপোষা শ্রোতা আমি, আপনার প্রশ্নবাণ সামলে আবার ফোনাফুনি, এত এলেম আমার নেই |"

"আহা, আছে আছে, অমন উতলা হন কেন? আচ্ছা বলুন দেখি গান শুনতে শুরু করলেন কবে?"

"ওঃ, সে এক গপ্পো বটে | আমার বাবা ছিলেন জাঁদরেল মিলিটারি | হিটলারী গোঁফ, মানানসই মেজাজ | প্রায়ই বলতেন, 'ব্যাটাছেলে আবার প্যানপ্যানানি গান শুনবে কী? বরং 'gun', মানে বন্দুক ধরতে পারলে একটা কাজের মতো কাজ হ'ল |'

ওদিকে আমি আর আমার প্রায় সমবয়সী এক কাকা – আমরা দুজন গান পাগল | সুর কানে ঢুকলেই মনটা কেমন চুলবুলিয়ে ওঠে | লুকিয়ে চুরিয়ে রেডিও চালাই | কখনো কোনোদিন বাবা ধরতে পারলেই একদম কোর্ট মার্শাল, আচ্ছা করে আগাপাছতলা পিটিয়ে দেন | মা তখন ছলছল চোখে দুই স্যাঙাতের গায়ে ব্যথার মলম লাগান | তা ওই মার খেয়ে খেয়ে জেদ চেপে গেল | মিলিটারি জেদ | বাপ কা ব্যাটা একেবারে | গান তো গাইতে পারব না, কিন্তু গান শোনা বন্ধ করব না | কভি নেহি |

"আহা, কী প্রতিকূল পরিবেশ, আমি মানসচক্ষে আমার দর্শকদের ছলছল চোখ দেখতে পাচ্ছি – ঠিক আপনার মায়েরই মতো |"

"আহা না না, অত দুঃখু পাওয়ার কিছু নেই | একটু বড় হতে না হতেই কাকা আর আমি – দুজনেই ফুড়ুৎ | আর আমাদের নাগাল পাওয়া গেল না |"

"অ্যাঁ? বলেন কী? বাড়ি থেকে পালালেন নাকি?"

"আরে দূর মশাই, পালাব কেন? আমি তো গেলুম এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে | কাকা অবিশ্যি তার আগেই ভর্তি হয়েছিল মেডিকেল কলেজে | তা আমার সেই কাকা এখন বেশ নামকরা সার্জেন – বুঝলেন তো? তার আবার অপারেশন থিয়েটারে ঢুকলেই গান পায় |"

"গান পায়? সে কীরকম?"

"ওই যে লোকের যেমন নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টু পায় – তেমনই | সে গানও আবার খুব কন্টেক্সচুয়াল, মানে পরিস্থিতি অনুযায়ী বেশ মানানসই গান | যেমন ধরুন, ওপেন হার্ট সার্জারির সময় রক্তপাত হলে কাকা গাইবে – 'হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়'| বা ধরুন অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেওয়ার সময় গাওয়া হবে – 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'| কখনো যদি গলা কাটতে হয়..."

"ব্যস ব্যস, থাক থাক, ওতেই হবে, ওতেই হবে | আর কাকার কথায় কাজ নেই মশায়, আপনার নিজের কথা বলুন | তা কলেজে কী হ'ল?"

"কলেজে? পড়াশুনো ছাড়া সবই হ'ল আর কী | নানা কেতার, নানা রকমের গান শোনা, সময় বিশেষে গানের সঙ্গে নাচানাচি | হুলিগান বললে বোধহয় ঠিক বলা হবে | কিন্তু ওই যে শোনার কানটা একবার তৈরী হয়ে গিয়েছিল, তারই জন্যে ততদিনে বন্ধুমহলে আমার খুব কদর | বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা গান গায় তারা সেধে সেধে নিয়ে যায় তাদের প্রোগ্রাম শুনতে |"

"তাই নাকি? বাঃ, তারপর?"

"কলেজটা খুব পছন্দ হয়েছিল মশাই, বুঝলেন? অনেক চেষ্টা করলুম ওই কলেজের একটা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হওয়ার | বছর বছর ফেল করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলুম একেবারে | কার সাধ্যি দেখি আমায় পাস করায় |

কিন্তু কিছুদিন পর প্রফেসররা ডেকে খুবই দুঃখ করে বললেন, 'বাবা মুকুন্দ, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একবার ঢুকলে যে তোমায় বেরোতেই হবে বাবা | কলেজের আইনে বলে আমরা কাউকে ফেল করাতে পারি না | তা বাবা, তুমি যদি সাদা খাতা জমা দাও, তাহলে আমাদের পাস করানোর কাজটা কত কঠিন হয়ে যায় বলো?'

তা আমার মনটি বড়ই নরম, বুঝলেন? কারো দুঃখ দেখতে পারিনে | এরপর থেকে পরীক্ষার খাতায় একটু আধটু লিখতে শুরু করলুম | ওই গানটান শোনার পরে যেটুকু যা মাথায় থাকে আরকি |"

"হুম, পাস করলেন?"

"কী আর বলি মশাই, পাস না করে উপায় ছিল? পাসের লিস্টিতে প্রথমেই যে আমার নামটা বসে আছে! ওই যে বললুম, প্রফেসরদের দুঃখু সইতে পারিনি একদম |" .

"আহা, বড় কোমল হৃদয়! তা ফেল করার বদলে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে গেলেন একেবারে?"

"ধুত্তেরি মশাই, তাতে আর এমন কী হাতি ঘোড়া হ'ল? গানের কথায় আসুন | সেই যে ভাল শ্রোতা হিসেবে নাম ছড়িয়েছিল না? ওমা, দেখি তারপর থেকে অনেক অনুষ্ঠান থেকে ডাক পাচ্ছি, শুধু শোনার জন্যে |"

"কিন্তু এত লোক থাকতে আপনিই বা কেন? মানে শুধু আপনাকেই কেন এত ডাকাডাকি?"

"বলছি, বলছি | তার আগে বলুন তো আপনি আপনার মুঠোফোনটি না দেখে একটানা কতক্ষণ থাকতে পারেন?"

"আমি? ওঃ সে আর বলবেন না | আধঘন্টা ফোন না দেখলেই বড় কষ্ট, প্রাণটা যেন খাবি খায় | এই তো দেখুন না, আপনার সঙ্গে বকবকানির ঝামেলা মিটিয়েই আগে ফোন চালু করব | এই একঘন্টায় ফেসবুকে কত স্টেটাস আপডেট হয়ে গেল, কত ছবি, কত কথা চালাচালি হয়ে গেল – ভাবুন দেখি একবার? ভাবছি টিভি-কর্তাদের বলে দেখব এই স্লটটা বদলে দিয়ে যদি আধ ঘন্টার করা যায় | আধঘন্টা, সঙ্গে থাকুন | কেমন হবে বলুন তো?"

"এই, এইবার তাহলে বুঝুন গানের প্রোগ্রামে গিয়ে লোকে কী করে | চোখ থাকে হাতের মুঠোফোনে, ঠিক সেই সময়েই দুনিয়ার যত হোয়াটস্অ্যাপ্ মেসেজ চেক করার দরকার পড়ে | গান হয়তো একান দিয়ে ঢুকে ওকান দিয়ে বেরুচ্ছে, কিন্তু ফেসবুকে স্ট্যাটাস উঠে গেল 'listening to গায়িকা দেবী' | ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ মিনিটে পঞ্চান্নখানা লাইক | কেউ কেউ তো আবার আরো সরেস | সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেন ফেসবুক লাইভে |"

"তাই নাকি? আজকাল কি গানের আসরে বসে লোকজন সরাসরি লাইভ করছে?"

"তবে আর বলছি কী? একবার ভেবে দেখুন, সামনে বসে সবাই নিজ নিজ ফোনে নিমগ্ন কিন্তু গায়ক বা গায়িকার নিস্তার নেই | ফেসবুক লাইভে তামাম দুনিয়া তাঁর চাঁদবদনটি দেখতে পাচ্ছে | তা মশাই, আমি ওসব একদম করি না | কক্ষণো না | গানটাই শুনি মন দিয়ে | তারপর ভাললাগা, খারাপলাগা জানিয়ে আসি শ্রোতার তরফ থেকে | ঐটেই হ'ল আমার ইউ.এস.পি | মানে বুঝলেন তো? ইউনিক সেলিং পয়েন্ট |"

"খুব বুঝেছি দাদা | ঘন্টার পর ঘন্টা যিনি ফোন বন্ধ করে গান শুনতে পারেন, তিনি তো মহাপুরুষ! দিন দাদা, পায়ের ধুলো দিন একটু |"

"আরে করেন কী, করেন কী? আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি | আচ্ছা, ফোনটা বাজল মনে হ'ল না?"

"ওহ, তাই তো? নিশ্চয় আমাদের দর্শকের দল | প্রশ্ন শুধোবেন | হ্যালো? কে বলছেন?"

"হ্যালো, আমি গরাণহাটার গোবর্ধন গড়াই | শ্রোতাবাবুর কাহিনী শুনে আমি আপ্লুত | প্রশ্ন করতে চাই, আপনি কী দেশের বাইরেও গান শুনতে যান?"

"হ্যাঁ, তা মেলা নেমন্তন্ন আসে | ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা থেকে প্লেনের টিকিট পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয় | অনেক দেশের গানই শুনে ফেলেছি, মতামতও দিয়েছি | তবে হ্যাঁ, অ্যামাজনের জঙ্গল আর বারমিউডা ট্রাইঅ্যাঙ্গল থেকে এখনো কেউ ডাকেনি |"

"হ্যালো, দ্বিতীয় প্রশ্ন, লাইনে কে আছেন?"

"আচ্ছা শ্রোতাবাবু, আপনি কি উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমঝদার? বিভিন্ন জাতের সংগীত নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা একটু বলবেন?"

"শুনেছি তো দিদি অনেক রকম, তবে তুলনা করতে পারব না |

কোনটা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত আর কোনটা যে অধমাঙ্গের সঙ্গীত তা খোদা-ই জানে | আমার সম্বল শুধু এই দুটি কান | যা এই দুটি কানের মধ্যে সেঁধোয়, তা সুর আর তালের অনুপানের সঙ্গে মিশিয়ে নিলেই হয়ে গেল শ্রুতিমধুর | ওই সম্বল করেই তো এতদিন ধরে গান শুনে যাচ্ছি |"

"তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন | হ্যাঁ, বলুন লাইনে কে আছেন?"

"হ্যালো আমি বাজেশিবপুরের শিবপ্রসাদ বোস | বিখ্যাত শ্রোতাবাবুর কাছে আমার প্রশ্ন, গান শোনার কোনো ইউনিক অভিজ্ঞতা আমাদের বলবেন?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই | আমার মিলিটারি বাবার কথা মনে আছে তো? একবার বাবাকে রেখে আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম | বাড়িতে বাবা একা আছেন | তা কী কারণে আমি সবার আগে একা চলে এসেছি, চাবি খুলে বাড়ি ঢুকেছি | ঢুকেই কানে এল গান! বললে পেত্যয় যাবেন না দাদা, দেখি আমার গানবিদ্বেষী, মিলিটারি বাবা বাথরুমে জলের শব্দের সঙ্গে গান গাইছেন – 'চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল |' বিশ্বাস করুন, সেই গান শোনার মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর কখনো হয়নি |"

"বিখ্যাত শ্রোতার ইন্টারভিউ এখানেই শেষ হ'ল | সবাইকে শুভরাত্রি, শ্রোতাবাবুকে অনেক ধন্যবাদ | যাই, এবার ফোনটা অন করি গিয়ে, পাক্কা একটি ঘন্টা ফোন ছাড়া এক্কেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি | নাহ, ভাল শ্রোতা হওয়া সত্যিই মুখের কথা নয়!"

পালাবদল

মল্লিকা ব্যানার্জী

"বৌদি তুমি এখনও ঠিক দুগ্গা পিতিমের মতো দেখতে"– পূর্ণিমা ঘর মুছতে মুছতে বলে ওঠে |

বহুদিন পরে একটু সময় নিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়েছিল শুচিস্মিতা, চমকে সরে আসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে, ভারী লজ্জা পেয়ে যায় | চিরকালই বড় চুপচাপ, শান্ত মানুষ সে – কোনদিনই কোনও কথা জোর দিয়ে বলে উঠতে পারে না | পঞ্চাশের দোরগোড়ায় পৌঁছে আজও মেয়ে ও কর্তা যা বলে তাতেই সায় দেয় |

"মেয়ের সঙ্গে যখন রাস্তায় বেরোও, মনে হয় দুটি বোন চলেছ | তুতানদিদিও সুন্দর, কিন্তু তোমার মতো মুখ-চোখ পায়নি | অন্য বাড়ির বৌদিরা মুখে কত কিছু মাখে-ঘষে, পালারে যায়, তুমি তো বাপু চুলটাও আঁচড়াও না ভাল করে | দিনরাত আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যে ভাব জানি না বাপু |"

পূর্ণিমাকে কী করে থামাবে তাও ভেবে পায় না শুচিস্মিতা; কথা ঘোরাতে বলে, "তোমার পিঠের ব্যথাটা কমেছে? কষ্ট হলে বাইরেটা আজ আর মুছো না | আজ আর কাল দুটো দিন আরাম করো, কেই বা আসে এ বাড়িতে!"

দীর্ঘকাল হিল্লি-দিল্লী ঘুরে প্রায় তিরিশ বছর পরে সোনারপুরের এই ফ্ল্যাটের দখল নিলেন সুশোভন লাহিড়ী | তাঁদের মেয়ে, তুতান সল্টলেকে আই-টি সেক্টরে চাকরি পেয়েছে | ওঁর রিটায়ারমেন্টের আর বছর তিনেক বাকী; তাই বউ মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে তিনি নিজে মাসে একবার আসেন ভাইজ্যাগ থেকে | বাড়ির কড়া শাসনে বড় হয়েছে শুচিস্মিতা, তাই মনের কথা কাউকেই খুলে বলতে পারে না কখনই | কিন্তু নিজে মেয়ের ওপর জোর করে কোনকিছুই চাপিয়ে দেয়নি | তার ইচ্ছেমতো তাকে বড় হতে দিয়েছে, তাই হয়তো সে একটু বেশিই স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে | আঠাশ বছর বয়স হ'ল, এখনও বিয়ের কথা উঠলেই বলে, "মাম্মা! চিন্তা নাথি, দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে, ফিকর্ মত্ করো ডার্লিং!"

চুপ করে ভাবে, পারত কি শুচিস্মিতা এভাবে তার মাকে বলতে? প্রবাসে বড় হওয়ায় কলকাতার কিছুই তেমন ভাল-ভাবে চেনে না তুতান; অথচ অ্যাক্টিভা নিয়ে হুটহাট বেরিয়ে পড়ে |

দশ বছর আগে পর্যন্ত বাবা, মা থাকাকালীন বছরে একবার করে সাতদিনের জন্য মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় আসত শুচিস্মিতা। বাড়িতেই সময় কেটে যেত। মার কড়া নিয়ম ছিল – মেয়ে এসেছে আরাম করতে, আত্মীয়দের দেখা করার ইচ্ছে হলে আমাদের বাড়ি এসে ঘুরে যাও, মেয়ে কোথাও যাবে না। যাদবপুরে শ্বশুরের সেই ফ্ল্যাটটা অনেকদিনই ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন সুশোভনবাবু। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান শুচিস্মিতা। নিজের বলতে কলকাতায় আজ আর কেউই নেই। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকায় আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কেবল ফোনেই যোগাযোগ ছিল প্রথমদিকে। কমতে কমতে তা এখন তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। তুতানের বিয়েতে সুশোভনের দিকেরই কিছু আত্মীয়কে হয়তো পাওয়া যাবে – আকাশের দিকে তাকিয়ে কত হাবিজাবি চিন্তাই যে মাথায় আসে শুচিস্মিতার!

আদিবাড়ি ছিল কালনায়। একান্নবর্তী পরিবার। সুন্দরী ঢলঢলে চেহারার শুচিস্মিতা ছোট থেকেই অনেক কাছের মানুষের চোখেও লোভী চাউনি দেখেছে। মা ছিলেন বড়ই কড়া, মেয়েকে কোথাও একা ছাড়তেন না। "পিকনিকে যাব মা, বন্ধুদের সঙ্গে?" একবার প্রশ্ন করেই বুঝে গিয়েছিল কোথাও যাবার অনুমতি পাবে না। পাড়ার দাদাদের সঙ্গে অনেক দিদিদের সাইকেলের পাশে হেঁটে যেতে দেখত শুচি। খুব জানতে ইচ্ছে করত কী নিয়ে ওরা গল্প করে, কেমন সুন্দর অকারণে হাসে। কিন্তু ওর সারাদিন তো রুটিনে বাঁধা – সকালে গান, তারপর স্কুল, বিকেলে পড়তে বসা বাড়িতে আসা স্যারের সামনে, রাতে টিভি অথবা গল্পের বই ছিল মুক্তির জায়গা। পাছে গ্রাম্যতা মেয়েকে স্পর্শ করে তাই জ্ঞাতি ভাইবোনদের সাথেও বিশেষ মেলামেশা করতে দিতেন না মা। শ্যামবাজারের মেয়ে ছিলেন শুচিস্মিতার মা। কালনায় বিয়ে হয়ে সকাল থেকে উনুন ধরানো, গোয়ালের কাজ, বাসন মাজা, পুকুর ঘাটে যাওয়া – এসব করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তাই শুচির বারো ক্লাস শেষ হতেই বাবাকে রাজী করিয়ে যাদবপুরে ফ্ল্যাট কিনে উঠে আসেন। সবাইকে বোঝান শুচির জন্য ভাল কলেজ চাই, গানের ভাল তালিম চাই, আর তাছাড়া সুপাত্র পেতে গেলে ওই কালনায় থাকলে কিছুই হবে না। শুচিস্মিতার চোখেও তখন নতুন স্বপ্ন। এর আগে বছরে একবার করে যখনই মামাবাড়ি যেত, কত নতুন জিনিসই দেখত – মেট্রো, লিফ্ট, এলিভেটর, খালি ভাল লাগত না ভীড়, বাস, ঠেলাঠেলি। হাওড়া স্টেশনে নামলেই কে যে কখন জোর ধাক্কা দিয়ে, কখন জোর খিমচে দিয়ে চলে যায় – ছোটবেলায় তো ব্যথায় ককিয়ে উঠত, কিন্তু একটু বড় হতে অত শান্ত মেয়েটাই কেমন পাগল হয়ে যায় কেউ নোংরাভাবে স্পর্শ করলে।

কলেজে ভর্তি হওয়ার বছর খানেকের মধ্যেই খবরের কাগজ থেকে সম্বন্ধ করেই ব্যাঙ্গালোরবাসী সুশোভনের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন মা। কলেজের তকমাটুকুই যা গায়ে লেগেছিল, পড়াশুনায় তো ভালই ছিল, গ্রাজুয়েশনের ফাইনাল পরীক্ষাটাই যা দিতে পেরেছিল ব্যাঙ্গালোর থেকে এসে। কিন্তু তুতানকে তার বাবা এম.টেক করিয়ে চাকরিতে ঢুকিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে আছেন। একটু পরেই নীচে অ্যাক্টিভা ঢোকানোর আওয়াজ পায়, আজকাল কোভিডের জন্য অল্টারনেট ডে-তে অফিস যেতে হচ্ছে, তবে যেদিন যাচ্ছে সেদিনও দুপুরেই কাজ মিটিয়ে ফিরে আসছে, হয়তো আবার লকডাউন হবে, কে জানে?

হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ডাইনিং রুমে এসেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল তুতান। এবার মা-মেয়ের খেতে খেতে গল্প হবে। সেখানে কোনও গল্প বাদ যায় না – অফিসে কোন কলিগ ওকে দেখে ফিদা থেকে নতুন প্রজেক্টে কি ঝামেলা... খানিক বোঝে খানিক বোঝে না শুচিস্মিতা। কিন্তু চুপচাপ মন দিয়ে সব শোনে। তার এই গুণটা বাপ-মেয়ের ভারী প্রিয়। কলকাতায় এসেই তুতানের বন্ধু সংখ্যা বেশ বেড়েছে; ছেলেও আছে প্রচুর। প্রায়ই ফোন আসছে। বাবা বাইরে থাকে, মা শান্তশিষ্ট, তাই বোধহয় আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে মেয়েটা। ফোনে একটা মেসেজ সেদিন ভেসে উঠল, ছবিটা দেখে শিউরে উঠে শুচিস্মিতা। কোনো ছেলেই পাঠিয়েছে, রসিকতার নাম করে, শালীনতার বড়ই অভাব। একবার ভাবে বারণ করবে। পরক্ষণেই ভয় হয় মেয়ে যদি মুখের ওপর বলে বসে, - "তুমি তো কলেজেই পড়োনি, ছেলে বলতে তো কেবল বরকেই জানো।" না না, মেয়ে তাকে ব্যাকডেটেড ভাবুক সেটা সে একেবারেই চায় না। হঠাৎ তুতানের ডাকে চমক ভাঙে, - "মাম্মা কী ভাবছ? কলকাতায় আসার পর থেকে আজকাল কেমন যেন চুপ হয়ে থাকো, বাবা এখানে থাকে না বলে? এক কাজ করো – কোনো পুরনো বন্ধুর নাম ঠিকানা আছে? বয়ফ্রেন্ড হলেও চলবে, ফেসবুক থেকে খুঁজে বার করে দিতে পারি কিন্তু। গল্প করে সময় কেটে যাবে তোমার।"

স্মিত হেসে মেয়েকে বলে, - "থাক, অত উপকারে দরকার নেই, নিজে কাউকে যোগাড় করো; তোমার বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হই একটু।"

মেয়ে খাওয়া শেষে উঠতে উঠতে বলে, "এ পাড়ায় একটা মস্তান ছেলে আছে, হার্লে ডেভিডসন চেপে ঘোরে। পরশু রাতে পাব থেকে বন্ধুরা মিলে ফিরছি – আমার বাড়ি ঢোকা অবধি দেখে ফিরে যায়। কথাও বলে না, জ্বালায়ও না, রাত হলেই দেখি ধুমকেতুর মতো দেখা দেয়। পূর্ণিমামাসী বলল ওর নাম সানি; বাবার ওষুধের ব্যবসা – একটা নার্সিংহোমও আছে। একদিন রাস্তায় ধরব মালটাকে, আমার পিছু নেওয়া বার করে দেব।"

****

"শুচি, কেঁদো না। তুতান ঠিক আছে, ছেলেটার অবস্থাই আশঙ্কাজনক।" মেয়ের অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েই চলে এসেছেন সুশোভন – "মিস্টার চ্যাটার্জী ভারী অমায়িক। শুচি, তুমি যাও একবার দেখা করে এসো। সানি ওঁর একমাত্র ছেলে, স্ত্রীও নেই ভদ্রলোকের। তোমার মেয়েকে বাঁচাতে গিয়েই বদমায়েশগুলোর ছুরিতে ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। আমাদের উচিত ওঁর পাশে দাঁড়ানো। ICU-র সামনের লবিতেই আছেন উনি। সানির গলায় ছুরি চালিয়েছে, আমি রক্তের ব্যবস্থা করেছি, আরও হয়তো লাগতে পারে। পারলে একটু ওঁর সাথে কথা বলো গিয়ে।"

সুশোভন এগিয়ে যেতেই শুচিস্মিতাও আস্তে আস্তে ICU-র লবির দিকে এগিয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন যিনি উনিই নিশ্চয় মিস্টার চ্যাটার্জী! আর একটু এগোতেই চমকে ওঠেন – এ কে! সঞ্জয় না! সেই জোড়া ভ্রু, খাড়া নাক; মাথাটা যেন ঘুরে ওঠে একটু। প্রায় তিরিশ বছর পরে দেখা। চুলে পাক ধরেছে কিন্তু বদলায়নি বিশেষ।

চোখ না খুলেই বলে ওঠেন, "ভাল আছ স্মিতা?"

"তুমি জানতে আমি এ পাড়ায় এসেছি?" রুদ্ধকণ্ঠে বলে শুচিস্মিতা।

এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান সঞ্জয় চ্যাটার্জী। "প্রথম দিন থেকেই তোমার মেয়ে একা একা বাইক নিয়ে ঘোরে। একে প্রবাসী, কলকাতার কোন কিছুই চেনে না, কিছু বদ বন্ধুও জুটিয়েছিল – তাই সানিকে বলেছিলাম একটু খেয়াল রাখতে। পুলিশ বলছিল ওরা টাকি থেকে ফিরছিল, সানি ফোনে জানিয়েছিল দূর থেকে লক্ষ্য রাখছে। কিন্তু অত রাতে বেশ কিছু লোক অ্যাটাক করে। লকডাউনে লোকের হাতে পয়সা নেই, এসব তো বাড়বেই! পুলিশ তাড়াতাড়ি আসায় খবরটা অন্তত পেয়েছি আমরা। মেয়েকে তোমার আরও একটু সামলানো উচিত ছিল স্মিতা।"

আর নিজেকে সামলাতে পারল না শুচিস্মিতা, "একদিন তুমি ঠিক সময় না এসে পড়লে আমারও তুতানের চেয়ে বাজে দশা হতে পারত।"

"ছাড়ো না পুরনো কথা।" বলেন সঞ্জয়।

কী করে ভুলি সেই রাত? মনে মনে ভাবে শুচিস্মিতা। সদ্য কালনা থেকে যাদবপুরে এসেছে, বাসে ঠিকমত ওঠা-নামাও করতে পারত না, কলেজের নোটস্ নেবার জন্য যেতে হয়েছিল নাকতলা। স্যারের বাড়ি যাবার পথে বাসে একটা লোক বড়ই বিরক্ত করছিল, সীমা ছাড়ালে অসম্ভব ক্রোধে খিমছে দিয়েছিল শুচি। তারপরে বসার জায়গা পেয়ে মুখ দেখতে পায় লোকটার; জঘন্য লোলুপ দৃষ্টি। এবার শুচির সামনে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলাকে উত্যক্ত করছে, মহিলার অস্বস্তি চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। সেই প্রথম চুপ করে থাকতে পারেনি শান্ত শুচিস্মিতা। চীৎকার করে বলে উঠেছিল, "বাস থামান, নামিয়ে দিন ঐ অসভ্য লোকটাকে। আগে আমায় জ্বালিয়েছে, এখন এঁকে জ্বালাচ্ছে। বাধ্য হয়ে নেমে যায় লোকটা। তখনও শুচিস্মিতা বোঝেনি যে বড় বিপদ সামনে আসছে। স্যারের বাড়ি থেকে নোটস্ নিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। অটো নিয়ে গড়িয়া এসে গুমটি থেকে বাসে বসেছে, অন্ধকার ফাঁকা বাস। হঠাৎ বাস ছাড়তেই অল্প আলোয় দেখে সেই লোকটা! ড্রাইভারের পিছনের সীটে সে একা। হাতে গোনা দু'একজন লোক বাসে। কদর্য একটা হাসি ঝুলিয়ে তার কাছে এগিয়ে এল সে। বসার জায়গার মাথার ওপরের রডটা এমনভাবে ধরে দাঁড়ল, যাতে তার ঠিক হাতের বেড়ের মাঝে শুচিস্মিতা। বসার সময় দেখেছিল মাথার ওপরে রাখা দক্ষিণা কালীর ফটোটা। ভয়ে চোখ বুজে ডেকে গেছে – "মা রক্ষা করো।" নামবে যে স্টপেজে সেখানে এখনকার মতো আলো থাকত না, তারপর বাড়ি অবধি অন্ধকার গলি – আর কিছু ভাবতে পারছিল না শুচিস্মিতা। ঠিক সেই সময় ভগবানই কি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন... বাসের পিছন থেকে একজন লম্বা ছেলে এগিয়ে আসে।

"শুচিস্মিতা, রাইট? নতুন এসেছ স্যারের কোচিং-এ তাই না?" উত্তর দেবার আগেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল এই সঞ্জয়। শক্ত করে হাতটা চেপে ধরে একটা কথাই শুচির মুখ থেকে

বেরিয়েছিল, "কোথায় নামবে?"

"আরে তোমার পাড়াতেই থাকি, কিছুদিন আগে এলে তো ফ্ল্যাট বাড়িতে?"

এরপর দেখেছিল সেই অভদ্র লোকটা দ্রুত বাসের পিছন দিকে চলে যায় | আর বাসের গতি একটু কমতেই চলন্ত বাস থেকে নেমে যায় | সেই থেকে আলাপ সঞ্জয়ের সাথে | একই পাড়ায় থাকায় আর একই কোচিং-এ পড়ার সুবাদে যাতায়াত শুরু হয় দুজনে দুজনার বাড়ি | নাঃ, প্রেমে পড়ার মতো সময় পায়নি – তবে মেজানিন ফ্লোরে সঞ্জয়ের একটা নিজস্ব ঘর ছিল, ভীষণ ভাল লাগত ঐ ঘরটা শুচিস্মিতার | স্যারের পুরনো নোটস্ হয়তো দুজনে মিলে উদ্ধার করছে, সঞ্জয় মিউজিক সিস্টেমে কিশোর কুমারের গান চালিয়ে দিত – বলত, মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে | প্রিয় গান ছিল – "এক্ আজনবী হাসিনা সে"...| সঞ্জয় ছিল একমাত্র সন্তান | শুচি ওদের বাড়িতে গেলে অকারণেই সঞ্জয়ের মা ঘরে উঁকি দিয়ে যেতেন, আর সঞ্জয় দরজাটা ভেজিয়ে রাখলে খুলে দিয়ে যেতেন | এদিকে সঞ্জয় শুচিদের বাড়িতে এলে শুচির মা জলখাবার নিয়ে এসে যতক্ষণ সঞ্জয় থাকত ততক্ষণ ওখানেই বসে থাকতেন | এরপরই তড়িঘড়ি সুশোভনের সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় শুচির | বিয়েতে সঞ্জয়কে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে জানতে পারে সে গিরিডীতে মামাবাড়ি চলে গেছে, ওখানে থেকেই পড়াশুনা করবে | এরপর যতবারই বাপের বাড়ি এসেছে, অকারণ এক লজ্জায় ওদের বাড়ি আর যেতে পারেনি | পরে শুনেছে ওরা বাড়িটা প্রমোটারকে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে | আজ তিরিশ বছর পরে এভাবে এই পরিস্থিতিতে দেখা দুজনের |

হন্তদন্ত হয়ে সুশোভন এসে বলল, "এইমাত্র ডাক্তারবাবু জানালেন – সানি ইস আউট্ অফ্ ডেঞ্জার | মিস্টার চ্যাটার্জী, আপনি সারারাত এখানে বসা, আমাদের বাড়ি চলুন | শুচি, তুমি একবার তুতানের সঙ্গে দেখা করে এসো, জ্ঞান ফিরেছে, কথা বলছে, তোমায় খুঁজছে |"

তুতান মাকে দেখেই কোলে ওঠার মতো দুহাত বাড়িয়ে দিল – চোখভর্তি জল নিয়ে "ভুল হয়ে গেছে মাম্মা" বলে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে | তার মধ্যেই বলে ওঠে- "ওই সানিটার সঙ্গেই আমার বিয়ে দিয়ে দাও, পাগলের মতো লড়েছে আমার জন্য | ওরা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, বাকীরা পালিয়েছিল আমায় ফেলে, সানি একা হাতে ওদের আটকেছে |"

কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয় আর সুশোভন |

সঞ্জয় চ্যাটার্জী ধীর কণ্ঠে বলেন - "দেখ তো মা জিজ্ঞেস করে, আমার মা-মরা ছেলেটার দায়িত্ব তোর মা নেবে কিনা | আমি তাহলে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যাই |"

সবারই চোখে জল – নোনতা জলেও কী মিষ্টতা...!

•••❀◆❀•••

আজও মনে পড়ে

সুজাতা দাস

সেই ছবিটা – প্রথম দেখেছিলাম গয়নার বাক্সে | দেখেছিলাম কিছু কাঁচাহাতে লেখা চিঠি – যার মানে উদ্ধার করতে কষ্ট হয়েছিল অনেক | কিছু কাঁচের চুড়ি আর ঝুটো মুক্তোর মালা – যা আজও গচ্ছিত আছে চিলেকোঠার এক ভাঙাচোরা ট্রাঙ্কের ভিতরে | অনেক লুকোনো চাওয়া ছিল সেই চিঠিগুলোতে |
ছিল অনেক ভালবাসার শব্দ – কিছু জবানবন্দী, যা কথা দিয়েও না রাখার | অনেক বিশ্বাস অন্য জনের প্রতি – ছিল না পাওয়ার বেদনা আর আকুতি | এক পাহাড়প্রমাণ অভিমান আর বেদনা ছিল | সবকিছুই একজনেরই নিজের ছিল – অন্যজন হয়তো খুব সুখেই ছিল | আরেক জনের বিশ্বাসকে দুমড়ে মুচড়ে অন্য কারোর আলিঙ্গনে –
গল্পটা এমনিই হয় সাধারণত |
প্রেমের অভিনয় করে সব বিশ্বাস চুরি করে পালিয়ে গিয়ে নতুন কারো সাথে সুখের সংসার | তবে এক্ষেত্রে একটু অন্য রকম হ'ল ব্যাপারটা |

ষাটের দশকে এগুলো ভাবতেও যেন ভয় পেত ছেলেমেয়েরা | ছেলেদের সাথে কথা বলাও ভীষণরকম বারণ ছিল সেই সময় | হয়তো স্কুল যাতায়াতের পথে চোখাচোখি হতো একে অন্যের, কিন্তু সাথে সাথেই চোখ সরিয়ে নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক |
সেই সময়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের বড় মেয়ে ছিল রাই | সে খুব সুন্দরী না হলেও সুশ্রী ছিল | ছিল লক্ষ্মী প্রতিমার মতো গড়ন, আর গমের মতো গায়ের রঙ, কপালের ডান পাশে একটা ছোট্ট তিল,যা সৌন্দর্যকে হয়তো বাড়িয়েই তুলেছিল |
ছোটবেলায় বাবা-হারানো এই মেয়েটি মামাবাড়িতেই মানুষ হচ্ছিল আর সকলের সাথে | খুব মিষ্টি ছিল সে ও তার ব্যবহার | তাই মামাবাড়ির সকলেরই স্নেহের পাত্রী ছিল রাই | কোনও চঞ্চলতা দেখেনি কেউ কখনও তার মধ্যে | ছোটদের ভালবাসত খুব তাই সকলের কাছেই সে ছিল রাইদিদি | দিদিমার স্নেহের পাত্রী ছিল, মামীদের বান্ধবী ছিল রাই | মামাদের ছিল কড়া শাসন, ছিল দিদিমা আর মায়ের নজরদারি |

তবুও সকলের ভালবাসাকে উপেক্ষা করে সে হাত বাড়িয়ে দিল পাশের বাড়ির ছেলেটির দিকে | এর নামই হয়তো ভালবাসা, যার জোরে একটা পরিবারকে দুহাত দিয়ে সরিয়ে নতুন রাস্তা করে নেওয়া যায় | ঘুণাক্ষরেও টের পেল না কেউ |
প্রেম বোধহয় এমনিই হয়! আর সমস্ত ভালবাসাকে উপেক্ষা করতে মন একবারও কাঁপে না | রাইয়েরও কাঁপেনি | সেও পেরেছিল বাড়ির সকলের স্নেহ ভালবাসা উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে | চলছিল ভালই – কিন্তু কেমন করে যেন জানতে পেরে গিয়েছিল বাড়ির সবাই |
তারপরের গল্প খুব সাধারণ –

একদিন বাড়ি থেকে চলে গিয়ে বিয়ে করে ফিরে এল |
সেই সময়ে অসম বিয়ে মেনে নেবার চল তো ছিলই না, তার উপর ছিল মেয়ে পালিয়ে যাওয়ায় অসম্মানের ভয় | যে স্নেহ ভালবাসায় সন্তানেরও উর্ধ্বে ছিল, সে অবলীলায় এই কষ্ট দিয়ে ফেলল বলে রাইকে মেনে নিল না কেউ | ভালবেসে বিয়ে করাটা ছিল বিরাট অপরাধ রাইয়ের মামাবাড়ির কাছে | তাই মাথা নিচু করে বেরিয়ে যেতে হ'ল বাড়ি থেকে | তারা কেউ কোনওদিন খোঁজও করেনি কেমন আছে সে | জীবনে যা চাওয়া যায় তার একভাগও যদি কেউ পায় তবে তাকে সুখী বলা হয় | কিন্তু যে সুখের খোঁজে রাই পা বাড়িয়েছিল তা অধরাই থেকে গেছে তার খুব ছোট্ট জীবনে | শ্বশুরবাড়িতে মেনে নিলেও, সত্যি কতটা মেনেছিল তা একমাত্র ঈশ্বরই জানতেন | প্রতিদিন উদয়অস্ত খাটুনি দিয়ে সবার মন জয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু কতটা পেরেছিল তা হয়তো নিজেও জানতে পারেনি | খুব তাড়াতাড়ি দুই সন্তানের জন্ম দিয়ে জরায়ু ক্যান্সারে মারা গেল রাই |
একটা সমাপ্তি অসময়ে | কিন্তু অলক্ষ্যে চিলেকোঠার এই কাঠের বাক্সে রয়ে গেল কিছু প্রশ্ন, যা আজও খুঁজে চলে তার উত্তর |
যেসব হয়তো সম্পূর্ণ অজানা থেকে গেছে রাইয়ের ভালবাসার মানুষগুলোর কাছে |
আর ছবিটা?
আজও খুঁজে ফেরে না বলতে পারা অনেক কিছু ভাষা, যা হয়তো অধরাই থেকে গেছে রাইয়ের মৃত্যুর সাথে |

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৭ (2020)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
অনুগ্রহ করে আপনাদের লেখা pdf ফাইলে পাঠাবেন না। ওয়ার্ড ফাইলে পাঠাবেন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

পূজা অভিনন্দন